মুক্তপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

ভা র তী বু ক ষ্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯.

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৭০

প্রকাশক :
শ্রীহৃষীকেশ বারিক
ভারতী বুক স্টল
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীগৌরহরি মাইতি
বাণী মুদ্রণ
৯এ, মনোমোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

॥ প্রাক্-কথন ॥

বহু বৈচিত্র্যে ভরা নিবেদিতার জীবন-কাব্য। পশ্চিমের মাটি ও মানুষের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। ভোগ ও ঐশ্বর্যের ভূমি ছুঁয়ে জন্ম হয়েছিল তার। কিন্তু অন্তরটি ছিল ত্যাগ ও তিতিক্ষায় ভরা। শৈশব থেকেই নানা প্রশ্নের প্রভঞ্জন তার মনকে দিত পাগল ক'রে। ছাত্র জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষিকাদের নানা প্রশ্নের শর-বর্ষণে ভাবিয়ে তুলত ছোট্ট মার্গট। প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষায় চোখ দুটো জলত।

স্কুল ছেড়ে কলেজ। কলেজের শিক্ষা সমাপনান্তে মার্গারেট নোবেল পদার্পণ করল কর্মভূমিতে। এখানে অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক দুঃখ, অনেক আঘাত নীরবে তাকে সইতে হলো। কর্মময় জীবনের অবসন্ন মুহূর্তের কোনো এক বিষণ্ণ অপরাহ্নে বসে ফেলতে হলো তাকে চোখের জল। কিন্তু এ কান্নার কি কোনো সমাধান নেই?

আছে।

ভারতীয় যোগী স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচয় হলো তার। অবরুদ্ধ হৃদয়ের দুয়ারটা খান খান করে ভেঙে গেল। আত্ম-সত্যের অঙ্কুরগুলো মাথা তুলে দাঁড়াল। শুনতে পেল অরণ্যের সঙ্গীত। বদ্ধ জলাশয়টায় ঝাপিয়ে পড়ল বাঁধ ভাঙা সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস। এত প্রাণ! এত আলো! নতুন করে বাঁচতে চাইল মার্গারেট। তার মানসনেত্রে ভাস্বর হয়ে উঠল ভারতবর্ষের গৈরিক তীর্থ। মার্গারেট নোবেল রূপান্তরিত হলো নিবেদিতায়।

নিবেদিতাকে বুঝতে হলে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মমত ও উনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধির সংক্রান্তি পর্ব সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি দরকার। এক কথায় বলা যায়, নিবেদিতা হলো স্বামিজীর প্রচারিত ধর্মের গঙ্গোত্রী।

উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদ এক অনন্ত শক্তির সন্ধানে মাটির মর্তকে মহিমান্বিত করে তুলল স্বর্গের সুধাধারায়। নরের মধেই দেখল তারা নারায়ণের প্রকাশ বিভূতি। জীব-জীবনের সেবা পূজার মধ্য দিয়েই লাভ করতে চাইল শিব-সান্নিধ্য। সাধনা রূপান্তরিত হলো সেবায় এবং সে সেবাকে বলা যেতে পারে বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। বনের বেদান্ত ঘরে এলো। ধর্ম নিয়োজিত হলো মানুষের পবিত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং তার পুরধায় এসে দাড়ালেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বিবেকানন্দ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে নদীয়ার বিপ্লবী নিমাইচাঁদ বাঙলার ঘরে ঘরে যে গণজাগরণের সাড়া এনেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তারই পুনরুক্তি শুনতে পেলাম দক্ষিণেশ্বরের গদাধর ঠাকুরের কণ্ঠে 'মোটা ভাত-কাপড় না হলে ধর্ম হয় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের রাজ্যের এই সুদূরপ্রসারী বিপ্লবী ভূমিকার অঙ্কুরটি পল্লবিত হয়ে উঠল বিবেকানন্দের মধ্যে। এই শাশ্বত সত্যের বাস্তব রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের 'লোকমাতা', অরবিন্দের 'শিখাময়ী' এবং রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নিবেদিতা নেমে এলো গণ-জীবনের পবিত্রতীর্থে। ভারতে সেবা ও পূজা এবং ভারতের শৃংখল-মুক্তিই হয়ে উঠল তার একমাত্র সাধনা।

এই গ্রন্থ রচনার উপাদান-সংগ্রহ হয়েছে নিম্নলিখিত পত্র ও পুস্তিকা থেকে। তজ্জন্য রচয়িতা ও কর্তৃপক্ষের নিকট আমার ঋণ স্বীকার করি।

পত্রাবলী ঃ জগদীশচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ।

পুস্তকাবলী ঃ মার্কিনে চারিমাস—বিপিনচন্দ্র পাল, লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—মহেন্দ্র দত্ত, ভগিনী নিবেদিতা—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, রবীন্দ্র-জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা—শান্তা দেবী, নিবেদিতা—লিজেল রেম, অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী। The Master As I Saw Him.

সাময়িক পত্রিকা ঃ বসুমতী, যুগান্তর, সন্ধ্যা, প্রবাসী, উদ্বোধন, জয়শ্রী, যুগ ও জীবন, Bengali, Amritabazar, Modern Review, Probuddha Bharat, Statesman, Hindusthan Standard.

১লা বৈশাখ, ১৩৭০
৪১/৫৫ ডি, রসা রোড, (সাউথ)
কলিকাতা-৩৬

বিনীত
গ্রন্থকার

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মহোদয়ের করকমলে

গুণমুগ্ধ

মৃণালকান্তি

"যদি আমার নিজের কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক ; আর যদি ইহার মূলে সেই পরম শক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হউক।"

—বিবেকানন্দ

"কিছুমাত্র নিরাশ হইও না।......ক্ষত্রিয় শোণিতে তোমার জন্ম, আমাদের অঙ্গে গৈরিকবাস ত যুদ্ধ ক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা। ব্রতউদযাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের জীবনের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নহে।"

—বিবেকানন্দ

"যতদিন তিনি বাঁচবেন আর এ দেশে থাকবেন, আমি তাঁকে ছেড়ে দূরে যাব না। সে আমি পারব না। তিনি যে আমার ঠাকুর, আমি যে তাঁকে ভালবাসি। যে কাজে হাত দিয়েছি তার জন্য বাঁদীর মত খাটতে আমি প্রস্তুত। একটা বিরাট শক্তির খেলা অনুভব করছি আত্মার জগতে।"

—নিবেদিতা

"ক্রিষ্টিন, তাঁকে (গুরুকে) ভালবাসি বলেই তোমাকেও ভালবাসি। তোমার আমার মধ্যে কিছুই আড়াল নেই। তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্য আমরা দাসীর মত খাটব পরস্পরের বন্ধু হয়ে, এটা কি মনে-প্রাণে অনুভব কর না?"

—নিবেদিতা

॥ লেখকের যুগবিপ্লবী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রখ্যাত পত্রিকার অভিমত ॥

Amritabazar : Sri Mrinalkanti Dasgupta introduces us into a new realm of thought and Philosophy through his inspiring work on the life of the great Sannyasin of India.

The different Phases of the life of the great revolutionary religious teacher and his different reactions in diverse situations have been depicted with liveliness. A lucid pen moves on and Swami Vivekananda lives and breathes again. (R. 10758)

বসুমতী ঃ লেখক শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত বিবেকানন্দের শিবমুখী জীবসেবার তাৎপর্য এবং তাঁর ধর্মমতের যথার্থ রূপটি কাব্য-মধুর ছন্দে উপন্যাসের পরিবেশে পুস্তকখানিকে অপূর্ব করে তুলেছেন। প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

যুগান্তর ঃ স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত ধর্মই যে বাঙালীর যথার্থ ধর্মসাধনা বাংলার সে যুগের যুব সমাজকে এই চিন্তায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। গ্রন্থকার স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে এই বীরত্বের ও যুগ-বিপ্লবের দিকটিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছেন। মানুষের মধ্যেই তিনি যে ভগবানের সন্ধান করিয়াছিলেন ও পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার দিব্যভাব যে মানবের অন্তরলোক হইতেই ঊর্ধ্বলোকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, গ্রন্থকার তাহা আবেগপূর্ণ ভাষায় বিশ্লেষণ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারাতেই আজ সমগ্র ভারত প্লাবিত। শুধু ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী হিসাবে সাধারণ গ্রন্থের ন্যায় বইখানিকে তথ্য ও বিবরণ-বহুল করা হয় নাই। কাহিনীর পর কাহিনীর ও তর্ক প্রশ্নাদির আলোড়নে বইখানিতে অপূর্ব উপন্যাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছে। আগাগোড়া এই ঔপন্যাসিক রচনাভঙ্গী গ্রন্থখানির আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। ভাবের আবেগ কাহিনী পরিবেশনে, রচনাভঙ্গীতে বইখানি বিশেষ উপভোগ্য। (২৯১)

হিমাদ্রি ঃ স্বামিজীর জীবনের বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশ এ গ্রন্থে সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রচনার মধ্যে রহিয়াছে ভক্তি, দরদ ও কবিমনের কমনীয় স্পর্শ।—১৭ই ফাল্গুন ১৩৬৩

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৬'০০
পরমারাধ্যা শ্রীমা (পঞ্চম সংস্করণ)	২'৭৫
যুগবিপ্লবী বিবেকানন্দ	৭'৫০
রূপ হতে অরূপে	২'৫০
ছোটদের রামকৃষ্ণ (চতুর্থ সংস্করণ)	১'২৫
গৌরপ্রিয়া	৩'০০
ছোটদের সাধক	১'২৫
দিনগুলি মোর (উপন্যাস)	৩'২৫
ভারতের নিবেদিতা	৩'০০
দেবী-মাহাত্ম্য	'৭৫



শারতের সোহাগ গলান' স্বর্ণাভ সকাল।

বনে-বনে কত ফুল। পাখীদের কণ্ঠে সুরের ঐকতান।

শূন্যতার বুকে পূর্ণতার পরিতৃপ্তি—

পরিতৃপ্তি মেরী হ্যামিল্‌টনের অন্তর-বিশ্বে।

অপগত হয়েছে রাত্রির অন্ধকার।

পড়েছে নগ্না শর্বরীর বুকে অরুণিমার আলো। প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে সূর্য। রিক্তের বুকে এসেছে স্বাচ্ছন্দের সান্ত্বনা। আনন্দের কলতান।

১৮৬৭ সন; ২৮ শে অক্টোবর।

উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের ডাঙ্গানন শহর—

ঝোপে-ঝাড়ে ভরা শহর। তারই বুকে ছোট্ট একখানি ঘর। ছবির মত ঘর। বাস করে স্যামুয়েল আর মেরী হ্যামিল্‌টন। বাস করে সেখানে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে।

এলো তাদের মাঝে—

এলো আর একজন।

কে?

এলো তাদের কোল জুড়ানো, বুক দোলান এক শিশু।

আহা কি রূপ!

যেন কাঁচা সোনার রং তার অঙ্গে।

চোখে মাখা নীলিমার নীল।

স্বর্ণালী কেশ। সুঠাম দেহ। সুন্দর তনু।

অপরূপ রূপ-লাবণ্য যেন সারা অঙ্গে। স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল আভা, কিন্তু, প্রশান্ত শুচি শর্বরীর মত।

আহা, মায়ের চোখের পলক আর পড়ে না!

আদর করে তুলে নেয় কোলে। চুমু খায়। জড়িয়ে ধরে বুকে।

কত সোহাগ! কত সুখ!

তারপর?

বললে যুক্ত করে রিক্ত স্বরে—

বললে মেরী হ্যামিল্টন তার সুন্দরের উদ্দেশ্যে—

'প্রভু, আমার সন্তান আমি তোমার চরণে অর্পণ করলাম।'

লোক আসে, আসে দলে দলে হ্যামিল্টনের বাড়ীতে—মার্গারেট এলিজাবেথকে দেখতে।

যে দেখে, সে যায় বিহ্বল হয়ে। বলে, আহা! কি সুন্দর মেয়ে! যেমন রূপ, তেমন গঠন! এমন সন্তান পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা।

আবার কেউ বা বলে—

হবেনা কেন? ওর পূর্বপুরুষ ছিল কারা! এ যে তাদেরই সাধনার ফল। তপস্যা-লব্ধ ধন। অমন হবেনা তো কি হবে?

মায়ের বুকে লাগে দোলা। আনন্দে-গর্বে ভরে যায় অন্তর। নিরন্তর স্মরণ করে ঠাকুরের নাম। বলে আবার খুকুর পানে তাকিয়ে—

বলে, 'ওরে খুকু, কী আছে তোর ভাগ্যে, কে জানে! সত্যি কি তাঁর চরণে তোকে সঁপে দিতে পেরেছি?'

বাপ, স্যামুয়েল দরিদ্র, কিন্তু ধর্মপ্রাণ। সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ন্যায় নীতিকেই জেনেছে জীবনের ধ্রুব তারা বলে। মায়ের বুক ভরা স্নেহের কলতানে। শত আঘাত শত দুঃখকে হেলায়-খেলায় উড়িয়ে দিয়ে সেও বেছে নিয়েছে সত্যের আদর্শ।

দারিদ্র্য? সে তো ঈশ্বরেরই বিভূতি। গ্রহণ করতে হবে তাকে দেবতার দান হিসেবেই। দুঃখ, দহন? সেও তো মানুষেরই জন্যে। তাকে উপেক্ষা করলেই সে চলে যাবে না। তাকেও মেনে নিতে হবে হাসি মুখে। মাথা পেতে।

এ সত্য তখন মেরী হ্যামিলটনের মন বুঝতে শিখেছে। তাই তো সে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াল—

দাঁড়াল হাসি মুখে, মাথা উঁচু করে।

মার্গারেট যে তার মা-বাবার যুক্ত জীবনের সাধনলব্ধ ধন। তাই তো মা, বাবার স্নেহ, মমতা তার'পর অপরিসীম।

একটি বছর চলে গেল। মেয়ে একটু বড় হয়েছে। কিন্তু শৈশবের চঞ্চল গণ্ডি তো পেরিয়ে যায়নি!

তাতে কি হবে?

পাঠিয়ে দিল মেয়েকে ঠাকুরমার কাছে। স্যামুয়েল আর হ্যামিল্টন চলে এলো আয়ার্ল্যাণ্ড ছেড়ে লণ্ডনে।

সুরু হোল তাদের নতুন জীবন।

সংসারে মন নেই। কেবল ঈশ্বর প্রীতি ঈশ্বরানুভূতি লাভের অভীপ্সায় অন্তর নিরন্তর যেন কাকে খোঁজে।

চলে এলো ওরা ম্যাঞ্চেস্টারে।

কাজ করে যায়, মন পড়ে থাকে তাঁরই চরণ প্রান্তে। চায় প্রণতির দীক্ষা। ভক্তির অশ্রুতে ভেসে ভেসে চায় উন্মুক্তির আনন্দ।

দেউলে প্রদীপ জ্বলে, তার প্রকাশটুকু কত মধুর। ধরে রাখা যায়না তাকে। ক্ষণপ্রভা। ক্ষণেক জাগে আবার যায় নিভে। কোথায় হারিয়ে যায় দীপ্তি? মন জানে। প্রাণ কাঁদে। আবার মনই পায় তাঁর খোঁজ।

স্যামুয়েলের চেতন-লোকে সেই সত্য সুন্দরের দেউলে দীপ জ্বলছে, আবার নিভছে। তন্ময় মন আকুল হয়ে কাঁদছে। ভালোবাসার কান্না। দিন-রাত কেটে যায়। দুঃখ-দহন দলে যায়। খেয়াল নেই। হুঁস নেই। যেন কোন অভিসারে আশে ভেসে চলেছে সে।

একটু অবসর পেলেই ছুটে যায়,—ছুটে যায় স্যামুয়েল কারখানার কর্মীদের কাছে। ডেকে জড়ো করে সকলকে। জানিয়ে আসে আমন্ত্রণ। ওরা এসে মিলিত হয়, মিলিত হয় সপ্তাহের শেষ সন্ধ্যায় স্যামুয়েলের বাসগৃহে।

এরা কারা?

স্যামুয়েলের দেশের লোক। তার দেশের ভাই।

মাটির একটি প্রদীপ দেয় জ্বালিয়ে। সবাই ওরা ব'সে পড়ে, ব'সে পড়ে দীপের দ্যুতি ঘেরা জোড়াসনে। শুরু হয় আলোচনা। দেশের কথা--দশের কথা। আরো কত কিছু।

ওরা শোনে--

শোনে কান পেতে মন ঢেলে স্যামুয়েলের বাণী। মুগ্ধ হয়ে যায়। থাকে তাকিয়ে, তাকিয়ে থাকে অপলক নয়নে। এমনি ধারায় চলতে থাকে দিন।

নেমে এলো রাত্রির নির্ঝর। এমন স্বপ্ন সাধনায় কে যেন ছুঁড়ে দিল, ছুঁড়ে দিল একমুঠো বালি। দেখা দিল হাহাকার। দারিদ্র্যের ছায়া নামে ধীরে। সংসার হয়ে পড়ে অচল।

কিন্তু বেশী দিন সইতে হোলনা এ দুঃখের দহন। যে দিয়েছে ক্রন্দন, আবার তার কাছেই জমা আছে সুখের স্বাক্ষর। সে একবার কাঁদায়। আবার হাসায়। কখন সে সুলভ হয়ে আসে। আবার দুর্লভ হয়ে দূরে যায়। একদিকে সহজ। আর এক দিকে নির্মম। এই ছিল কান্না। আবার এই পায় হাসি?

কি আশ্চর্য ! ওগো, তোমাকে বুঝে নিতে পারি এমন সাধ্য কৈ ?

কাজ গেল জুটে—

কাজ জুটে গেল স্যামুয়েলের। সম্মানের চাকুরী। যে সব যাজকেরা যায় ছুটিতে বা রোগশয্যায়, তাদের স্থান পূরণ করে স্যামুয়েল। ভাষণ দেয়।

দেয় ললিত কণ্ঠে ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে।

মনের মতন কাজ। যা ছিল স্বপ্নে, মিলেছে তা বাস্তবে। কিন্তু এ কাজে শ্রম চাই। চাই অক্লান্ত খাটুনি। দিনান্তে বাড়ী ফেরে। ছাই, বিশ্রাম কি আর মেলে ? আবার বসতে হয়। বই, কাগজ আর পত্তর। কত কি। রাত গভীর হয়। ভাঙেনা তার ধ্যান। এক মনে এক ধ্যানে বই নিয়ে তন্ময়, তন্ময় হয়ে যায় স্যামুয়েল। মেরী কিন্তু তাই বলে শুয়ে শুয়ে ঘুমোয় না !

যেমন আকাশে তারা জাগে, জাগে নিশায় পাখী। বৃন্তে প্রস্থন ফোটে, ফোটে শশী নভে। মেরীও তেমন জাগে। লিখে দেয় কাগজ। টুকে দেয় কথা। সার্থক ক'রে তোলে, যুক্ত জীবনকে। এগিয়ে যায় সার্থকতার পথে। সুন্দর হ'য়ে ওঠে জীবন। আনন্দের রসে আপ্লুত হয়ে যায় অন্তর। প্রচুর উদ্দীপনায় কাজ করে যায় দুজনে। দীর্ঘ দিনের সাধনা। মুখ তুলে চাইলেন তার জীবন-দেবতা। প্রতিষ্ঠিত হোল স্যামুয়েল—

প্রতিষ্ঠিত হোল মানুষের অন্তরে। ঐশ্বর্য-বর্জিত সম্রাটের সম্মানে। পদ পেল ধর্মযাজকের। চলে এলো ওল্ডহ্যামে।

কিন্তু দেহ পড়ল ভেঙে। শয্যা নিতে হোল। শ্রান্ত কর্মী এলিয়ে পড়ল বিশ্রামের সুখ-অঙ্কে। আনন্দিত প্রহরীর মত রইল দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে রইল করুণ নয়ন পাতে মেরী।

বড় হয়ে উঠল মার্গারেট।

ঠাকুরমার আদুরে দুলালী। মন ভরা খুশি। মুখ ভরা হাসি। বেশ কাটছে দিনগুলো। দহন নেই দুঃখের। নেই কান্নার অশ্রু। কেবল আনন্দ।

সকাল হয়। পাখী ডাকে। ভাঙে ঘুম মার্গারেটের। কিন্তু ঘুম ভাঙেনা প্রকৃতির। বাইরে কেবল কুয়াশার আবছায়া। তুষারের তন্দ্রা। ওর মনটা থাকে গুমট বেধে। আকুল হ'য়ে দর্শন প্রার্থনা করে সূর্যের। জাগে নবারুণ। ছড়িয়ে পড়ে তার কণক দীপ্তি। নৃত্য করে ওঠে মন আনন্দে। তৃপ্তির হাসি হাসে মার্গারেট।

বাতায়নের দোর খুলে দেয়। তাকিয়ে থাকে বাহির পানে। দেখে শুচি স্নিগ্ধ কুসুমরাজি, কত না তার রং। এ যেন ঈশ্বরের এক অপূর্ব সৃষ্টি। মন নেচে ওঠে। সুন্দরের উদ্দেশে জানায় শিশু-মন প্রণতি। আহা কি অপূর্ব! প্রজাপতি চুমু দিয়েছে ফুলের মধুকোষে। গুণ গুণ ক'রে বিরহের কান্না কাঁদছে ভ্রমর। এ যেন তার বিদায় অভিসার। এখনই তো উৎকলিত হবে ফুল। মানুষের কর-স্পর্শে ফুরিয়ে যাবে তার আয়ু। লুটিয়ে পড়বে দেবতার শ্রীচরণে। দুলবে প্রেমি-কের কণ্ঠে। রচনা করে দেবে কবরের শোক-শান্ত শয্যা।

পাখী ডাকে। ভোরের পাখী! মুখর করে তোলে ওদের ফুলবাগান। কত সুর। কত ছন্দ। নীল পাখী। হলুদ পাখী। কালো কোকিল। সবার সঙ্গে যেন ওর হৃদয়ের যোগ হয়ে গেছে। নিত্য দেখে দেখে স্থাপিত হয়েছে একটা সৌহৃদ্য। সব পাখীরা না এলে শান্তি পায়না তার মন। তাকায় বারে বারে। খোঁজে সেই না-আসা পাখীটি। যেন চোখে জল আসে। তারপরে যেই সবাই এলো, অমনি পেল যেন মার্গারেট নিষ্কৃতি। পেল চিন্তার সমুদ্র থেকে উন্মুক্তি।

ঠাকুর মা গল্প বলে। মার্গারেট তাকিয়ে থাকে অপলক নয়নে। শোনে অবাক বিস্ময়ে। শোনে পরীর গল্প।

—পরী থাকে ফুল-বাগানে। পাখা মেলে দেয় আকাশে। কি সুন্দর তাদের রূপ। যেন চাঁদ ধোয়া স্নিগ্ধতা তাদের অঙ্গে। মুখে লাবণ্য। দেহে অনিন্দ্য এক কান্তি। যেমন রূপ, তেমন আবার ভালোবাসে ফুল। এ ডাল থেকে উড়ে যায় ও-ডালে। এ-ফুল থেকে ও-ফুলে দেয় চুমু।

মার্গারেটের মন ভাবে,—একবারটি দেখতে পেলে হোত! গল্প শেষ হোলে

ঠাকুরমার সঙ্গে ভজন গানে সুর মেলায়। মুখস্থ তার কবিতা। কণ্ঠস্থ করে বাই-বেলের মধুর ছত্র। ঠাকুরমা যেন মার্গারেটের কাছে সর্বজ্ঞা। যা বললে অমনি তাই যেন শাশ্বত সত্য বলে জেনে নিল ছোট শিশুর মন। তাতে আর বিন্দু ভুল নেই একটু ভ্রান্তি। থাকে ঠাকুরমার কাছে কাছেই। আড়াল হবার কি আর উপায় আছে? এক মুহূর্ত না দেখলেই যেন দু'জনার মন আকুল। কান্না আসে। জল ঝরে চোখে।

এমনি করে পেরিয়ে গেল সোনার খাঁচার দিনগুলো। দিন ঘুরে মাস এলো। এলো মাস ঘুরে বছর। এক, দুই, তিন। পা দিল এবারে চার বছরের কোঠায় মার্গারেট।

মা, বাবা বলাবলি করে—

বলাবলি করে মেয়ের কথা। কতদিন দেখি নি। তিনটি বছর গেল পেরিয়ে। যেন মনে হয় তিন যুগ। অবশেষে স্যামুয়েল যাত্রা করল, যাত্রা করল ওল্ডহ্যাম থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডের পথে।

চার বছরের মেয়ে। বললে এসে বাপ—চল খুকু! একবারটি মার কাছে। তোকে দেখবার জন্য সে আকুল!

অবাক লাগে মার্গারেটের। থাকে তাকিয়ে। জাগে বিস্ময়। কোথায় যাবে সে? ঠাকুরমার স্নেহের উৎসঙ্গ যে তার কাছে স্বর্গের চেয়েও মধুর। এমন কি আর পাবে কোথাও? চোখ ফেটে কান্না এলো। সিক্ত হোল দুটি নয়ন জলে। মুষড়ে পড়ে মার্গারেট।

যেতে হোল। তবুও তাকে যেতে হোল বাবার সঙ্গে মার কাছে! যেতে হোল ওল্ডহ্যামে।

উড়ু উড়ু মন। অনাশক্ত ভাব। মা তো আদর করছে মন ঢেলে। বাপ মধুর মমতা দিয়ে টেনে নিচ্ছে দুলালীকে কোলে। কিন্তু কি হবে তাতে?

মন কাঁদে। ঠাকুরমার স্মৃতি এসে উঁকি দেয় মনের নেপথ্যে। ইচ্ছে হয় ছুটে যেতে। মা হোলেও সে অপরিচিতা। বুদ্ধির গণ্ডিতে পদপাত করে সে কেবল দেখেছে একটা মধুর মূর্তি। তার ঐ ঠাকুরমার। কেমন কেমন লাগে যেন। কি ছাই, এখানে থাকবে সে! কেমন করে থাকবে?

ঠাকুরমার কথা স্মরণ করে চুপি চুপি। মন যায় আকুল হয়ে। একান্তে একাকী যেন বলে—হ্যাঁগো, তুমি তো বড় নিষ্ঠুর। আমার চোখের জল, বুকের ব্যথা কী তোমাকে স্পর্শ করে না? কেঁদে কেঁদে গেলাম আকুল হয়ে, তবুও তোমার

মন হোলনা ব্যাকুল! থাক। আর কাঁদব না। যখন এলে না তখন আমাকে আমার মতই থাকতে হবে।

অভিমান জাগে। চুপি চুপি চোখের জল মোছে। নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় অপরিচিত পরিবেশে। তবুও ভালো, আইরিশ চাকর ছিল বাড়ীতে। তার সঙ্গে বেশ ভাব হোল মার্গারেটের। অবসর মুহূর্তে দুজনে কত গল্প করে। সুখ-দুঃখের কথা বলে। হালকা হয় একটু মনটা।

দিন দিন বড় হোয়ে ওঠে মার্গারেট। শৈশবের লীলাক্রোড় থেকে পা বাড়ায় কৈশোরের উপকূলে। স্কুলে যায় দুটি ফুলের মত বোন এক সঙ্গে। প্রিয় হয়ে ওঠে শিক্ষিকাদের। আদর করে ডাকে দুটি বোনকে শিক্ষিকারা—'সূর্যি' আর 'বাদলি' বলে। ওরাও সাড়া দেয় খুশি মনে। স্কুলের ছুটি হোলে বাড়ীতে ফিরে আসে। উল্‌টে যায় একটু পুঁথি-পত্তর। তারপরে আহারের আয়োজন। অবশেষে ঘুম এসে চুমু দেয় চোখে। দুটি বোন গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে রাতের অঙ্কে।

সাত বছরের মার্গারেট। হারাল তার ঠাকুরমাকে। ব্যথার সমুদ্র গর্জন করে উঠল। দুঃখের রাত্রি নেমে এলো। জীবনের সুর ও ছন্দ গেল বেসুরা হয়ে। এই তার প্রথম পরিচয় ঘটল মৃত্যুর সঙ্গে। জানল মৃত্যু কি! বসে রইল, বসে রইল পাষাণ প্রতিমার মত। ঝরল না চোখে তার এক ফোঁটা জল। একটু বিকৃত হোল না মুখ। কেবল স্থির হয়ে রইল অপলক নয়ন দুটি। স্থির হয়ে রইল জীবন-মৃত্যুর সঙ্গম শিয়রে। এই প্রথম একটা আঁচড় পড়ল, আঁচড় পড়ল তার মনের লীলা-লিপিতে দুঃখের কাহিনীর।

* * * * *

ওল্ডহ্যাম ছেড়ে এলো—

এলা ওরা ডেভেনের গ্রেট টরেন্টনে। বেশ পরিবেশ। প্রকৃতি এখানে ঐশ্বর্যময়ী। ফুলে, ফলে, পত্র-পল্লবে কি মনোরম শোভা! পাখীদের কুহু গান। বনানীর বনতান। মহুয়ার গুণ গুণ। বড়ো ভালো লাগে—

ভালো লাগে মার্গারেটের প্রকৃতির এই অপূর্ব শ্যামশ্রী। ওল্ডহ্যামের তুলনায় গ্রেট টরেন্টন ভূস্বর্গ। সব দিক দিয়েই মনোরম পরিবেশ। কিন্তু স্যামুয়েলের মনোজগতে ব্যাথার কান্না।

কেন ?

এখানকার লোকেরা ধর্মের কথা তেমন শোনে না। খোঁজ নেয় না অনন্ত বিশ্বের। কেবল বহিরঙ্গ ভাব। দৃষ্টি দেয় অখণ্ড ভুলে খণ্ডে। অসীম ছেড়ে সমাপ্তিতে।

ভালো লাগেনা স্যামুয়েলের। বিষিয়ে ওঠে মন। তার অন্তরে যে অনির্বচনীয় নৃত্য-ছন্দ। সে কেমন করে থাকবে, থাকবে চুপটি করে? সবাইকে শুনিয়ে যাবে সে আনন্দের সংবাদ। লীলাময়ের লীলাখেলার নূপুর-নিক্কণ, বংশী-ধ্বনি।

তাইতো আকুল মন তার ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আকুতি জানায় আকুল হয়ে, —হে সীমাতীত, তোমার মহিমা কীর্তন করবার শক্তি দাও, দাও আমায় অফুরন্ত সামর্থ্য। যে শব্দ শুনি হৃদয়ের মধ্যে সে শব্দের ধ্বনি শোনাতে দাও জগৎ সভায়। যে কান্নার অশ্রু ঝরে তোমার নাম স্মরণ করলেই, সেই অশ্রুর প্লাবন এনে দাও জীবনে জীবনে। তোমার বিস্তার হোক দুঃখের সমুদ্রে। অশান্তির অন্ধকারে। মানুষের মনের দিগন্তে। আর অমঙ্গলের অঙ্গনে বেজে উঠুক, বেজে উঠুক তোমার বিষাণের শুভ সঙ্কেত।

তাই হোল। স্যামুয়েলের জীবনে এলো সাফল্যের স্বপ্ন। জ্বলিয়ে দিল সে, জ্বালিয়ে দিল নিষ্প্রভ গুহায় জ্ঞানের দীপশিখা। দলে দলে লোক এসে ভিড় করল—

ভিড় করল তার মুখ নিঃসৃত ধর্মের কথা শুনতে। স্থাপিত হোল বিদ্যাপীঠ। মানুষের জীবনের পরম ও চরম মন্ত্র উচ্চারণ করল—

উচ্চারণ করল স্যামুয়েল। মুগ্ধ চিত্তে ওরা সবাই শুনল তার অন্তরের বাণী।

ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামে।

ধর্ম ও মোক্ষ। ধ্যান ও সাধনা। এই যেন হয় মানুষের জীবনের আদর্শ। শত কর্মের মধ্যেও একবার ঈশ্বর অনুভূতি লাভের অভীপ্সায় মানুষ যেন মুগ্ধ চিত্তে ভক্তির সরসীতে করে অবগাহন। ভক্তি। শুধু ভক্তি। রাগ-অনুগ ভক্তি। বিশুদ্ধা ভক্তি। বিমুক্তা ভক্তি।

এই ভক্তিকে কেন্দ্র করেই ভালবাসা। ভালবাসা এলে আর ভাবনা কি? মন পাগল হয়ে যাবে। বিলোল মন তাকে বৈ আর কিছু ভাববার পাবে না অবকাশ। কখন একটু অবসর। কখন একটু নিরজনে বসে তার স্মরণ সুধা পান এই ভাবনায় তন্ময় হয়ে যাবে চিত্ত। বিত্ত হারা মম নিত্য শুদ্ধ সেই পরম শ্রেয় বস্তুর অভিসারে চলবে। আর বলবে—যেমন প্রকৃতির ফুল-সজ্জায় তোমার পদপাত, উজান যমুনায় তোমার নূপুর-নিক্কণ, অম্বরে তোমার তীব্র প্রকাশ, তেমনি আমার অন্তর আয়তনেও হোক তোমার মধুর প্রকাশ। যেমন পাখীর কণ্ঠে দিয়েছ সঙ্গীত, দিয়েছ মেঘের চোখে অনুরাগের কান্না, তেমনি আমাকেও গাইতে দাও গান। দাও নয়ন ভরে অশ্রুর আনন্দ। তোমার নাম করে যে কান্না, সে কান্নার নিবৃত্তি

চায় মন। সে দহন যত জ্বলে, তত প্রাণ উছলে। সে কান্না যত কাঁদি, তত আমার কাব্য ব্যাধি। হে দহনোত্তরণের অধিপতি, আমাকে তোমার বিরহ-দহন থেকে মুক্তি দিয়ে দর্শন দাও। দাও সুখের পরশন। তোমার নামে ভেসে চলি কর্মের ফেনিলে, আকাশে, অনিলে—মাটিতে, সলিলে।

মার্গারেটের অন্তরে ছায়া পড়ে—

ছায়া পড়ে পিতার জীবনাদর্শের।

শিশুমন বিহ্বল হয়ে যায়। অচেনা অজানা সেই অনন্ত মহান্ত পুরুষের অভিসার আশে মনে জাগে কাঙাল কামনা। কিন্তু সে কথা না-বলা বাণী। অব্যক্তের বেদনা। কেবল মন রাখে তার খোঁজ। খোঁজ রাখে সেই নিখোঁজ সত্তার। নিঃসঙ্গের সঙ্গীর।

স্যামুয়েলের মন ভরা আনন্দ। তার মেয়েরা তারই আদর্শের ধারক। কালে ওরা পিতৃ-জীবনের সাধনাকে করবে নবরূপে রূপায়ণ। শোনাবে মোহমুগ্ধ মানুষকে অমৃতের সংবাদ। তাই তো এমন ছোট্ট মেয়ের অন্তর নিত্য খোঁজে ঈশ্বর। খোঁজে সেই মহান্ত পুরুষের ঠিকানা। খোঁজে আদির অনাদি। সুন্দরের দিব্য কান্তি।

সংসারে ওদের বড় দুঃখ। আর্থিক নয়। মানসিক।

কেন ?

পর পর তিনটি ভাই হোল। কিন্তু তার একটিও রইল না। পৃথিবীর আলো দেখবার সৌভাগ্য পেয়েও পেলনা। মরণ নিল কেড়ে, কেড়ে নিল তাদের প্রসূতির আগার থেকেই। মায়ের বুকে দহন জ্বালা। দহন জ্বালা স্যামুয়েলের অন্তরেও।

একটি পুত্র সন্তান! দিলেন তা ঈশ্বর। কিন্তু নিয়ে নিলেন অ্যানিকে। ছোট্ট মেয়ে অ্যানি চলে গেল মা-বাবার কোল ছেড়ে।

স্যামুয়েলের মন ভেঙে পড়ল। অ্যানির মৃত্যু তাকে বড় ব্যথা দিল। মন তার বলে—ওগো, তোমার খেলা বুঝি এমন সাধ্য কি! এই তুমি প্রসন্ন, প্রভাময়, প্রসূন। আবার অন্ধকার, দুঃখ, দহন, জ্বালা। এই দেখালে তোমার করুণ অরুণ দ্যুতিবিচ্ছুরণে। আবার মুহূর্তে মিলিয়ে গেলে—সিক্ত করে দিলে দুনয়ন শোকের অশ্রুতে।

দেহ ভেঙে পড়ল স্যামুয়েলের। মার্গারেট বাবার অন্তরের ব্যথা বোঝে। তার জন্যে বড় দুঃখ হয় মার্গারেটের। নিজের জীবনের আনন্দ কোলাহল ছেড়ে পিতার সহচরী হয়ে থাকে তারই কাছে কাছে।

দশ বছরের মেয়ে মার্গারেট।

কি হলো তাতে? বুদ্ধিতে পাকা। বাবার কখন কি দরকার, কি করলে একটু শান্তি পায়, সেদিকে অতন্দ্রিত প্রহরীর মত মার্গারেটের দৃষ্টি। পিতার অন্তর দহনে একটু শান্তির বারি সিঞ্চনের চেষ্টায় মার্গারেট মমতাময়ীর মত থাকে দাঁড়িয়ে—

দাঁড়িয়ে থাকে দিবা-যামিনী।

এমনি দিনে এলো এক ধর্মযাজক—

এলো ভারতবর্ষ থেকে ফিরে। দেখা হয়ে গেল। ধর্মযাজক তো অবাক!

কেন?

অবাক হোল মার্গারেটকে দেখে। ভাবল ধর্মযাজক, ভাবল মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে।

কি?

এমন আয়ত দীপ্ত আঁখিযুগল। প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল। ঋজু দিঘল দেহ। এ যে ভবিষ্যতের শুভ ইঙ্গিত বহন করে।

এগিয়ে এলো কাছে, কাছে এগিয়ে এলো ধর্মযাজক। একদৃষ্টে প্রত্যক্ষ করল মার্গারেটকে। তারপরে ধীরে ধীরে বলল, বলল সে—'ভারতবর্ষ অতন্দ্র হয়ে তার দেবতার খোঁজ করছে। ····· যেমন করে আমায় সে ডাক দিয়েছিল, তেমনি তোমাকেও হয়তো সে ডাকবে। তৈরী থেকো সে দিনের জন্যে। আবেগ বিহ্বল চিত্ত অধীর হয়ে উঠল। মনের ক্রান্তিবৃত্তে এসে আছড়ে পড়ল, আছড়ে যেমন সমুদ্রের ঢেউ জাগায় সাড়া খেয়ে—

সাড়া জাগায় এ কূল থেকে ও কূলে। ঠিক তেমনি ধর্মযাজক এসে মার্গারেটের মনে জাগিয়ে দিল—

জাগিয়ে দিল দূর সঙ্গীতের আহ্বান। চনমন করে উঠল মন। তার অন্তর বিশ্বে যেন কি একটা আনন্দের জোয়ার লেগেছে—মুখর, শব্দিত, ঝঙ্কৃত। অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে, তাকিয়ে থাকে মার্গারেট ধর্মযাজকের দিকে। দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় তড়িৎ প্রবাহ। যেন আর ধরে রাখতে পারছে না সে নিজেকে। ছুটে যায় বাবার কাছে। বলে, আমি ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখব বাবা।

বিস্ময় লাগে স্যামুয়েলের। কিন্তু শুধাল না কিছু। নীরবে মানচিত্রটি খুলে ধরল, খুলে ধরল মেয়ের সতৃষ্ণ নয়নের সামনে।

দেখ, দেখ, ঐ দেখ ভারতবর্ষ। ঋষিকল্প দেশ। সাধনার তপতীর্থ। প্রাণ-সাধকের পবিত্র মৃত্তিকা। দেখ, তুষার কবরী হিমালয়ের হিমগম্ভীর ধ্যান-মূর্তি। প্লাবনছন্দা

তরঙ্গ বন্দিতা সাগর-সমুদ্রের দেশ। পান্নার দীপ্তির মতো উজ্জ্বল। শাশ্বত। বাউল, সন্তদের পবিত্র তীর্থ। বৈষ্ণব, শাক্ত, নাথ, শৈব ও তন্ত্রের মন্ত্রোচ্চারিত প্রেমের লীলাভূমি। দেখে নাও, তোমার আগামী দিনের রাজপথ। মহামুক্তির পবিত্র তীর্থ।

স্বাতীর মত উজ্জ্বল চোখ। অপলক দৃষ্টি।

দেখছে, দেখছে মার্গারেট এক মনে এক ধ্যানে ভারতবর্ষের মানচিত্র।

কি দেখছে চেয়ে চেয়ে?

দেখছে, তার অন্তর বিশ্ব-সম্রাটের সিংহাসন।

কোথায়?

ঐ ভারতবর্ষে। সাধকের বাঞ্ছিত ভূমিতে। সর্ব ধর্মের লীলা-নিকেতনে।

স্যামুয়েল জড়িয়ে ধরে, জড়িয়ে ধরে তার আদুরে খুকুকে বুকে। আবেগ বিহ্বল পিতৃহৃদয়। তার স্নেহের সমুদ্রে বাঁধভাঙ্গা ঢেউ। অধীর অন্তর। উদ্বেল হৃদয়। এ যে তারই সাধনার সাফল্য। মার্গারেট দেখে নিল, দেখে নিল চর্ম-চক্ষে নয়, মর্ম চক্ষে। দেখে নিল মুক্ত, শুদ্ধ, পবিত্র তীর্থের পথ। ভারতবর্ষ।

ডাক এসেছে।

পৃথিবীর মায়াঘেরা ছায়া নীড় আর ভাল লাগছে না স্যামুয়েলের।

অন্তরে তার অনন্তের আহ্বান। অসীমের স্বপ্ন। অজানার বেদনা।

কেমন করে আর রইবে—

রইবে স্যামুয়েল তার তন্দ্রাতুর মন লয়ে বেঁচে?

শরীর ভেঙে প'ড়ল। নিতে হোল আবার শয্যা। শক্তি নেই। নেই সামর্থ্য উঠে বসবার। কষ্টের বিকৃত ভঙ্গি। বেদনার বিচিত্র রূপ। আর দহনের নিরন্তর জ্বালা; এই নিয়ে কি বেঁচে থাকতে পারে মানুষ?

কিন্তু মরবার তো বয়স হয় নি!

কি হবে তাতে?

মৃত্যু যে রাখেনা বয়সের অপেক্ষা। তার খেলা বিচিত্র। তার লীলা অভিনব। মানুষের মোহমুগ্ধ মনে ত্যাগের মন্ত্র শোনায় মৃত্যু। জীবন জিজ্ঞাসার প্রশ্নটি দেয় স্মরণ করিয়ে। ঐশ্বর্যের সিংহাসন থেকে নিয়ে আসে উন্মুক্তির দিগন্তে। বয়স দেখে তার প্রেম তো জমবে না! তার প্রেম জমে আধার ভেদে।

মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়স হয়েছে স্যামুয়েলের। অভাবের সংসারে ফিরে এসেছে স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে স্যামুয়েল, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মানুষের মনোরাজ্যে। সমাজের শীর্ষাসনে কিন্তু ভোগোন্মুক্ত মন তা সইতে পারল না। বিদায় নিল স্যামুয়েল। বলে গেল স্ত্রীকে, বলে গেল তাকে মার্গারেটের কথা,—'ভগবান যে দিন ওকে ডাকবেন, সে দিন বাধা দিও না যেন······ও পাখা মেলবে দূরের আকাশে, আমি জানি······ও এসেছে একটা বড কিছু করবার জন্য।'

এ ক্ষুদ্র, খণ্ড, বিক্ষিপ্ত সুখ ভোগ ওর জন্যে নয়। মার্গারেট অসীমের। অনন্তের। মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়বে। দুঃখের সমুদ্রে ফোটাবে সান্ত্বনার শতদল। মানুষকে শোনাবে তাদের আত্ম-সত্যের বাণী। জ্বেলে দেবে প্রজ্ঞার দীপ-শিখা।

চোখ ফেটে কান্না এলো ওদের—অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আর্তনাদ করে উঠল মার্গারেট। নেমে এলো রাত্রির ধারা অঝোরে। চোখ বুজল স্যামুয়েল। দেখে গেল বিদায়ের প্রাক্কালে, দেখে গেল স্যামুয়েল তার দিব্য নয়নে মার্গারেটের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

* * * *

বিষণ্ণ দিনগুলো কেটে যায়। বড় শূন্য লাগে মন। অবসর নিতে চায় মার্গারেট। কি হবে আর পথ চলে? কার জন্যে জীবন-সংগ্রাম!

এ যে নিছক নির্বেদ ভাব। নৈরাশ্যের স্বপ্ন।

কি হবে আর সেখানে থেকে? বাইরের কর্মমুখর বিশ্ব থেকে সেও যেন ছুটি পেলে বাঁচে। এমনি ধারা মন নিয়ে কাটল কয়েকটা দিন। ধীরে ধীরে সহজ হয়ে এলো মন। একটু হালকা হোল যেন। স্থির ভাবনার সীমানায় দাঁড়িয়ে ভাবল—

ভাবল মার্গারেট, বাবার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার কথা। তা যদি সে পারে, তবেই তিনি বেঁচে থাকবেন চিরদিন তার অন্তরে। আদর্শকে ধরে রাখতে পারলেই জীবন্ত থাকবে স্যামুয়েল—জীবন্ত থাকবে আজন্ম। জীবন্ত থাকবে মানুষের মনে, সমাজের বুকে, জগতের ইতিহাসে। দৃঢ় মন অটল হোল সঙ্কল্পে। নামল কর্ম-ক্ষেত্রে। চলে এলো দুটি বোন মিলে—

চলে এলো হ্যালিফ্যাক্সে পড়াশোনা করতে।

কড়া স্কুল। যেমন শাসন তার তেমন আবার শিক্ষা—দীক্ষার বিশুদ্ধতা। প্রথমটায় একটু বাধ-বাধ ঠেকল। কিন্তু তা দু'দিনের। মন মিলে গেল। সবার সঙ্গে পরিচয় হোল তার। বেশ পরিবেশ। প্রায় সবাই ধর্মযাজকের মেয়ে। তাদের সঙ্গে মিশেও আনন্দ পায় প্রচুর মার্গারেট। নিয়ম বাঁধা কাজ। যেন এক সুরে, এক ছন্দে বাঁধা একটি বীণা। কোথাও নেই তাল-মানের লয়। সব সমান, সমান ভাবে বেজে চলেছে, বেজে চলেছে প্রতিটি তন্ত্রী। একটি মুহূর্ত বিফলে যায়না। যাবার উপায় নেই যে। ঘণ্টা বাজলে পড়া। ঘণ্টা বাজলে খাওয়া। আবার ঘণ্টা বাজলেই ছুটি ও বিশ্রাম।

এমনি করে ছন্দে বাঁধা কাব্যের মত মার্গারেটের জীবন চলতে থাকে। দেখতে দেখতে বড় প্রিয় হ'য়ে উঠল সে প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস ল্যারেটের। ভয় করে মার্গারেট তাঁকে। করে আবার ভক্তিও। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে শ্রদ্ধা।

মিস্ ল্যারেটও কিন্তু সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন মার্গারেটকে। স্নেহ করেন প্রচুর।

কেনই বা ভালোবাসবেন না? করবেন না কেন স্নেহ?

ও যে নিকষিত হেম। যেমন ওর বাহির তেমন ওর অন্তর। যেমন দেখতে, তেমনি ঠিক লিখতে। পড়া শোনায় সবার চেয়ে আগে চলে মার্গারেট। স্বভাবটুকু মধুর। দৃষ্টিতে মাখা যেন মায়ার অঞ্জন। ভাবে অঙ্গরাগের স্পর্শ। চলার মাঝে তারই প্রতিফলন। কার না মন ভিজবে?

সাথীরা যেন তাদের পরম নির্ভর ভেবে ওকে আঁকড়ে থাকে। মার্গারেট শুয়ে শুয়ে কত গল্প বলে। তৈরী করা গল্প। সবাই স্থির ধীর ভাবে শোনে। যত শোনে ততই যেন বিস্ময় জাগে তাদের মনে। ওদের মন যেন বলে—

বলে একান্ত চুপে চুপে,—তোমার যেমন বোধ রসে, তেমন কাব্যে। যেমন শিল্প-বিচার, তেমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি।

দুটো বছর কেটে গেল। স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন ল্যারেট। এলেন নতুন শিক্ষয়িত্রী। সাহিত্য-বোধ আছে। আছে অদ্ভুত মেধা কলিন্সের কিন্তু পড়ান তিনি উদ্ভিদ-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা আর শরীর-বিদ্যা।

তাকে পেয়ে মার্গারেটের মনে জাগল নতুন প্রশ্ন—জাগল নতুন জিজ্ঞাসা। বলে বসল একদিন মার্গারেট, বলে বসল কলিন্সের কাছে,—'মরণেই কি জীবনের শেষ?' ······বিস্ময় লাগে শিক্ষয়িত্রীর—

বিস্ময় লাগে তের বছরের মেয়ের মুখে জীবের আদি জিজ্ঞাসা শুনে।

ছোট্ট একটি প্রশ্ন। কিন্তু এ যে বহন করে অনন্তের সংবাদ। অনাদির ঠিকানা। জন্মান্তরের কথা। কোথায় যায় মানুষ মৃত্যুর পরে? কি হয় তার?

মার্গারেটকে ডেকে নেন কলিন্স। প্রশ্ন করেন। নানা প্রশ্ন। নানা জিজ্ঞাসা।

এক একটি করে কথার জবাব দিয়ে চলল মার্গারেট।

অভিভূতের মত শোনেন—

শোনেন কলিন্স। ভাবেন একমনে, কি অদ্ভুত চিন্তা-শক্তি! চারা গাছটি এর অন্তরে যে অরণ্যের মর্মর!

বড় ভালো লাগল তাঁর। কাছে কাছে রাখেন। বিশেষ ভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দিতে থাকেন মার্গারেটকে কলিন্স।

আর এক দিনের একটি প্রশ্ন—

আচ্ছা, 'ভগবান আছেন বিশ্বাস করি, কিন্তু তাঁকে জানতে চাই, বুঝতে চাই।'

ঠিক এমনি একটি জিজ্ঞাসার ঝড় জেগেছিল বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্তের মনে। বলেছিল, 'আমি ট্রুথ চাই, প্রুফ চাই।' বলেছিল, ঈশ্বর-সন্ধানের বেদনা লয়ে বুকে।

এলো বুঝি মার্গারেটের জীবনেও সেই স্বপ্নের বেদনা। বিরহের কান্না। ভগবানকে জানতে চায় সে। বুঝতে চায় তাঁর মহিমার মুগ্ধ প্রকাশ।

এই তো ভক্তের সার্থক প্রশ্ন। অনুসন্ধানের তৃষ্ণা জাগলেই চোখে আসে বিরহের কান্না। আর বিরহের কান্না এলেই অন্তর যায় বিধুর হয়ে। মগ্ন মন তখনও পাওয়ার

বেদনা থেকে চায় মুক্তি। চায় সুন্দরের দর্শন-স্পর্শন। চায় সব সময়ের জন্যে নামের মোহে লেগে থাকতে। এতটুকু ক্ষণ, কনাও বিফলে যেতে দেয় না। আর তা না দিলেই তো তিনি তুষ্ট। ভক্তের বসতি প্রীতিতে—ভগবানও তখন নেমে আসেন, নেমে আসেন তার স্বর্ণসিংহাসন ছেড়ে ভক্তের অন্তরকে তীর্থান্বিত করতে।

ছোট্ট মেয়ে মার্গারেট। কিন্তু তার অন্তরে যে অনন্ত জিজ্ঞাসা। অসীমের অনুষ্ঠান। একেই বলে জীবন-জিজ্ঞাসা। আত্মানুষ্ঠান। কলিন্স দিলেন উৎসাহ, উদ্দীপনা।

ঈশ্বরের ঠাঁই আত্মায়। আত্মাকে বিশুদ্ধ করতে হয় নামামৃতের সুধায়। তার পরে দর্শনলোভন আকুতি নিয়ে খোঁজ তার স্বরূপটি। জানো নিজেকে। দর্শন কর তোমার মাঝের সুপ্ত শক্তিকে। দেখ, তিনি কে? তিনিই সত্য। তিনিই ব্রহ্ম। আর তিনিই ধ্যানের দেবতা। তোমার সুন্দর। তোমার আরাধ্য। তোমার জীবন দেবতা। তাকে জানতে হোলে যে আগে চিনতে হবে নিজেকে। মানুষের অন্তরই তীর্থ। আর সেই তীর্থের অধিপতি যে অন্তরেই রয়েছেন বসে। বাইরে নয়। ভেতরে। অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠো অন্তরের। তবেই তাঁকে জানতে পারবে। দেখতে পারবে। মার্গারেটের জীবন প্রভাতে কলিন্স এলো যেন ভোরের বিহগের মতো। শোনাল নতুন গান। নতুন সংবাদ।

জীবনকে জানো। জানো নিজেকে। খোঁজ অন্তর। মীমাংসা হবে সব সমস্যার। মিলবে মহাজিজ্ঞাসার জবাব।

ভজনালয়ে গিয়ে গায় না ভজন মার্গারেট। চুপটি করে বসে থাকে নীরবে। আর সবাই তো স্বর তুলেছে সপ্তমে। কিন্তু মার্গারেটের নয়ন দুটি মুদ্রিত। সে যে ডুব দিয়েছে, ডুব দিয়েছে আত্মরতির সুখ-সায়রে। তলিয়ে গেছে মনের গহনে। শুনছে আবিষ্টচিত্তে, শুনছে হৃদ-বিহারীর স্বরসঙ্গীত। কি অপূর্ব! কি মধুময়! কি মন কাঁদান ধোয়া কণ্ঠ। তলিয়ে যায় আরো। নিবিড়ে। গভীরে। দেখে আলো জ্বলেছে। আলো জ্বলেছে অন্তরের দেউলে। আর সে দিব্য প্রেমের স্নিগ্ধ বিভায় উদ্ভাসিত হয়েছে এক অপরূপ তনু-শ্রী। কি ছাই জ্ঞান থাকবে আর? এবারে সে বধূ বেশ ধরেছে। জানাচ্ছে তার জীবন দেবতার চরণে আকুল আকুতি। বলছে যেন চুপি চুপি,—ওগো, এমন সহজ হয়েই থেকো তুমি,—থেকো আমার বাহু-বন্ধনে। আমার ধ্যানের দেউলে। যে আলো জ্বাল্‌লে, যে দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত করলে অন্তর, ঠিক তেমনি থেকো তুমি আমার স্মরণে, বরণে। হাসিতে, কান্নায়। থেকো সুখে, দুঃখে। কর্মে ও কোলাহলে।

আমাকে কর তোমার চরণের অঞ্জলি। তোমার পূজার পূজারিণী।

৪

জুলাই মাস।

স্কুল গেল ছুটি হয়ে। বড় দিনের ছুটি।

এবারে ঘরে ফেরবার পালা।

বিদায় নিল মার্গারেট—

বিদায় নিল সাথী, সঙ্গীদের কাছ থেকে। প্রস্তুত হোল যাত্রার জন্যে।

অল্প দিনের বিরতি।

কিন্তু মন চায় না যেতে। কলিন্সকে ছেড়ে যাওয়া—সে যেন আরো বিষম ব্যাপার।

অমন স্নেহের সরোবর, পথের দিশারী, তাঁকে যাওয়া কী সহজ সাধ্য কাজ?

কিন্তু তবুও যেতে হোল। সবাই যাচ্ছে যে যার মা-বাবার স্নেহের অঙ্কে। ওরা রইবে কার কাছে?

যাত্রা করল—

যাত্রা করল দুটি ফুলের মত বোন। ট্রেনে চাপল। গাড়ী ছাড়ল। চলল আয়ার্ল্যাণ্ডের উদ্দেশে।

ফুরিয়ে এলো পথ। নামল ওরা ট্রেন থেকে। চাপল জাহাজে।

চলল জাহাজ। চলল নীল জলরাশির তরঙ্গ বন্দনা করে সম্মুখের দিকে। আয়র্ল্যাণ্ডের পথে সফেন ঢেউ। ফেন গর্জিত তরঙ্গ। বড় ভালো লাগে মার্গারেটের। এই উদ্বেল—অশান্ত ঢেউগুলোর সঙ্গে তার মনের যেন একটা অদ্ভুত মিল খুঁজে পায় মার্গারেট। একটার পর একটা ঢেউ জাগে। আবার মিলিয়ে যায় অনন্তের অতল অন্তে। মনের সমুদ্রেও এমনি কত ঢেউ জাগছে। অবার অবলুপ্তির অন্ধকারে যাচ্ছে মিলিয়ে। মিলিয়ে যাচ্ছে অনন্তের নিঃসীমায়। যেমন সমুদ্রের বুকে আলোড়ন বিলোড়ন, ঠিক তেমনি মার্গারেটের মনের ক্রান্তিবৃত্তেও প্রশ্নের প্রভঞ্জন। নীরব মার্গারেট। তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে দিগন্ত বিসারী অথৈ সীমাহীন জলতরঙ্গের দিকে। ভাবছে নিবিষ্ট মনে, ভাবছে—আর কতদূর, কতদূর আইরিশ তটরেখা!

রাত্র গভীর হয়ে আসে। কিন্তু ওদের চোখে আসেনা ঘুম। জেগে থাকে দুটি বোন। জেগে থাকে সারাটা রাত পথের দিকে তাকিয়ে।

এ আবার কেমন ভাব?

বারো বছরের মেয়ে মার্গারেট। তার মনে এ উৎকণ্ঠার ঝঞ্ঝা কেন? কোথায় থাকবে ঘুমে অচেতন হয়ে, তুলতে হবে ডেকে, তা নয়, রাত জেগে তাকিয়ে আছে বাইরের পানে?

কেন থাকবে না?

সংসারে যারা নিয়ে আসে একটি ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণচেতনা, তাদের যে সব কাজই স্রোতের উজানে। সূর্য যখন জাগে, তারা তখন ঘুমায়। রাত্রে বসে থাকে যেন কার অভিসারের আশে। সাধারণের কাছে যা শোভন, ওদের কাছে তা যেন অসহ্য, অশোভন। সবার যা প্রেয়, ওদের কাছে তা উপেক্ষা।

জাহাজের সব লোকের চোখে ঘুম। কেবল জেগে ওরা দুজনে। নীরব রাত্রির সঙ্গে যেন আলাপ করে চলেছে, খবর জানছে কূলের। কূলের খবর জানলে আর ভাবনা কি? কূল পেলে যে আলো মিলবে। সেই প্রজ্ঞার আলো। থাকবে না আর রাত্রি। অবসান হবে বিভাবরীর। জ্বলবে উজ্জ্বল দীপ—স্বাতীর মত উজ্জ্বল। বিকীর্ণ হবে অপূর্ব রোশনাই। কেটে যাবে মনের মেঘ। মিলবে পরা সত্যের সন্ধান। তাইতো মার্গারেট একটু স্বতন্ত্র। একটু আলাদা সবার থেকে।

মা কাজ করছে লণ্ডনে। থাকে ছোট ভাইটিকে নিয়ে। যখন জাগে স্বামীর কথা অন্তরে, তখন আসে মন্থর হয়ে কর্ম প্রবাহ। দুটি চোখ ফেটে নামে কান্নার অশ্রু। তিন বছরের ছেলেটি এসে জড়িয়ে ধরে মায়ের গলা। অমনি চোখের জল মুছে ফেলে মা। টেনে নেয় কোলে। চুমু দেয় ললাটে। সকল দহন দুঃখের অগ্নিকে নির্বাপিত করে স্নেহের শীতল তরঙ্গ।

এই ছোট ছেলেটিকে নিয়ে এলো মা ক্লিটউডে। এলো দেখা করতে মার্গারেটও মা-র সঙ্গে। ছুটি ফুরিয়ে এলো। যাবার সময় হোল ওদের। মা বললে ছেলেটির হাত ধরে মার্গারেটকে—'খুকু' একে তুই নিয়ে যা।'

কোথায়?—বেলফাষ্টে দাদুর কাছে।

দাদুর নাম হ্যামিল্টন। কি করে? ছিল কর্ক ব্যবসায়ী। কাজ করছে না এখন আর সে। ছেড়ে দিয়েছে বহুদিন হল। কিন্তু কি ছাই দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলবার সময় আছে তার।

দিন কাটছে রাজনীতি নিয়ে। ভোর হলে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে—বিপ্লবী কর্মী। জ্বলছে নিয়ত বিদ্রোহের আগুন তার বুকে। 'তরুণ আয়ার্ল্যাণ্ড সঙ্ঘে'র একনিষ্ঠ কর্মী। নিষ্ঠাবান নেতা। গ্ল্যাডষ্টোনের 'সংস্কার আইন'কে ধ্রুবতারা করে লড়ছে। লড়ছে অন্নরিক্ত, ক্ষুধাক্লিষ্ট চাষীদের হয়ে।

তাদের বিলিয়ে দেবে জমি। সংস্থান করে দেবে রুটির।

এর জন্যে বিপদ কি কম গেছে?

কতবার মুখোমুখি হয়েছে নিশ্চিত মৃত্যুর—বরণ করেছে কারার শৃঙ্খলকে আশীর্বাদের মতো।

সে কি একবার, দুবার?

বহুবার এমন বিপদ বন্ধুর পথ মাড়িয়েছে হ্যামিল্টন ফিবার। শুদ্ধ করেছে নিজেকে, শুদ্ধ হয়েছে বিপদের আগুনে।

সব কথাগুলোই মার্গারেটের মনে চাঞ্চল্য জাগিয়ে দেয়। মন-মুগ্ধ হয় দাদুর কথা ভেবে। ইচ্ছে হয় তার, ইচ্ছে হয় দাদুর মতো জনতার জোয়ারে ঝাঁপ দিতে। দেশের, দশের কাজে আত্মোৎসর্গ করতে।

দাদু যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বাইরে, মার্গারেটের মন তখন আকুল হয়ে যায়। চায়, ছুটে যেতে দাদুর পিছু পিছু।

বুঝল দাদু, বুঝল তার নাতনীর মনের ভাব। দেখল সে মার্গারেটের মধ্যে উদ্দীপনার আলো। শুনল অরণ্যের সঙ্গীত। সমুদ্রের গর্জন।

এ তো যে সে মেয়ে নয়?

'টাইরণের নোবল্-বংশের মেয়ে ও,'

ওর মাঝে আগুন থাকবে না তো কি! লোকের কাছে গর্বভরে এই বলে নাতনীর পরিচয় দেয় হ্যামিল্টন ফিবার।

দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করল মার্গারেট। দীক্ষা নিল দাদুর কাছে, দীক্ষা নিল প্রণতির। উৎসর্গ করল নিজেকে দেশ মাতৃকার চরণে।

ছুটি এলো ফুরিয়ে। ফিরে যেতে হবে এবার। ফিরে যেতে হবে হ্যালিফ্যাক্সে কলিন্সের কাছে। কিন্তু তাই বলে কি মার্গারেটের উদ্যম কমে? মার্গারেট বাক্স সাজায় বই দিয়ে। দাদু বলে দেয় বাছাই বাছাই বইয়ের নাম। কেবল কি তাই? নিজে এনে সাজিয়ে দেয় সুন্দর করে বাক্স। সেই মিল্টন, সেক্সপিয়ার, রবার্ট এলস্ মারের জীবনী, আরো কত কত বই! রাজনৈতিক প্রবন্ধ, বিদ্রোহের কাহিনী আর বিদ্রোহীর স্মৃতিকথা।

মার্গারেট মহা তৃপ্তি ভরে বইগুলো গুছিয়ে নেয়। মনে ভাবে, বেশ কাটবে রবিবারের বেলা দুটো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মনের নেপথ্যে এসে উঁকি দেন যেন তার প্রিয় শিক্ষিকা কলিন্স! একটু ভয় জাগে মনে। ভাবে মার্গারেট, এগুলো যদি পড়তে না দেন, তবে কি হবে?

কেটে গেল শঙ্কার মেঘ। বললেন না কিছু কলিন্স। হস্তক্ষেপ করলেন না ওর ব্যক্তি-স্বাধীনতায়।

কেনই বা করবে? মার্গারেটকে যে কলিন্স ভালো করেই জেনেছে। চিনেছে মন দিয়ে।

সবার থেকে বিযুক্ত মার্গারেট। ওর জীবনের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে পারে না কেউ। কেমন করে পারবে? ও যে আদর্শকে জেনেছে জীবনের প্রথম ও প্রধান বলে। এক পা স্খলন ঘটে না। একটু ত্রুটি নেই কোন কাজে। মিথ্যা, ছল ও প্রবঞ্চনার যেখানে গন্ধ, মার্গারেট সেখান থেকে চলে যায় দূরে—বহু দূরে। তাই তো কেউ বলে—বলে কি না—মার্গারেট অহঙ্কারী। আত্মগর্বী। এ সব কথাগুলোই হয় কিন্তু ওর অন্তরালে। সামনে এসে পড়লে সবাই চুপ। কথাটি নেই মুখে। যা বলে, তাই মেনে নেয় একবাক্যে। কেউ আসে পড়া নিয়ে। বলে—বুঝিয়ে দাও। আবার কেউ বলে ছাত্র-সমিতির কথা। কারণ মার্গারেট যে ছাত্র-সমিতির একজন আসল পাণ্ডা!

দিন পেরিয়ে গেল অনেকগুলো। পরীক্ষা এসে গেছে। স্কুল জীবনের শেষ পরীক্ষা। ভাবনা জাগে মনে মার্গারেটের—যেন ভালোভাবে পাশ করতে পারি।

এ প্রার্থনার নীরব অর্ঘ্য বুঝি তার জীবন-দেবতার উদ্দেশেই অর্পিত হোত থেকে থেকে।

হ'য়ে গেল পরীক্ষা। পাশ করল মার্গারেট। পাশ করল সম্মানের সঙ্গে। বিজয়ের আনন্দে বিজয়িনী আশাতীত তৃপ্তি পেল। কিন্তু মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল তার।

কেন?

ছেড়ে যেতে হবে সবাইকে। কলিন্সের স্নেহ থেকে, তার ভালোবাসা থেকে আজ যে ওকে নিতে হবে বিদায়। এ ব্যথা মার্গারেটের মনে যে এমনি ভাবে আগুন ধরিয়ে দেবে, তা ভাবে নি সে পূর্বে একবারও। কিন্তু জীবনের বৈচিত্র্য এখানেই। কত স্নেহের জন, কত ভালোবাসার পাত্র এসে ভিড় করে জীবনে। আবার দু'দিন পরে তারাও চলে যায় দূরে। তলিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল তলে। রেখে যায় শুধু যে যার স্মৃতির দেউলে কয়েক ফোঁটা চোখের জল।

ঝাঁপ দিল মার্গারেট জীবন যুদ্ধের ফেণিল তরঙ্গে। সঙ্কল্প নিলে মনে মনে,—দাঁড়াবে নিজের পায় নিজে।

বললে বন্ধুদের কাছে, 'এবার নিজেরটা নিজেই রোজগার করব।' ভাই-বোনকে বিশুদ্ধ আদর্শের ছাঁচে ফেলে গড়ে তুলবে—এ যেন তার দিন রাতের স্বপ্ন।

বললে আরো,—'যত শিগ্‌গির পারি, মাকে কাজ থেকে অবসর নেয়াব।'

চাকুরীর সন্ধান করতে লাগল মার্গারেট।

বেশী দিন আর থাকতে হোল না বসে। জুটে গেল কাজ। কাজ জুটে গেল শিক্ষয়িত্রীর।

কোথায়?

কেসউইকের একটা বেসরকারী স্কুলে। নাম করা স্কুল। ভালো মাইনে। সম্মানও প্রভূত। মনটা যেন আনন্দে ভরে গেল মার্গারেটের।

কেবল কি তাই?

আত্মীয়দের বুক ভরে গেল গর্বে। এখান থেকে সেখান থেকে আসতে লাগল অভিনন্দন পত্র। কেউ বা দিলে এটা সেটা উপহার! আঠার বছরের মেয়ের জীবনে এ যেন এক অমূল্য সম্পদ।

কাজে যোগ দিল মার্গারেট প্রভূত উৎসাহ নিয়ে। কলিন্সের আদর্শকে মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিল বিনা দ্বিধায়। ছাত্রীদের জীবনে জীবনে মার্গারেট কলিন্সের মতই আত্মপ্রকাশ করবে। শুধু কেবল পড়া-শোনাই নয়—তাদের জীবনের সর্ব দিকের ভ্রান্ত আবরণকে উন্মোচন করে দেবে। ও দেবে তাদের মনে সত্য, সাম্য, মুক্তি ও শুদ্ধের ভাব। দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যেই প্রিয় হয়ে ওঠে মার্গারেট। কেবল ছাত্রীদের কাছেই নয়—প্রধান শিক্ষয়িত্রীও ওর মাঝের গুণগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। এখানে এসে ওর মনে দেখা দিল আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব। কোন পথে যাবে। কোনটা গ্রহণ করবে তাই নিয়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হোল অন্তরে। ওদের পরিবার দিয়েছিল ওকে নিজ ধর্মে দীক্ষা! কিন্তু বিচিত্র মন বিচিত্র ভাবেই করতে চায় আত্মপ্রকাশ। তাইত মার্গারেট উদ্‌ভ্রান্তের মত ভাবে, ক্যাথলিক মঠে নাম লেখাবে—না অন্য কোথাও? মার সঙ্গে আলাপ করেও ব্যর্থ হয়েছে।

তার ইচ্ছা নয় যে, মেয়ে তার পারিবারিক গণ্ডীকে উপেক্ষা করে বাইরের ধর্ম নিয়ে মেতে উঠুক।

মহা বিপদ হোল মার্গারেটের। চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। এক মুহূর্ত আর থাকতে চায়না বদ্ধ-রুদ্ধ পরিবেশে। কি যেন নেই। কি যেন পেতে হবে। কে যেন ডাকছে। ও তন্ময় হয়ে যেত ভাবতে ভাবতে। কেসউইক যেন ওর অন্তরের দুয়ারে জ্বালিয়ে দিয়েছে দীপমালা।

মার্গারেটের তৃষিত অন্তর ছুটে যেতে চায় অনন্তের অভিসারে। চায় উন্মুক্তির আনন্দ।

হে পথের দিশারি! তুমি তো সব জানো। জানো আমার অন্তর নিরুদ্ধ ঝড়ের গতি। তবে যদি তাই জানলে, কেন আর বেঁধে রাখো আমায় এমন দ্বন্দ্বের অন্ধকারে? পথ করে দাও চলবার। দাও জালিয়ে আলো। আমি তোমার অভিসারে যাত্রা করি।

১৮৮৭ সনে মার্গারেট নতুন কাজ নিয়ে চলে এলো—

চলে এলো কেসউইক ছেড়ে রাগ্‌বির অনাথ আশ্রমে।

ক্ষুদ্র পরিবেশ। দীন, দুঃখী আর দরিদ্র নিয়ে এই শিক্ষা কেন্দ্রটি। মাত্র কুড়িজন মেয়ের দায়িত্ব নিতে হোল মার্গারেটকে। আর এই কুড়িজন নিয়েই তো এ কেন্দ্রটি।

দারিদ্র্যের সঙ্গে এই প্রথম পরিচিত হোল মার্গারেট। বেঁচে আছে স্কুলটি জনসাধারণের দয়ার খয়রাতিতে। মার্গারেট তারই শিক্ষয়িত্রী। সেও ভিখারী বৈ আর কি?

একটি বছর কাটল।

মার্গারেটের নাম ছাত্রীদের মুখে মুখে।

কেবল কি পুঁথির বিদ্যাই শিক্ষা দিচ্ছে?

না।

তবে? যীশুর জীবনদর্শনের পাতাগুলো খুলে ধরে ওদের চোখের সামনে। সেবা-ব্রতে করে উদ্‌বুদ্ধ। সেবাই ধর্ম। আর সেবার মাঝেই প্রত্যক্ষ করতে হবে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। এর পরে এলো মার্গারেট রেক্সহামের সেকেণ্ডারী স্কুলে। একুশ বছর বয়স মাত্র।

তা হোক, বয়সের গণ্ডী ছাড়িয়ে চলে ওর প্রাণ-প্রবাহ। চলে বুদ্ধির স্রোত-ধারা। সবাই যায় মুগ্ধ হয়ে। একান্ত কাছের ব'লে ছাত্রীরা গ্রহণ করে মার্গারেটকে। গ্রহণ করে সমস্ত অন্তর দিয়ে।

খনি অঞ্চল। খেটে খাওয়া মানুষের আবাস ভূমি। মার্গারেটের কাছে এ যেন এক তীর্থস্থান। অবসর পেলেই বাইরে যায় মার্গারেট। দেখে অন্তর দিয়ে নিরন্তর, দেখে শ্রমিকদের জীবনের দুঃখের তপস্যা কত ভয়াবহ—কত নির্মম—কত কঠিন!

দেহের রক্ত জল করে দেয় নীরবে। মালিকদের মুনাফার পাহাড়টা মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় দিন দিন। আর ওরা তারই পাদপীঠে মাথা কুটে মরে। মরে যায় ঘর ভরা অন্ন-রিক্ত স্ত্রী পুত্র রেখে।

এ অসহায় মৃত্যুর জন্যে কাউকে ওরা নিন্দা করে না। ধিক্কার দেয় আপন অদৃষ্টকে। তবুও তারা শেখে না বাঁচার মত বাঁচতে। কেউ জালিয়ে দেয় না তাদের

আঁধার পথে উদ্দীপনের আলো। ইঙ্গিত দেয় না মৃত্যু-জ্বাল আবেষ্টনী থেকে জীবনের প্রশস্ত-পথের।

বড় ব্যথা পেল মার্গারেট। জ্বলে উঠল তার অন্তরে ব্যথার বহ্নি। মানুষ যে এমন করে বাঁচতে পারে, সে কথা কল্পনায় আসেনি কোন দিন। কিন্তু বস্তি আর শ্রমিকদের যৌথ আবাস, মার্গারেটের জীবনের আর একটি দুয়ার দিল খুলে। সঙ্কল্প করল মার্গারেট, গ্রহণ করল পবিত্র শপথ। দীন, দরিদ্রের মুখে সে অন্ন দেবে। মুছে ফেলবে তাদের চোখের জল। নির্বাপিত করবে অন্তরের দহন জ্বালা। নিয়ে আসবে উন্মুক্তির দিগন্তে—শোনাবে জীবনের জয়গান। বাঁচার মত বাঁচতে হবে তাদেরও।

যারা অসহায়, যাদের চোখের জলের খবর নিলে না কেউ—মার্গারেট দাঁড়িয়ে থাকবে, দাঁড়িয়ে থাকবে অতন্দ্রিত প্রহরীর মত তাদেরই শিয়রে।

হৃদয় দিয়ে হৃদি। হৃদয় মেলাতে হবে হৃদয়ে। প্রসারিত করতে হবে অনুভূতির প্রাঙ্গণে। আনতে হবে মমতার মাধুরী। দিতে হবে তাকে মিলিয়ে, মিলিয়ে দিতে হবে মানুষের কান্নার অশ্রু-উৎসে। তার পরে সুন্দরের ধ্যান। কর্মের ফেনিলে জীবনের জয়যাত্রা।

মার্গারেট এ সত্যটি করল উপলব্ধি। হোল তার জীবন প্রসূনের মত প্রস্ফুটিত। খুলে গেল হৃদয়ের দুর্গ-দ্বার।

কিন্তু কোন পথে সে করবে প্রথম পদপাত?

সম্মুখে উনবিংশ শতাব্দীর উত্তাল উদধি। জরা, জীর্ণ পুরানো পৃথিবীর বুকে প্রবল ভূ-কম্পন। নতুনের প্রাণ চেতনায় জাগ্রত জনতার গগনবিদারী বিঘোষণ। এই আবর্ত ক্ষুব্ধ বিশ্বের কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে মার্গারেট?

কোথায় গিয়ে খুঁজে পাবে তার জীবনের রাজপথ?

কাজ নিলে মার্গারেট?

করল আত্মপ্রকাশ। দাঁড়াল গিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে। দাঁড়াল 'সেণ্ট মার্ক চার্চের' একজন সেবিকা হ'য়ে।

নাম পড়ল তার ছড়িয়ে। এগিয়ে এলো সমাজ। মানুষের অন্তরায়তনে পাতা হয়ে গেল তার শ্রদ্ধার কুশাসন।

মাথা তুলে দাঁড়াল মার্গারেট—

দাঁড়াল অনাথ, আতুরদের পার্শ্বে। বিকাশ লাভ করল তার অন্তরের প্রসুপ্ত শক্তি। ব্যথিত জনকে পরিবেশন করল মার্গারেট সান্ত্বনার সুধা-ধারা। দাঁড়াল গিয়ে আসন্ন-প্রসবা মেয়েদের শিয়রে। জানাল নবজাতককে অভিনন্দন। বেদনাক্লিষ্ট দেহ-দহনে ছড়িয়ে দিল শান্তির বারিধারা। নিয়ে এলো আরোগ্য-নিকেতন। মুছিয়ে দিল দুঃখীর অশ্রুসিক্ত চোখ। বাড়িয়ে দিল অভয়ের হস্ত অভাবের হাহাকারে। শীতল করল শ্রান্ত, ক্লান্ত, আর্ত, পীড়িতদের কল্যাণী লক্ষ্মীর মত মমতার স্পর্শমধুরে। সবাই এসে দাঁড়াল মার্গারেটের ছায়ামেদুর প্রচ্ছায়। কিন্তু অমান্য হোল চার্চের বিধান।

কেন?

সম্প্রদায়ভুক্ত না হলে চার্চ করবে কেন তাদের সাহায্য?

সে কি ! মার্গারেট যেন হারিয়ে ফেলে খেই।

একটা অশ্রান্ত তরঙ্গ ফেনিল খান্ খান্ হয়ে ভেঙে গেল অবরোধের আঘাতে। এ বিধান কিছুতেই মানতে পারবে না মার্গারেট। এমন দাসত্বের শৃঙ্খল পরতে পারবে না সে।

যারা দরিদ্র, যারা সর্বহারা, তাদের আবার দল কি ? যাদের বেদনার সমুদ্রে স্পন্দিত হয়ে ওঠে একই দুঃখের তরঙ্গ, বলি তাদের কি আর শ্রেণী আছে ? তারা যে সব এক দলের দলী। একই শ্রেণীভুক্ত। ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের বঞ্চিত করা—সে তো আত্মপ্রবঞ্চনা—আত্মপ্রতারণা।

মার্গারেট তা পারবে না। ছেড়ে দিলে কাজ। বেরিয়ে এলো বলয় বন্ধন থেকে। উদ্ঘাটন করল চার্চের আভ্যন্তরীণ রূপ। দেখিয়ে দিল মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে ধূর্ত দরদের অন্তরালের নির্মম মানুষ। দেখিয়ে দিল তাদের হৃদয়হীনতার বাস্তব-চিত্র। লিখল প্রবন্ধ 'নর্থওয়েলস্ গার্ডিয়ানে।' সমাজে এলো অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য। জ্বলন্ত হয়ে উঠল মানুষের প্রাণ-বহ্নি। সাড়া পড়ে গেল দিকে দিকে।

এবারে লিখবে মার্গারেট—

প্রচুর লিখবে। সেবা করবে দরিদ্র নারায়ণের। টেনে আনবে বিভ্রমের দুর্গ-প্রাকার থেকে। ভেঙে ফেলবে সংসারের তিমির-স্তম্ভ। রাত্রির বুকে আনবে আলোর অট্টহাসি।

কলম ধরল। জাগ্রত করল প্রসুপ্ত চেতনা। জনশিক্ষার জন্যে স্থাপন করল পাঠাগার। ক্ষুধার খোরাক জোগাল অন্নরিক্তদের নোঙ্গরখানার মাধ্যমে। ক্লিন্নজীবনে এনে দেওয়ার চেষ্টা করল সুস্থ সাবলীল ছন্দ। যারা অসহায়, চলে যায় যাদের বুকের উপর দিয়ে ধনীজনের রথের চাকা, সেই সব ম্লান মূঢ লাঞ্ছিতদের জীবনকে বিকশিত করবার চেষ্টা পেল মার্গারেট। তাই তো মার্গারেট উপলব্ধি করতে লাগল তাদের মর্ম-বেদনা।

এ ব্যথার বোঝা তো ঈশ্বর প্রদত্ত নয়। মানুষেরই সৃষ্টি। স্বার্থোদ্ধত দাম্ভিকদের অভিশাপ। ইতিহাসের নির্মম ইঙ্গিতে তবুও জাগে না ঝিমানো যুগ। ভাঙে না তাদের স্থবির রজনীর ঘুম। অপসৃত করবে মার্গারেট—

অপসৃত করবে শতাব্দীর পুঞ্জীভূত গ্লানি। প্রতিষ্ঠিত করবে নৈকট্যের মন্দির। আকাশে ওড়াবে মানবধর্মের শাশ্বত পতাকা। সে পতাকায় লেখা থাকবে মুক্তির মহামন্ত্র। জীবনের জয়গান। সুন্দরের অভয় বাণী। আর লেখা থাকবে মানুষের পবিত্র অধিকারের মঙ্গল বাক্য।

কুমারী মার্গারেটের জীবন গ্রন্থের প্রথম পত্র খুললে দেখা যায় প্রাণমন্ত্রের মোহন মূর্তি। দুর্জয় তপস্যার নৈষ্ঠিক সঙ্কল্প। করতে হবে মানব মৈত্রীর তীর্থপীঠ রচনা। সর্বমানবের মিলনমন্দিরে ওড়াতে হবে সমন্বয়ের ধ্বজা। শোনাতে হবে বিশ্বমৈত্রীর সঙ্গীত।

তাই তো মার্গারেটের অন্তর-লক্ষ্মী এসে রূপ পরিগ্রহ করেছে বাইরে। আত্ম-প্রকাশ করেছে হৃদয়-ধর্মের মধুর ছন্দ নিয়ে।

শিখা আলো দেয় তার নিজের আঙ্গিনায়, ঘুচে যায় ধীরে অন্ধকার। মার্গারেট সেই দীপ জ্বালান প্রদীপ। দীপ্তিময়ী শিখা। আত্মদগ্ধের অগ্নি।

জীবনের চলার পথে কত সাথী আসে। আবার তারা চলে যায়। স্মৃতির সমুদ্রে এক একটি তরঙ্গ জাগে। মিলিয়ে যায় আবার তা মহাকালের পদ-প্রচ্ছায়ে। নিয়মের রাজত্বে তারা বাঁধা পড়ে থাকে না। ধেয়ে চলে গতির গমকে। নিয়ে আসে আনন্দের সঙ্গীত। কিন্তু রেখে যায় বিরহের কান্না—বিচ্ছেদের বেদনা। রচিত হয় জীবনের দুঃখময় অধ্যায়। যে পুষ্প যৌবন বসন্তের কুঞ্জকাননে ফলের প্রত্যাশায় প্রস্ফুটিত হয়ে নিয়ে এলো বুকে, না পাওয়ার দহন মার্গারেটের নিবেদিত যৌবন প্রসূনটিও সেই না-পাওয়া কান্নারই একটি অর্ঘ্য।

পাখীর মত উড়ে এসেছিল এক তরুণ কুমার—এসেছিল মার্গারেটের চৈতন্যের আকাশে। নাম তার গেলোয়া। এলো নব বসন্ত ওদের হৃদয়-দ্বারে। ফুটল চেতনার কুঞ্জে বিরহের রঙিন ফুল। অনুরাগের পরিধি হয়ে গেল পরিব্যাপ্ত। দুজনকে দুজনার বড় কাছের বলে মনে হোল। আলাপ জমল। চিনল। জানল। ভাল বাসল। অপরিহার্য হয়ে উঠল একজন আর জনার জীবনে।

প্রেম করে জীবনকে মহান। মৃত্যুকে করে মহিমান্বিত। পরিব্যাপ্ত করে হৃদয়কে। ক্ষুদ্র জগৎ থেকে নিয়ে যায় মনকে অসীমে। সুন্দরের সাধনায় প্রধাবিত করে অন্তর। কিন্তু হতভাগ্য গেলোয়া অব্যক্তের বেদনা নিয়েই বিদায় নিলে। মনের কথাটি আর বলা হোল না। সে সুযোগ ঘটলো না তার জীবনে। নিয়তির নির্মম কটাক্ষ নেমে এলো। গেলোয়া সমাহিত হোল প্রশান্তির কবরে। মার্গারেট ফেলল চোখের জল। হাহাকার করে উঠল বিচ্ছেদ বেদনায়। তারপরে মঙ্গল কামনা করল অন্তরতমের বিদেহী আত্মার। নেমে এলো মার্গারেটের জীবনে রাত্রির অন্ধকারের মত নীরবতা। অন্তর নিরুদ্ধ বেদনায় চিৎকার করে উঠল আহত পাখীর মত। কিন্তু কেউ ফিরে তাকাল না। দু'ফোটা চোখের জল রেখে চলে এলো মার্গারেট চেস্টারে।

নতুন পরিবেশ। অপরিচিত মার্গারেট। একাকী দিন গুণে যায়। বিচ্ছেদের দহন জ্বলে বুকে। কেঁদে ওঠে প্রাণ। চোখের জল মোছে গোপনে। দীর্ঘশ্বাসে বিদীর্ণ হয়ে যায় মন। আর ভালো লাগে না কিছু। জীবনের এ কোলাহল যদি চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়, যায় যদি নিভে প্রদীপের ক্ষীণ রোশনাইটুকু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে, তবুও খেদ থাকবে না মার্গারেটের মনে। সে আজ এ অশান্তির দহন থেকে মুক্তি চায়। জীবনের গান থামিয়ে দিতে চায়।

মা ও ভাইদের কাছে চলে এলো মার্গারেট।

কয়েকটা দিন কেটে গেল এমনি করে। বিষণ্ণ মনটার সঙ্গে গোধূলির আকাশটার যেন অদ্ভুত মিল খুঁজে পায় মার্গারেট। কাঁদে—নীরব রাত্রির জাগ্রত প্রহরগুলো করে প্রত্যক্ষ। ভোর হয়ে যায়। বিনিদ্র রাত কাটে।

কিন্তু এমনি করে কি থাকতে পারে মানুষ? সান্ত্বনার সুর জাগে অন্তরে। দুঃখের দহনে নিজেই ছড়িয়ে দেয় দহন-শান্তির বারি। ধীরে ধীরে ফিরে আসে সহজে। বেদনা এসে রূপ নেয় সৃষ্টির মাঝে। মধুর মমতা মাখা সে সৃষ্টি। প্রবন্ধ লেখে মার্গারেট। ছাপা হয় 'ডেলী নিউজ', 'রিভিউ অব রিভিউজ' কাগজে। ছড়িয়ে পড়ে নাম।

ধূমায়িত হয়ে উঠেছে তখন হোমরুল আন্দোলনের বহ্নিবন্যা। তারই অগ্নি-দীপ্তি এসে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে আইরিশ তরুণ তরুণীদের মনে। প্রতিষ্ঠিত হোল তার শাখা। সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল মার্গারেট। 'ফ্রী আয়র্ল্যাণ্ড' নামক বিদ্রোহীদের মাঝে খুঁজে পেল মার্গারেট যেন তার পিতার জীবনের আদর্শ। ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্গারেট। লণ্ডন শাখার ভার নিয়ে নিলে স্বেচ্ছায়। হয়ে উঠল একজন বিশেষ বিদ্রোহিনী।

মানুষের মুখে মুখে মার্গারেটের নাম। সর্বত্রই তার বিজয় বিঘোষণ। স্কুলের ছাত্রীদের কাছে। সমাজের চোখে, মার্গারেট সাক্ষাৎ শক্তি। ডাকে সবাই। করে আদর। জানায় শ্রদ্ধা। অন্তরের দুয়ার দেয় খুলে। আমন্ত্রণ করে সকলে। কিন্তু ভীতির সঞ্চার হয় মার্গারেটের মনে। কেন?

পাছে সইতে হয় আঘাত। বিচ্ছেদের দহন। তাই নিজেকে গুটিয়ে চলে। বুভুক্ষিত মনটাকে দেয় সান্ত্বনা। সংযম ও ত্যাগের কঠিন বেষ্টনীর মধ্যে ধরে রাখে নিজেকে নিজে। কিন্তু তবুও এড়াতে পারল না মার্গারেট—এড়াতে পারল না হৃদয়-ধর্মের দাবীকে। মাঝে মাঝে একক জীবন যেন বড় দুর্বিসহ লাগে। অন্তরের গৈরিক পথ অসহ্য হয়ে ওঠে। একটু আশ্বাস চায় জীবনের যৌবন। কি সাধ্য তার অস্বীকার করবে তাকে? অন্তরের দাবীর কাছে কাঠিন্যের কারাগার যে ভেঙে যেতে চায়। প্রবল আবেগ-তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব বন্ধনের লৌহ-বেষ্টনী। আর একটি তরুণ বন্ধুর প্রতীক্ষায় প্রমত্ত মন আকুল আশায় দিন গুণে যায়। এবারে মন স্থিরসিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভাবনার সমুদ্র থেকে চলে এসেছে উত্তরণের বন্দরে। ঘর বাঁধবে মার্গারেট। বিয়ে করবে সে। মাতৃত্বের তৃষা

শুষ্ক অন্তরে পান করবে পরিতৃপ্তির সুধা মধু। স্থির ধীর সমাহিত ভাব আনবে ফিরিয়ে জীবনে।

কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। ঝরে গেল যৌবন বসন্তের ফুলকলি। বৃন্তচ্যুত হোল কোরকের পুষ্প। অবশেষে রইল শুধু দু'ফোটা আঁখি জল। না পাওয়ার বেদনা।

আশা ছিল আকাশ বিস্তৃত। কিন্তু রূপ পেল সে আশার আশিস্ বেদনার মরুতৃষায়। ব্যর্থতার অসহায় আবেদন নিয়ে ফিরে এলো মার্গারেট, ফিরে এলো বৃহৎ জগৎ হোতে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের অন্ধকার নির্জনে। মার্গারেটের স্থান পুরণ করল আর একটি তরুণী। মুছে দিলে তরুণের জীবন থেকে মার্গারেটের স্মৃতি-চিহ্নের উজ্জ্বল আখরগুলো।

৭

তবে কি তার জীবন্ এমনি করেই কাটবে? আসবে না কি তার নিবেদিত প্রেমের প্রসূন বাসরে একজনও মালাকার? আসবে না কি পিয়াসের তৃষা নিয়ে একটিও মধুকর? তবে কি এ ফুল থাকবে বঞ্চিতের বেদনা নিয়ে অনাঘ্রাত?

কেঁদে ওঠে মার্গারেট নোবলের অন্তর। চেতনায় ঘনিয়ে আসে ঘোর। নির্জন অন্ধকারে ব:স থাকতে চায় একাকী। মনের নেপথ্যে এসে ছায়ার মত দাঁড়ায় অতীতের দিনগুলো। স্মৃতির গ্রন্থি খুলে যায় মুহূর্তে। করুণ নয়নে প্রত্যক্ষ করে মার্গারেট—প্রত্যক্ষ করে তা অশ্রু সিক্ত নয়নে।

আর ভালো লাগে না দিনের সূর্য। পৃথিবীর 'পর থেকে আসক্তির বাঁধন যায় শিথিল হয়ে। যেন মনে হয় তার নিয়ত, ধরণীর এতটুকু স্থানও বইতে রাজী নয় তার ভার। তাকে যেন বিদ্রূপ করছে আকাশের তারারা। মুখ টিপে হাসছে নিশীথের চাঁদ। নিয়মের রাজত্বে সে যেন একটা বেহিসেবী অনিয়মের মানুষ। ধিক্কার দিলে অদৃষ্টকে। আপন অক্ষম প্রয়াসকে করলে কণ্টক-বিদ্ধ।

মনে পড়ে কলিন্সকে। চলে এলো হ্যালিফক্সে। বহুদিন পরে মার্গারেটকে পেয়ে কলিন্স মহাখুশি। আদর করে টেনে নিলে বুকে। মার্গারেট ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। দ্বিধাহীন কণ্ঠে জীবনের ব্যর্থ অধ্যায় নিবেদন করল কলিন্সকে।

চোখের জল মুছে দিলে কলিন্স। সান্ত্বনা দিলে। আরো নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে আঁকড়ে ধরে বললে কত কথা।

কাঁদতে নেই অমন করে। জয়-পরাজয় তো মানুষেরই জন্যে। আঘাত পেয়ে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? আঘাত না পেলে জীবনের বিকাশ হয় না যে। সুখে হতে হবে বিগতস্পৃহ। দুঃখে নিরুদ্বিগ্ন। তা না হলে মহৎ স্বীকৃতি অন্তর থেকে আসবে না তো। যে মালা গেঁথেছিলে প্রিয়র কণ্ঠে দেবে বলে, সে মালা এবারে দিতে হবে দেবতার চরণে অর্ঘ্য। প্রস্তুত কর নিজেকে তার জন্যে। যে আকুলতা যে আকুতি তোমাকে করছে নিয়ত নিপীড়িত—সে পীড়নের দহন অর্পণ করতে হবে প্রেমময়ের পদ-তীর্থে। তবেই সাধনে সিদ্ধি। তবেই দুঃখ নিশার শেষ যামে ভেসে আসবে কর্ণে জীবন-প্রভাতের মন্ত্রধ্বনি। চেতনায় এসে ধরা দেবে মানস-তীর্থের সম্রাট। প্রাণে আসবে আনন্দের মন্দাকিনী ধারা। চোখ মোছ। তাঁকে ডাক। তাঁকে মানো। নিবেদন কর তাঁর পায় তোমার

কান্নার অশ্রু। কলিন্সের শান্ত মধুর সান্ত্বনায় অনেকটা আশ্বস্ত হোল মার্গারেট। ফিরে পেল সম্বিৎ। চলে এলো লণ্ডনে।

যে ফুল দেব-ভোগ্যা, যে অন্তর নিবেদিত তাঁকে, কেমন করে ঠাঁই হবে তার অনিত্যের ঘরে, ইন্দ্রিয়ের পাড়ে? মানসহংসী চেয়েছিল মন। কিন্তু পেল কি? পেল আঘাত আর বেদনা। কান্না আর বঞ্চনা। এবারে সে হৃদয় গেহিনী। অন্তর বাসিনী। হৃদয়রাজ্যের সম্রাজ্ঞী।

যেন ঝড়ের মত উড়ে গেল উনত্রিশটা বছর।

পূর্ণ একটা জীবনের পক্ষে এ বয়সটুকু আর কি? কিন্তু মার্গারেটের কাছে অনেক, অনেক দাম এ সময়টুকুর। অনেক বন্ধুর পথ হয়েছে মাড়াতে। বরণ করতে হয়েছে দুঃখ-দহনকে স্বেচ্ছায়। পান করতে হয়েছে আকণ্ঠ বেদনার গরল।

মনে পড়ে সে দিনগুলো। হৃদয়ের রিক্ত ময়দানে মুঠো মুঠো বীজ বুনল কতবার। কিন্তু একটিও ফসলের অঙ্কুর উদ্‌গত হোল না। কত দিন কত রাত চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছে নীরবে। এলো না কেউ সে নয়ন মুছে দিয়ে আবদ্ধ আলিঙ্গনে নিশ্চিত আশ্রয়ের নীড় রচনা করতে। অন্তরের ফুল বাসরে একাকী জেগে রইল কতদিন, কিন্তু কোন পান্থজনের পদপাত হোল না অভাগীর অভিসার কামনা করে। কতবার না বেরিয়েছে মার্গারেটের আক্ষেপের কণ্ঠ উৎসারিত হ'য়ে 'শূন্য মন্দির মোর।'

বাইরের কাজে বিরতি নেই। কিন্তু অন্তর নিরাসক্ত। যে জিজ্ঞাসার ঝড় একদিন আন্দোলিত করেছিল মার্গারেটের দেহ-মন, আজ সেই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ল তার হৃদয়-তটে।—তবে কি ঈশ্বর নেই? আছে।

ওগো, আমার শূন্য মন্দিরে হোক তোমার পদপাত। জাগ্রত হও আমার ধ্যানে ও মননে। যে রূপে তুমি রূপময় হ'য়ে আছ চন্দ্রে, তারায়, সূর্যে ও কুসুমে, তেমনি রূপমধুর হয়ে ধরা দাও আমার অন্তরায়তনে। চৈতন্যের তীর্থে।

একটি মন ব্যাকুল হলে আর মনটি কি না কেঁদে পারে। একটি অন্তরে আকুলতার কান্না জাগলে অন্তরতমের মনও যায় তখন ব্যাকুল হয়ে। তিনি যে দাঁড়িয়ে থাকেন ভক্তের অশ্রু আতুর অঞ্জলি নেওয়ার জন্যেই।

মার্গারেটের জীবনে এলো সে শুভ লগন।

হৃদয়দ্বারের কবাটগুলো গেল খুলে। ঝাপসা চেতনার কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে উদয় হোল সূর্যের। একটা অনির্বচনীয় আনন্দের সাড়া এলো অন্তরে। বললে মার্গারেটকে তার বন্ধু এরেনজার কুক,—'লেডি ইসাবেল মার্গসন যেতে বলেছেন

তার বাড়ীতে···একজন হিন্দু সন্ন্যাসী নাকি কিছু বলবেন সেখানে। যাবে নাকি তুমি?'

আচমকা একটা ধাক্কা লাগল যেন মার্গারেটের মনের ক্রান্তিবৃত্তে। চনবন করে উঠল মন। এক বাক্যে জানাল সম্মতি। গ্রহণ করল আমন্ত্রণ। পাশ্চাত্য জগতের মানস-কন্যা যাত্রা করল সমুদ্রসঙ্গমে। যাত্রা করল সম্পূর্ণ এক নতুন দেশে। সে দেশ বৃটিশ বিজয়ের অট্ট বিদ্রূপের বাইরে। তাঁর রক্তনেত্রের শাসন সঙ্কেতের ঊর্দ্ধে। সেখানে পরাজয়ের গ্লানি নেই, আছে সমতার শান্তি, সেখানে ভোগের লালসা নেই, আছে ত্যাগের তপস্যা। সেখানে মৃত্যুর ভয় নেই, আছে অমৃতের উৎসঙ্গ।

কুমারী মার্গারেট যাত্রা করল সেই তপোবৃদ্ধ ভারতের মানসপুত্রের দরবারে। যাত্রা করল তার জীবনের আদি জিজ্ঞাসার সমাধান করতে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দ।

বাইরে শীতের হিমবায়। কুয়াশার কুজ্ঝটিকা। সমস্ত পশ্চিম লণ্ডন ঝিমুচ্ছে, ঝিমুচ্ছে তুষারের তন্দ্রায়।

রবিবার। নভেম্বর মাস।

ওয়েষ্ট এণ্ডের একটি বৈঠকখানা।

জমা হয়েছে এসে অনেক লোক—

জমা হয়েছে ইসাবেলের বৈঠকখানায়। তা প্রায় বিশ পঁচিশ জন হবে।

উপবিষ্ট তাদের মাঝে তরুণ তাপস।

আহা কি রূপ! অপূর্ব্ব তাঁর দেহ দীপ্তি! স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আয়ত আঁখি। ললাট-ফলকে অরুণ লেখা। অধরে অমৃত-মধুর হাসি। বক্ষে বিপ্লোত্তরণের বিঘোষণ। চরণে অরবিন্দ। দৃষ্টিতে অগ্নি বিচ্ছুরণ। কণ্ঠে কারুণ্যের নির্ঝর। প্রশান্ত সাগর-সৈকতের ন্যায়। ধীর গম্ভীর নিশীথ রাত্রির মত।

অপলক নয়নে তাকিয়ে সবাই—

তাকিয়ে আছে একত্রিশ বছরের তরুণ সন্নাসীর লোভন লাবনির দিকে। তাকিয়ে আছে, ভারতের জ্ঞান-বৃদ্ধ রাজ-ভিক্ষু স্বামী বিবেকানন্দের দিকে।

ঠিক এমনি সময় ঢুকল—

ঢুকল এসে মার্গারেট নোব্‌ল। সরিয়ে দিল দু'হাতে দরজার পরদা। বসল, একখানা চেয়ারে। বসল বিবেকানন্দের মুখোমুখি।

এ যেন চিত্রভানুর সম্মুখে চারু চন্দ্রাবলীর প্রশান্ত উদ্‌ভাস। এ: যেন চন্দ্রশেখরের পার্শ্বে চিত্তদগ্ধের অগ্নি।

সবাই ধীর, স্থির, মৌন। হোল একটু সঙ্কুচিত মার্গারেট। কিন্তু বলল না কিছু মুখে। রইল শুধু তাকিয়ে, তাকিয়ে রইল পলক বিহীন নয়নে।

কি দেখছে—

দেখছে কি মার্গারেট তার আয়ত আঁখি পাতে?

দেখছে একটি শান্ত সমাহিত সমুদ্র সম্মুখে। দেখছে গৈরিক বসনাবৃত ভারত-আগত ঋত্বিককে।

ওরে, এ যে অপরূপ! পেছনের অগ্নিকুণ্ডও যেন গেছে নিষ্প্রভ হয়ে। নিষ্প্রভ



হয়ে গেছে সাগ্নিক সন্ন্যাসীর তেজোদীপ্তির কাছে। এ যেন অরুণোদয়ের সূর্য। শতদলের মত পরিপূর্ণ। প্রস্ফুট। প্রমুদিত।

এমন ভুবনমোহন রূপ যেন আর কোথাও দেখছে মার্গারেট।

ডুবে যায় গভীরে। নিবিড় মন বিরলে খোঁজে। খোঁজে সেই প্রাণ-হরণকে। আকুল হয়ে চেতনার সমুদ্রে জাগে মন্থন। রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে দেহের শিরা-উপশিরা। ধীরে ধীরে আভাসিত হয়, আভাসিত হয় মনের মন্দিরে অরুণিত সূর্যের মত সে-মূর্তি। পলকে ঝলক জাগে চিত্তে। যুক্ত করে হাত।

জানায় প্রণতি—

প্রণতি জানায় সেই লোচন-লোভন দেব-জ্যোতি যিশুর উদ্দেশ্যে।

এ যে সেই মূর্তি। স্থির হয়ে যায় নয়ন। মৌন হয়ে যায় কণ্ঠ।

কথা আসেনা মুখে। এযে সেই যোগযুক্ত চিত্ত। ঈশ্বরায়িতের লক্ষণ।

সৌম্য, শান্ত, সমাহিত।

মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকে মার্গারেট—

তাকিয়ে থাকে হিন্দু যোগীর দিকে। মন মগন হয় ভাবে।

সহসা চমক লাগে।

তাকায় ফিরে। শোনে উৎকর্ণ হয়ে—

শোনে রাজর্ষির কণ্ঠে মন্দ্র মধুর ধ্বনি—'শিব! শিব! শিব'!

ঝড় জাগে। জাগে ঝড় মার্গারেটের অন্তরে। মন্থর হয়ে যায় বাহির বিশ্বের উদ্যম। হৃদয়-দেউলের দুয়ার যায় খুলে। দোলা লাগে, দোলা লাগে প্রাণ-যমুনার পুলিনে। স্পন্দিত হয় অন্তর। আরো নিবিড়, আরো গভীর গাম্ভীর্যে পান করে—

পান করে মার্গারেট আকণ্ঠ সন্ন্যাসীর কণ্ঠ নিঃসৃত সুধা ধারা।

শুনতে থাকে নিবিষ্ট মনে—

শুনতে থাকে—সভ্যতার আদি ইতিহাস। মানবধর্মের বাণী।

ভারতীয় সাধনার ঐক্য।

আহা কি কণ্ঠ! কি মধুর ছন্দ! এ যেন মন্ত্রের মতো সমুচ্ছ্রিত! বায়ুর মত বেগবান্। ঝর্ণার মত ঝঙ্কৃত।

মুগ্ধ মার্গারেট। ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়তে চায় মন। অধীর হয় চিত্ত। প্রলীন হ'তে চায় যেন সন্ন্যাসীর পদ-প্রচ্ছায়।

কিন্তু সঙ্গীরা বললে কি?

তারা বললে উল্‌টো কথা। পেলনা কিছু খুঁজে, খুঁজে পেল না সন্ন্যাসীর মধ্যে।

বললে—এমন কি নতুন কথা শোনালেন।

কি যেন হয়ে গেল।

করলেন আহ্বান—আহ্বান করলেন বিবেকানন্দ শ্রোতাদের।

এলো তারা। শুধাল প্রশ্ন—ভারতবর্ষের কুসংস্কার কেন খর্ব করছে মানুষের অধিকার? কেন আছে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে অন্যায়ের বোঝা? আর কেনই বা জাতির জীবনে রচনা করছে ভেদাভেদের মন্দির আর মস্‌জিদ?

উঠলেন মুখর হয়ে সন্ন্যাসী। বললেন বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে। শোনালেন ভারতবর্ষের আত্ম-সত্যের বাণী। ভেসে গেছে মন্দির আর মস্‌জিদ, ভেসে গেছে ভারতবর্ষের প্রাণ-তরঙ্গে। তোমরা বঞ্চিত, বঞ্চিত তার খবর থেকে। তাকে জানতে হ'লে, তাকে বুঝতে হ'লে দীক্ষা নিতে হবে মনোধর্মে। বসতে হবে বিরলে। ভাসাতে হবে দেহতরী—ভাসাতে হবে উজানে—অধিদেবতার অনুধ্যানে। খুঁজতে হবে তাঁর স্বর্গ-তীর্থের গৈরিক পথ। সে পথে নেই গির্জা। নেই মন্দির। পাদ্রী, পুরুত ভেসে গেছে সেখান থেকে। সেখানে আছে শুধু আত্ম-রতির সুখ-সায়র। মনো-তীর্থের পবিত্র প্রাঙ্গণ। আর আছেন মনের মানুষ, প্রাণের প্রভু।

'আমার মনের মানুষ যে-রে
আমি কেবল খুঁজি তাঁরে।'

তারা হয়রান এই মনের মানুষকে খুঁজে। তাদের কি আর দৃষ্টি আছে ক্ষুদ্র, খণ্ড স্বার্থের দিকে? তারা নিয়ত চলেছে ধেয়ে—

ধেয়ে চলেছে অখণ্ডের অন্তহীনে। চলেছে লীলাময়ের লীলা খেলার সঙ্গী হ'তে।

এ যে যুক্তি-জিজ্ঞাসার বাইরের বস্তু।

অনুভূতি দিয়ে করতে হয় উপলব্ধি। দেখতে হয় বিভূতিকে। দেখতে হয় নয়ন নিমীলিত ক'রে আঁধারের মাঝে আলোর শুভ কান্তি। তবেই ভেঙে যায় ভ্রান্তির ভেদাভেদে। অভেদ হ'য়ে ওঠে চিত্ত। আনন্দে নৃত্য করে মন। ওগো, ভারতবর্ষকে জানতে হ'লে হও মননশীল। দীক্ষিত হও মনোদীক্ষায়। তবেই পাবে তার আভাস। প্রকাশ। আভাষণ। প্রেম। প্রীতি ও রসন।

মার্গারেটের মনের কোণে বনের ছায়া। মর্মরি তার অন্তরে। স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে সন্ন্যাসীর কথাগুলো। আবেগবিহ্বল মার্গারেট। সন্ন্যাসী করেছে যেন জেহাদ্ ঘোষণা—

জেহাদ্ ঘোষণা করছে মার্গারেটের জন্মলব্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। একটা ঘূর্ণির মতো আবর্তিত হ'তে লাগল—

আবর্তিত হ'তে লাগল মার্গারেটের আশৈশব সঞ্চিত প্রত্যয়ের প্রশান্ত মন। তার আট-সাট অন্তরের প্রাচীর গেল ভেঙে। পরিণত হ'ল—দিগন্তবিসারী প্রান্তরে। উঠতে চায় বিদ্রোহী হ'য়ে মার্গারেট। পড়তে চায় প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে—

ফেটে পড়তে চায় সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে। গর্জন ক'রে ওঠে মন। ইচ্ছে হয় তার, ইচ্ছে হয় প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে সন্ন্যাসীকে! তুফান জাগে বাসনা-বিক্ষুব্ধ মনে। মন্থন করে অন্তর। কি আশ্চর্য!

পরিচিত ছিল যে পৃথিবীটা মার্গারেটের—

ছিল পুরোন প্রতিবেশীর মতো একান্ত কাছের, আজ যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে সন্ন্যাসী, টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে সে সীমিত সীমানার বাইরে। নিয়ে যাচ্ছে নতুনের দিগন্তে! থেকে থেকে করছে কুঠারাঘাত, কুঠারাঘাত করছে তার অভ্রান্ত বিশ্বাসের বেদীমূলে। এ কোন্ বাণী? এ কোন নতুন পৃথিবীর সংবাদ?

বোঝে না অবুঝ মন।

খুঁজে পায় না জবাব মার্গারেট, জাগে ঝড় অন্তরে। ধেয়ে চলে নিয়ত, ধেয়ে চলে উত্তাল উদধির মতো।

ভাঙল সভা।

এলো ফিরে মার্গারেট—ফিরে এলো ঘরে।

কিন্তু মন তো মানে না। ডুবে যায় গভীরে। নিভৃত কক্ষের নির্জনে বসে ভাবে কত কথা। সরে আসে বাইরের পৃথিবী থেকে, সরে আসে অন্তর্লোকে—চিন্তার গভীরে। নিবিড় নিশুতির মতো যায় নির্বাক হয়ে। খসে পড়ে চোখের পাতা থেকে নিশীথ রাত্রির ঘুম। মেলে দেয় ডানা, ডানা মেলে দেয় আকাশ-বিসারী ভাবনার শূন্যে। জাগে কত কথা। মাগে আকুল হয়ে যথার্থ জবাব। যায় আবার তা লীন হয়ে, লীন হয়ে যায় মনের ক্রান্তিবৃত্তে। লাগে বিস্ময়। তাকিয়ে থাকে মার্গারেট—তাকিয়ে থাকে বিমুগ্ধের মতো।

কেটে গেল অনেকটা সময়।

সহসা চমকে ওঠে মার্গারেট। জাগরণ হয় তার প্রসুপ্ত চেতনায়। জাগে শিহরণ। বিস্ফারিত হয়ে যায় নয়ন! কাঁপে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

এ কি?

যাঁকে সে রাখতে চায় দূরে, রাখতে চায় অন্তর থেকে অন্তরালে, নির্বাসনে—তিনি যেন কখন এসে বসেছেন—

বসেছেন তার হৃদয়াসন জুড়ে। ঘুচিয়ে দিয়েছেন অন্তরায়। উঠেছেন প্রভাময় হয়ে। ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর জ্যোতিচ্ছটা—ছড়িয়ে পড়েছে হৃদয়ের সমস্তটা অস্তিত্বে।

তাকিয়ে থাকে মার্গারেট—তাকিয়ে থাকে অভিভূতের মতো।

অসংখ্য কথার কাকলি জাগে—

জাগে তার আত্মার আকাশে। ফুটে ওঠে মনের মুকুরে, ওঠে সন্ন্যাসীর প্রশান্ত তনুশ্রী।

যে ছিল অপরিচিত, পৃথিবীর অজানা মানুষ, সে এসে কেমন ক'রে ঠাঁই নিলে—

ঠাঁই নিলে মার্গারেটের অন্তরায়তনে ?

মন্থর হ'য়ে আসে চিন্তার চলোর্মি। বিরলে বসে কাঁদে মার্গারেট, কাঁদে আবেগা অনুরাগের কান্না। সিক্ত হয় দু'নয়ন জলে। আর সেই অশ্রু ধোয়া অন্তরে ওঠে জেগে—

জেগে ওঠে একটি প্রশ্ন—এও কি সম্ভব ?

দিন বয়ে যায়। ঝড়ের মতো দিন।

মন্থন জাগে মার্গারেটের অন্তরে। করে মনোবিশ্লেষণ।

কিন্তু কি হবে তাতে?

পায় না তবুও মার্গারেট—পায় না সফেন সমুদ্র থেকে উত্তরণের আশ্বাস।

প্রবল প্রভঞ্জন। দিগ্‌ভ্রান্ত মার্গারেট। খুঁজে ফেরে হতাশায়, খুঁজে ফেরে নীড়ের ছায়া-শান্তি।

এমনি দিনে গড়ে ওঠে—

গড়ে ওঠে স্বামিজীকে কেন্দ্র ক'রে একটি আলোচনা-সভা। যুক্ত হয়ে যায় তাদের সঙ্গে, মার্গারেট। বসে থাকে নীরবে। ক্ষণ খোঁজে মুখর প্রতিবাদের। কত লোক কথা বলে। শুধায় প্রশ্ন। জানায় প্রতিবাদ। কিন্তু মার্গারেট মৌন। মৌনের সাধনায় যেন তন্ময় সে। রুদ্ধ হৃদয়ে দহন জ্বলে। পুড়ে ছাই হয়ে যেতে চায় অন্তর। তবুও পায় না ভাষা, ভাষা পায় না বলার কথা।

তবে কি এ জীবন যাবে দহন সয়েই? এ রিক্ত হৃদয়ের ময়দানে কেউ কি বুনবে না, বুনবে না কি একমুঠো ফসলের বীজ?

হে অনন্ত, সুর দাও কণ্ঠে। বক্ষে দাও ভাষা। প্রধাবিত কর অন্তর। রেখো না আর শ্রোতার ভূমিকায়। আত্ম-প্রকাশ করতে দাও। দাও প্রতিবাদের প্রস্ফুট কণ্টক হয়ে প্রকাশিত হ'তে জন-জোয়ারে। ওগো, আমার বুক-ভরা বেদনা। নয়ন ভাসে জলে। আবেগে আপ্লুত হ'য়ে যায় কণ্ঠ। কেন আমায় দিলে তুমি মৌন করে! অন্তরের অরণ্যে যে সঙ্গীতের মর্মর, তা একবার উঠুক ঝঙ্কৃত হয়ে বাইরের জগতে। আমায় বাঁচতে দাও, বাঁচতে দাও তুমি বৃহৎ জগতে মাথা তুলে। আয়োজন হ'ল এক সভার।

কোথায়?

পিকাডেলি প্রিন্সেস্ হলে।

স্তিমিত সূর্য। হেলে পড়েছে তার শেষ আভাটুকু, হেলে পড়েছে পশ্চিমের দিগন্তে। রক্ত-রাঙা গোধূলি। মুখর লণ্ডন। জনতার মিছিল। তারা আসছে ব্যগ্র বাসনায়, আসছে তরুণ সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনতে।

সুরু হ'ল সভা। দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী। পড়লেন ফেটে, ফেটে পড়লেন ঝড়ের

বেগে। মন্ত্রিত হলঘর। দিকে দিকে ঝঙ্কার। স্পন্দিত প্রাণ। নন্দিত নরনারী। শুনছে, শুনছে তারা আবিষ্ট হয়ে নিবিষ্ট মনে। শুনছে স্বামিজীর বজ্র-বিঘোষণ,—'তোমাদের কলকব্জা, ছাপাখানায় যা না হয়েছে, তার চাইতে খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের কয়েকটি কথায় মানব-সমাজের অধিক উপকার হয়নি কি? পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নির্লজ্জ অনুদারতা, নিষ্ঠুর যুদ্ধ-পিপাসা, আর নিদারুণ অর্থলোভ।...এ সভ্যতাকে স্বীকার করতে হ'লে যে মূল্য দিতে হয়, তোমরা কি আশা কর শান্তিপ্রিয় হিন্দু তা কোন দিন দিবে?'

এ তাদের কাম্য নয়—

কাম্য নয় হৃদ্‌কে প্রতারণা ক'রে দৈহিক সুখ-ভোগ। পায়নি তারা শিক্ষা—ধূর্ত আবরণে জীবনের বনিয়াদ রচনা করতে। তাদের রক্তে নির্বিরোধের প্রশান্ত প্রবাহ। নীরাজনের প্রস্তুতি। মায়াধীশের অভিসার আয়োজন।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কান পেতে থাকে মার্গারেট। অন্তরে জাগে অরুন্তুদ আর্তি। ছুটে আসতে চায় মন—ছুটে আসতে চায় নিষেধের অর্গল ভেঙে অর্চনার অঞ্জলি হয়ে। কিন্তু মন মুহূর্তে বসে বেঁকে। চলে আসে ভাবের অর্ণব থেকে, চলে আসে স্থিরবুদ্ধির বন্দরে।—দেখব, ভালো ক'রে দেখব। তার পরে প্রণতির দীক্ষা। নিবৃত্তির প্রশান্তি। উত্তরণের তীর্থ।

এমনি দিনে লণ্ডনের সমস্ত পত্রিকাগুলো উঠল মুখর হ'য়ে। মুখর হ'য়ে উঠল স্বামিজীর বিজয়-বিঘোষণে। তুলনা করল স্বামিজীর সঙ্গে বুদ্ধদেবের। লিখল 'দি লণ্ডন ডেলি ক্রনিকেল'—"জনপ্রিয় হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অবয়বে বুদ্ধদেবের চিরপরিচিত মুখের সৌসাদৃশ্য অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। আমাদের বণিক সমৃদ্ধি, আমাদের শোণিতলোলুপ যুদ্ধ, আমাদের ধর্মমত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতার তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন,—এই মূল্যে নিরীহ হিন্দুরা তোমাদের শূন্যগর্ভ আস্ফালনপূর্ণ সভ্যতার অনুরাগী হইবে না।"

লিখল 'দি স্ট্যাণ্ডার্ড'—"রামমোহনের পর, একমাত্র কেশবচন্দ্র সেনকে বাদ দিলে, 'প্রিন্সেস্ হলে'র বক্তা হিন্দুর মতো আর কোন শক্তিশালী ভারতীয় ইংলণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে অবতীর্ণ হন নাই। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি আমাদের, কারখানা, ইঞ্জিন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং পুঁথি পুস্তকের দ্বারা মনুষ্যজাতির কতটুকু হিত হইয়াছে, বুদ্ধ এবং যীশুর বাণীর সহিত তাহার তুলনা করিয়া অতি নির্ভীক, তীব্র, তাচ্ছিল্যপূর্ণ সমালোচনা করেন। বক্তৃতাকালে তিনি কোন স্মারকলিপি ব্যবহার করেন নাই,—তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আড়ষ্টতাহীন, দ্বিধাহীন।"

অপসৃত করলেন স্বামিজী প্রতীচ্যের প্রাণ-পঞ্জরের আবিলতা। দিলেন জ্বেলে জীবনের দীপ। নিয়ে এলেন তমসার গুহা থেকে আলোর দিগন্তে। পথে, ঘাটে, মাঠে, ময়দানে ঐ এক নাম।

এমন মধুর আর হয় না।

লাভ করে মার্গারেট আনন্দ। শোনে নিবিষ্ট মনে স্বামিজীর বিজয়-বার্তা। অন্তর নিরন্তর করে নৃত্য। স্ফীত হয় বক্ষ। পান করে পরিতৃপ্তির সুধা। কিন্তু তা একান্ত গোপনে। নীরবে। একাকী।

কেন?

জানে না তা মার্গারেট। বোঝে না অবুঝ মন—

বোঝে না কেন কণ্ঠে আসে সঙ্গীত। সুর জাগে অন্তরে। ছন্দে ছন্দে দোলে দেহ।

দিন বয়ে যায়। এলো এক সাংবাদিক—

এলো স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে। বললেন তার কাছে স্বামিজী—বললেন—'আমি কোন গুপ্ত বিদ্যা সমিতির পক্ষ থেকে মন্ত্রতন্ত্রের কুহক দেখাতে আসি নি। …সত্য স্বপ্রকাশ, সে থাকে না দিনের আলোকে প্যাঁচার মতো মুখ লুকিয়ে। সবাই পারে তাকে যাচাই করে নিতে'।

সহসা চমকে ওঠে মার্গারেট। চলে আসে দেহ-পিঞ্জরের মনোসায়রে। দাঁড়ায় থমকে বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো মুহূর্তে। এই কথাই তো ভাবছিল মার্গারেট, ভাবছিল এতদিন বসে। এর জন্যেই মাস থেকে মাস, বছর থেকে বছর কাটিয়ে দিয়েছে সে—

কাটিয়ে দিয়েছে কণ্টকের ক্ষত লয়ে বক্ষে। রয়েছে জেগে রাত্রিবৃন্তে নয়ন দুটি, জেগে রয়েছে প্রভাতের প্রসূনটির মতো। এসেছে দমকা হাওয়া। আন্দোলিত করেছে অন্তর। কিন্তু কেউ পারেনি, পারেনি তার অন্তর-নিরুদ্ধ অনলে ছড়িয়ে দিতে এক বিন্দু বারি। আজ প্রাণ উঠেছে মেতে। জেগেছে হিয়ায় কম্পন। প্রভাতের অরুণলেখা জেগেছে নিশান্তের মুগ্ধ লগ্নে। মোহমধুর মনে দাঁড়িয়ে মার্গারেট, দাঁড়িয়ে আছে হৃদয়ের দুয়ারে। আর দেখছে যেন চোখের সামনে, দেখছে —'সত্য স্বপ্রকাশ……সবাই পারে তাকে যাচাই ক'রে নিতে'।

তবে তাই হবে। আকণ্ঠ পান করবে মার্গারেট—

পান করবে স্ব-প্রকাশানন্দের আনন্দটুকু। গ্রহণ করবে তাকে যাচাই ক'রে মনের গহনে। বসবে তার পরে দোহে মিলে বিরলে।

শুরু হোল তার জীবন-জিজ্ঞাসা। যুক্তিতর্ক দেয় জুড়ে সঙ্গীদের সঙ্গে। চুল-চেরা

বিচার করে সন্ন্যাসীর প্রতিটি কথার। কিন্তু ভর্ৎসনা করে সাথীরা। পায় না খুঁজে তারা মার্গারেটের মনের অতল। হারিয়ে ফেলে মাঝে মাঝে খেই। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে অন্তর। অগ্নি জ্বলে বুকে।

কেন, কেন মন এমন মধ্যাহ্নের ধ্যানে মগ্ন হয়ে যায়? বোঝে না মার্গারেট। পায় না খুঁজে অতলের কথাটি।

এ তো হবেই।

কেন?

চলেছে উনবিংশ শতাব্দীর বুকে আর একটি জাগ্রত অধ্যায় সূচনার আয়োজন। চলেছে তা এক তরুণীর জীবনে। দাঁড়িয়েছেন এসে প্রদীপ্ত সূর্যের মত তারই পটভূমিকায় বিবেকানন্দ। ঘটিয়েছেন তিনি এক বিরাট পরিবর্তন! তুলে দিয়েছেন প্রতিরোধের পোক্ত প্রাচীর, তুলে দিয়েছেন বস্তুতান্ত্রিকতার একমুখো স্রোত ধারায়। বস্তু-বিজ্ঞান আর রাজনৈতিক প্রবাহে অভিষিক্ত হয়েছিল যে পাশ্চাত্যের বেদীমূল—স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ আত্ম-প্রত্যয় আঘাত করল সেই ভ্রান্ত ভিতে প্রচণ্ডভাবে। কেঁপে উঠল সমগ্র পাশ্চাত্য দুনিয়া। সূচনা হ'ল আত্ম-দ্বন্দ্বের। ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রাণময় হ'য়ে উঠতে লাগল সন্ন্যাসীর বজ্রবাণী। ভেঙে পড়ল মার্গারেটের অন্তর-বিশ্বের মঠ মিনারগুলি। দুই শিবিরের দ্বন্দ্ব ও অভিঘাতের মধ্য দিয়ে হ'ল তার চক্ষুরুন্মীলন। এগিয়ে এলো মার্গারেট। এগিয়ে এলো আরো কিছু সম্মুখের দিকে।

বিপ্লব বিদ্রোহের রক্ত-বহ্নি ওঠে যখন প্রজ্বলন্ত হয়ে, ওঠে যখন যুগ ও জীবনের বুকে—আত্মপ্রকাশ করে তখন বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে জাগ্রত জনতার মিলিত মিছিল। সৃষ্টি হয় জন-তরঙ্গের মাঝ থেকে তখন নেতা বা নেত্রীর। আসে তারা এগিয়ে, এগিয়ে আসে মিছিলের পুরোভাগে। দাঁড়িয়ে থাকে একচক্ষু দীপ-স্তম্ভের মতো। বিকিরণ করে আলো। উন্মোচন করে সহস্র চক্ষুর অন্তরালে; মিথ্যা আবরণকে। এনে দেয় দিব্য দৃষ্টি কোটি মুখর জনতার চোখে। এগিয়ে যায় তারা, এগিয়ে যায় নবজীবনের রাজপথে। সৃষ্টি হয় আর একটা যুগের। জীবনে জীবনে আসে সুস্থ সাবলীল ছন্দ। অবসান হয় দ্বন্দ্বের। মার্গারেটের নয়নে আভাসিত হয়েছেন বিবেকানন্দ—

আভাষিত হয়েছেন ইতিহাসের অধিদেবতারূপে। ধরা দিয়েছেন যুগ-বিপ্লবীর বেশে। তাঁকে গ্রহণ না করলে মেনে নিতে হয় জাগ্রত চেতনার মিথ্যাকে। কিন্তু তাকে গ্রহণ করলেও যে জন্মলব্ধ বিশ্বাসকে দিতে হয় নির্বাসনে।

কোন্‌টা সে গ্রহণ করবে? কোন্ কূল রেখে কোন্ কূল ছাড়ে। মহা দ্বন্দ্ব। এই যে আত্মমন্থন, এই মন্থনই সৃষ্টি করেছে মার্গারেটের অন্তর-বিশ্বে বেদনার।

কিন্তু সে বেদনা এসে প্রলীন হ'ল কোথায়?

প্রলীন হ'ল নিবৃত্তির নিশান্তে সৃজনের আনন্দলোকে। রূপ পেল তা গণ-দেবতার চরণ মৃণালে।

তা পাবে না কেন?

আলোর আশ্বাস পেলে কে পড়ে থাকে ক্ষুদ্র দিঠির অন্ধকারে?

ব্রহ্মাণ্ডের খবর জানলে ভাণ্ডকে বিস্তৃত করতে কে না চায়?

মন এবার চলে এসেছে—চলে এসেছে নিশীথের বৃন্ত থেকে দিবসের ফুটন্ত সকালে। আর দ্বিধা নেই। অবসান হয়েছে দ্বন্দ্বের। অপসৃত হয়েছে অন্ধকার। এবারে আনন্দ আত্ম-নিবেদনের। তৃপ্তি প্রণতির দীক্ষার।

মহাবেদনার অবসান উষায় এলো এগিয়ে মার্গারেট, এলো প্রশান্তির পদপ্রচ্ছায়। এলো তরুণ সন্ন্যাসীর কাছে। হ'ল নত জানু। যুক্ত করল হাত। লুটিয়ে পড়ল—

লুটিয়ে পড়ল প্রশান্ত পুলকিত একটি যামিনীর মতো—লুটিয়ে পড়ল বিবেকানন্দের পদ-শতদলে। বলল আবেগবিহ্বল কণ্ঠে,—'হে আচার্য দেব! হে গুরু! প্রণাম!'

আমন্ত্রণ এসেছে আবার আমেরিকা থেকে।

চলে এলেন স্বামিজী। ফের ফিরে আসবেন লণ্ডনে বসন্তে। কয়টা দিনের বা বিরতি?

তবু মন কাঁদে। কাঁদে মন মার্গারেট নোবলের! নামে ধীরে অন্ধকার। জাগে অন্তরের কাঙাল কামনা। হয়ে আসে মন্থর চলার ছন্দ। লাগে না ভাল বাইরের কোলাহল। সরে আসে বান্ধবীদের কাছ থেকে। হয়ে ওঠে অন্তরঙ্গ। বসে থাকে নির্জনে। ডুবে যায় গভীরে। ফোটে তার স্বপ্নের কুঞ্জে বিচিত্র ফুলকলি। বিকশিত হয় কোটি শতদলে। আবার ঝরে যায় দু'একটি কোরকের বেদনা বুকে নিয়ে।

নীরব আঁখিপাতে প্রত্যক্ষ করে মার্গারেট। লাগে বড় অস্বস্তি। জুড়ে বসেছেন যেন সমস্ত অন্তরখানা স্বামিজী। চেতনার তীর্থাসনে উপবিষ্ট যেন সেই দিব্য ঘন-তনু বিবেকানন্দ। উন্মুক্ত হ'তে চায় মার্গারেট। আসতে চায় চ'লে আপন ব্যক্তিত্বের সিংহাসনে। আবদ্ধ করে মনকে যুক্তি-জালে। কিন্তু তবু ঘটে পরাজয়, ঘটে বারে বারে। যেখানে হয় প্রধাবিত তার মন, খোঁজে জীবনের ছন্দ—সেখানেই অসহায় নিবেদন। বিবেক-বিজ্ঞানের ধীর সঞ্চার। হয় তার প্রশান্ত বিকাশ। শোনে যেন তার জীবনের ছন্দমধুর বাণী। চকিতে হয় গর্বিত শির অবনমিত। ব্যক্তিত্বের কাঠিন্যে আসে প্রাণ-নির্ঝরিণীর ধারা।

তবে আর কেন?

ঝঙ্কার দাও—

দাও ঝঙ্কার নতুন সুরে মনোবীণার ছিন্নতারে। সাজ নবরূপে। আনো জীবনের বসন্তে মুগ্ধ মধুর সঙ্গীত। বিলিয়ে দাও নিজেকে—বিলিয়ে দাও সমীর নিস্বনের মতো জনতার মাঝখানে। হাল ধর। দাও উড়িয়ে তরণীতে পাল। এগিয়ে চল সুমুখ পানে। গাও গান আনন্দের!

তাই হ'ল। পড়ে ইতিহাস মার্গারেট। দেখে বিজ্ঞান। নেয় দিনরাত্রির সঙ্গী করে ধর্মগ্রন্থ। রাখে পাশাপাশি বুদ্ধ, খ্রীষ্টের জীবন বাণী। অধ্যয়ন করে উপনিষদ্। গীতার পাতায় চোখ স্থির রাখে। বাইবেল দেখে খুঁটে খুঁটে। লেগে থাকে মার্গারেট পুঁথির পাতায়। হ'য়ে ওঠে গ্রন্থকীট। ইহুদি, খ্রীষ্ট, হিন্দু ও বৌদ্ধ

ধর্মের বিশ্লেষণ করে নিবিষ্ট মনে। করে বিচার ও ব্যাখ্যা। খুঁজে পায় ব্যবধান। এ যেন পরিব্যাপ্ত পরিধির এপার আর ওপার। উদার বৌদ্ধ ধর্ম। ইহুদিরা একটু গোঁড়া। কিন্তু হিন্দু ধর্মের সাধন-সত্য টানে তার মনকে। নিয়ে যায় অসীমের উৎসঙ্গে। বড় ভাল লাগে মার্গারেটের। এ যেন অন্তহীন, অপূর্ব, প্রাণস্পর্শী। হৃদয় ধর্মের এ এক মুগ্ধ মধুর প্রবাহ। পায় না তার নাগাল খ্রীষ্ট ধর্মও। হিন্দু ধর্মের সাধন ভজন, আর ভক্তি বিশ্বাসের প্রশান্ত প্রবাহে ভেসে যায় মন্দির। ডুবে যায় মস্‌জিদ, তাদের ডাকে সাড়া দেন ঈশ্বর স্বয়ং। সজীব হয়ে ওঠে মৃন্ময়ী মূর্তি চিন্ময়ীরূপে। প্রেমের ঠাকুর এসে প্রাণময় হ'য়ে ওঠেন মানুষের অন্তরে। ওরে এমন আর দ্বিতীয়টি নেই রে !

গ্রন্থ-সমুদ্র মন্থন করে মার্গারেট। হারিয়ে ফেলে মাঝে মাঝে নিজেকে। উপনীত হ'তে পারে না নিশ্চিত সিদ্ধান্তে। দাঁড়ায় থমকে মাঝপথে। কথা ব'লে ওঠে তখন মনের মৌন। নির্দেশ দেয় পথের। স্মরণ হয় মার্গারেটের স্বামিজীর বাণী,—'নিজেকে কখনও মনে করবে না অসহায় ব'লে। মানুষের বুকে কেমন করে থাকেন ঈশ্বর জান ? বড়ঘরের পর্দানশীন হিন্দু মেয়ের মতো। আড়াল থেকে সব দেখতে পায় সে, কিন্তু সে যে আছে বাইরে কেউ পারে না তা জানতে। তেমনি ক'রে তোমার হৃদয়েও তিনি আছেন।'

অন্তর মন্দির। দেবতার বিশ্রামের ঠাঁই। তিনি যে রয়েছেন তোমার সাথে সাথেই। তাঁকে ডাকো। সিক্ত ক'রে দাও কেঁদে কেঁদে তাঁর দুনয়ন আতুর অশ্রুতে। পাবে তাঁর দর্শন। দেখবে তাঁর ভুবন-বিসারী প্রশান্ত অঙ্ক। পারবে সমাহিত হ'য়ে যেতে।

তবে আর ভাবনা কি ? তাঁকেই করবে লাভ মার্গারেট। জানবে তার ঠিকানা। আনবে সেই লোচন, লোভন, শোভন সুন্দরকে ধ্যানে, মননে ও দর্শনে। মন্দিরের রুদ্ধদ্বার থেকে নিয়ে আসবে, নিয়ে আসবে তাঁকে মার্গারেট তার অন্তর-দেউলে। তার পরে সাধন ও সঙ্গীত। নিবেদন ও মিলন।

এবারে মার্গারেট তৈরী করবে নিজেকে নিজে। হবে দেবভোগ্যা। তার পরে প্রলীন হবে প্রাণের প্রভুর পদ-প্রচ্ছায়। জ্বলবে প্রজ্ঞার প্রদীপ। কীর্ণ হবে তার জ্যোতির্ময়চ্ছটা দিকে দিকে। চলে আসবে মার্গারেট পূর্ণতার পয়োধিকূলে। অপসৃত হবে পয়োমুক্। পরাগত হবে মার্গারেট পরাৎপরের পদ-মৃণালে। জ্বলবে পিদিম অন্তরে। চলে আসবে প্রতর্ক থেকে প্রজ্ঞানের প্রাঙ্গণে। চলতে লাগল প্রস্তুতি। দিন দুনিয়ার প্রতিটি কাজ ক'রে যায় হৃদয়োত্তাপের স্পর্শে। লাভ করে পরিচয়

নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে। খুঁজে ফেরে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে। হয় তাদের সঙ্গে প্রগাঢ় সম্বন্ধ।

মানুষের মাঝেই প্রসুপ্ত থাকে অনাদি অনন্ত শক্তি। তাঁকে জাগ্রত করতে পারলে তিনি জাগেন। ঘুম তাঁর ভাঙে। এ জ্ঞান ধীরে ধীরে নবারুণের মতো বিকীর্ণ হয়ে পড়ে মার্গারেটের অন্তরাকাশে। তাই সে স্বীকার ক'রে নেয় প্রতিটি ব্যক্তি-জীবনের সম্ভাবনাকে সর্বান্তঃকরণে। নির্ভীক মন নিয়ে যায় এগিয়ে—এগিয়ে যায় উপল বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথে সাহস বিস্তৃত বক্ষে। এ জীবনের খেলা যে তাঁরই লীলা —এ কথা মেনে নিতে শিখেছে মার্গারেট। তাই আজ আর নেই নয়নে স্খলনের বিভীষিকা। নেই মৃত্যুভয়াল ভীতি। সর্বত্রই যে পাতা রয়েছে বিশ্বপিতার অভয় অঙ্ক! কিসের ভয়?

যে সূর্য প্রভাতের আকাশে দেখা দেয় সোহাগ-গলানো কাঁচা সোনার মতো, সে-ই আবার আত্মপ্রকাশ করে রুদ্র ভয়াল রূপে মধ্যাহ্নের নভোনীলে! আবার দিনান্তে দীনের দীন হয়ে হেলে পড়ে—হেলে পড়ে দিগন্তের অস্তাচলে। একটু সুখ, একটু সোহাগ কামনা ক'রে তিমির-তন্বীর কাছে।

ঈশ্বর এক। কিন্তু বিচিত্র তাঁর রূপ। নব নব বেশে আসেন তিনি। আসেন নিত্য, অনিত্যের মনোমন্দিরে। তাঁর তো সংজ্ঞা নেই। নেই তাঁর নিছক রূপ। যিনি সীমার বাইরে তাঁকে তো পাওয়া যায় না বুদ্ধির বক্ষে! তাঁকে পেতে হ'লে চাই বোধের মন্দির। সেই বোধের মন্দিরে বসেই দিতে হবে তাঁকে প্রেম। বসতে হবে মুখোমুখি। রাখতে হবে ধ্যানে তাঁকে স্থির। ক্ষুধা মেটাতে হবে বোধের। তবেই আভাষিত হবেন বোধময়। মনোময়। সুন্দর।

এ চিরন্তন সত্যটি ধরা দিয়েছে মার্গারেটের অন্তরে। তার অন্তরাকাশে যে অরুণীত সূর্য, সে-ও কখনো প্রভাময় হ'য়ে ওঠে। আবার কখনো হয় রুদ্রদীপ্ত। কখনো বা 'দুহু কোলে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' ক্ষণে মন চঞ্চল, ক্ষণে মন বিহ্বল, আবার ক্ষণে মন ভেসে চলে না-পাওয়ার বেদনায়। মার্গারেট থাকে কান পেতে অধীর আগ্রহে। শুনতে চায় তাঁর পায়ের শব্দ! বিশ্বছবির দিকে তাকিয়ে ভাবে—এ বুঝি তাঁরই প্রীতিলেখা। তাইতো মার্গারেট কর্মের মধ্যে ধর্মকে খুঁজে ফেরে নীরবে।

এড়িয়ে নয়। যেতে হবে পথ পেরিয়ে।

বান্ধবীদের মাঝে এসে দাঁড়ায় মার্গারেট—

দাঁড়ায় তার জীবনের বলিষ্ঠ সত্যকে প্রকাশ ক'রে। আত্মগত হ'য়ে কর্মের কক্ষ-বৃত্ত থেকে অন্তরালে থাকলে চলবে না। ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে জন-সমুদ্রের মাঝে। তাদের জীবনের সুখ দুঃখ, ব্যথা ও বেদনার সঙ্গে লাভ করতে হবে পরিচয়। দাসত্বের কলঙ্কময় অধ্যায় শেষ ক'রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে মানুষের পবিত্রতম অধিকার। 'রাজনীতির ক্ষেত্রেও মানুষ ক্রমে ক্রমে নিজেকে করবে বিস্ফারিত। স্ত্রী, পুত্র, পিতা মাতার 'পরে তার কর্তব্য আছে। কর্তব্য আছে আপন গ্রাম, নগর ও দেশের প্রতি···কর্তব্যের পরিধি ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায় ক্রমেই। কিন্তু এ-সব ক্ষুদ্র স্বার্থ। যার জন্যে এমনি করে প্রাণপাত ক'রে মানুষ, তা তখনই হ'য়ে ওঠে লোকান্তর। সে হয় বিশ্বের নাগরিক, বসুধা হয় তার কুটুম্বক, মানুষের সেবা করতে দেবতাকেই সে দেখতে পায় তার মাঝে। এমন মানুষ পারে জগৎকে করতে তোলপাড়। তার সামান্য অবস্থা তখন লুপ্ত, সে তখন দেবাবিষ্ট।'

বাইরে সঙ্কটের ধূমেল বহ্নি। হোমরুল আন্দোলনের বিক্ষোভ-তরঙ্গ। মার্গারেট ছড়িয়ে যাচ্ছে অগ্নিবীজের বাণী—

ছড়িয়ে যাচ্ছে জাগ্রত জনতার কানে কানে। উদ্‌বুদ্ধ করছে তাদের। রাখছে তাদের সম্মুখে জীবনের বলিষ্ঠ স্বীকৃতি।

১৮৯৬ সাল। এপ্রিল মাস। ফিরে এলেন স্বামিজী—

ফিরে এলেন লণ্ডনে।

ভরে যায় মার্গারেটের মন আনন্দে। চিত্ত থেকে সংশয়-বিমুক্তির ভাব নিয়ে যায় এগিয়ে, এগিয়ে যায় স্বামিজীর কাছে। বলতে চায় তার মন, 'আচার্য জীবনের নতুন অধ্যায় সুরু করতে আমি প্রস্তুত।'

কিন্তু বলা হয় না সে কথা। দ্বন্দ্বাভিঘাতের প্রবল তরঙ্গে সে ভাষা চলে যায় অনেক দূরে। না-বলা কথার বাণী এসে সঞ্চার করে বেদনা তার মনে। ঝড় জাগে। আরক্ত আঁখিপাতে নির্বাক হ'য়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে মার্গারেট।

বুঝতে পারেন স্বামিজী—

বুঝতে পারেন মার্গারেটের মনোবিক্ষোভের ভাষাটি। এমন দিন যে গেছে তাঁরও। নীরব রাত্রির ক্রোড়ে বিনিদ্র নয়ন রয়েছে জেগে। পাষাণ-চাপা বক্ষে জেগেছে ঝড়।

অশ্রুআতুর নয়নে জানিয়েছে কতবার মনের আকুতি। বলেছেন একাকী—ওগো, তোমার অপরোক্ষানুভূতির ছোঁয়া লাগুক আমার হৃদয়ে। আমাকে জানতে দাও, বুঝতে দাও তোমার মহিমার লীলা। ঈশ্বর আছেন তো বেশ। কিন্তু তাঁকে দেখবার পথ কি? কেউ কি তাঁকে দেখেছেন?

অমনি শান্ত মধুর কণ্ঠে বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—'যেমন তোকে দেখছি, তেমনি দেখছি আমি তাঁকে'। তিনি নেই তো জগৎ নেই। তিনি আছেন তো সব আছে। দেখবি তুই?

এমনি ক'রে তাড়িয়ে বাজিয়ে তবে গ্রহণ করেছেন স্বামিজী—

গ্রহণ করেছেন শ্রীগুরুর পাদপদ্ম।

মার্গারেটের হয়েছে তাই।

মন চলেছে বায়ুর বেগে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কাকে খুঁজছে। তা তো জানে না মার্গারেট! বিক্ষিপ্ত মন। নিয়ত নিবিড় গভীর ভাবে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে সে। তবুও খুঁজে পায় না পথ। অন্ধকারে অন্তরালে বসে বসে ডুকরে কাঁদে। ক্ষণেক আলো, ক্ষণেক আঁধার আভাসিত হয় তার নয়নে। যোগ দেয় স্বামিজীর বেদান্তদর্শন আলোচনায়। মাঝে মাঝে দু'একটি প্রশ্ন করে। জবাব দেন স্বামিজী। আবার স্বুরু হয় ব্যাখ্যা—

বলেন বিবেকানন্দ, জীব ও শিবের মধুর মিলনের কথা। ঈশ্বরকে পাবার পথ কি। তাঁকে জানতে হ'লে যে সাধনার প্রয়োজন, সেই সাধনার মন্ত্রে মুখর হয়ে ওঠেন স্বামিজী।

প্রশ্ন জাগে শ্রোতাদের মনে। জবাব দেন স্বামিজী মানস-গোচর হয়ে। বলেন, 'ইউরোপের মুক্তি নির্ভরশীল যুক্তিসিদ্ধ ধর্মের 'পরে।'

প্রতিবাদ করে মার্গারেট! স্বুরু হয় তুমুল তর্ক। যুক্তিতর্ক। অবশেষে সমাধান হয় মার্গারেটের মনের সমস্যার। হার মেনে আসে নীরবে।

এমনি ক'রে দিন যায়। দিনের পর দিন। মার্গারেট নোবল এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে সুমুখ পানে।

প্রতিষ্ঠা পায় ভারতীয় ঋষিদের সত্য বাক্য তার অন্তরে—'সোঽহম্…সোঽহম্ …আমিই সেই।'

আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মাই ঈশ্বর। তাঁকে যে পারে জানতে—জানতে পারে যে স্বরূপ সত্য, তারই দর্শন হয় বিশ্বরূপ। ভুবন সুপ্ত অন্তরে। একবার আত্মগত হ'লেই লাভ করা যায় আত্ম-প্রীতি। মানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ

মার্গারেট মিলিয়ে নেয় তার জীবনের সঙ্গে—

মিলিয়ে নেয় স্বামিজীর উপদেশাবলী। আলোচনা করে মার্গারেট, আলোচনা করে স্বামিজীর সঙ্গে জীবনের জটিল সমস্যা নিয়ে। আবার ব্যক্তিগত কথা নিয়েও করে পরামর্শ। গেঁথে নেয় আগামী দিনের সূচীসূত্র। আহরণ করে জীবনের রসদ। পান করে সঞ্জীবনী সুধা। পড়ে ম্যাৎসিনি। পড়ে জাতীয়তাবাদের ইতিহাস।

সেবাধর্মে আত্মাহুতি দিতে বলছেন স্বামিজী—

আত্মাহুতি দিতে বলছেন সবাইকে। যারা অশিক্ষার অন্ধকারে পড়ে ধুকছে। যাদের জীবনে রাত্রির মতো নেমে আসে কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকা—তাদের কথা বলতে বলতে হাহাকার ক'রে ওঠেন বিবেকানন্দ। আসে চোখে জল। বেদন-ঘন কণ্ঠে বলেন—'স্বদেশকে ভালবাস, জান, বোঝ, কী চাই তার।'

বললেন একদিন স্বামিজী—

বললেন মার্গারেটকে—অধীর চিত্তে উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ। কিন্তু ক'জনে বলতে পারে, 'ঈশ্বর ছাড়া আর কোন সম্বল নেই আমার।' তাঁর নামে কে পারে লেগে থাকতে? কে পারে বিপদবন্ধুর পথে নিশঙ্ক চিত্তে পা বাড়াতে ঈশ্বরের নাম নিয়ে? যে পারে, সে রহে। তার অন্তরেই ওঠে ধ্বনিত হয়ে দৈব দীক্ষার মন্ত্র। আত্মবিশ্বাসে অটল হয় তার চিত্ত। বিত্তহীন প্রাণ বিপ্লবই বল, আর বিক্ষোভই বল, তার মাঝে পারে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাহীন চিত্তে।

কথাগুলি বহ্নিশলার মতো বিঁধে যায় মার্গারেটের মনে। বুঝতে পারে সে সহজেই—

বুঝতে পারে মার্গারেট, এ হচ্ছে তার জীবনের পরীক্ষার আর একটি অধ্যায়।

মার্গারেট নিয়ে গেল একদিন স্বামিজীকে—নিয়ে গেল তার স্কুল পরিদর্শনার্থে। খুশির মন নিয়ে গেলেন বিবেকানন্দ। কিন্তু হঠাৎ যেন কি হ'ল তাঁর। মুখখানা উঠল আরক্তিম হয়ে। বেদনার মেঘ এসে মলিন ক'রে দিলে স্বামীজির উজ্জ্বল তনুদীপ্তি।

বোঝে না মার্গারেট। খোঁজে কারণ। অবশেষে আপন অক্ষমতার কথা ভেবে বলতে থাকে মার্গারেট—'পুরোপুরি ফুটে ওঠবার অধিকার প্রত্যেকরই আছে। মনোবিকাশের পক্ষে স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য, আমি ওদের সেইটাই শিক্ষা দিতে চাই—'

মনে পড়ে স্বামিজীর ভারতবর্ষের কথা। আর মনে পড়ে সেখানকার গণ-জীবনের শোচনীয় পরাজয়ের চিত্র। কি অসহায় তারা। দুঃখের দুয়ারে দাঁড়িয়ে জীবন-ভোর শুধু সয়ে যাচ্ছে পীড়ন-দহন। যাবার দিনে তবুও তারা কাঁদে—

কাঁদে এই মোহমধুর ধরণীর জন্যে।

কথাগুলো বলতে বলতে স্বামিজী হারিয়ে ফেলেন নিজেকে। মার্গারেট বিহ্বলের মতো থাকে তাকিয়ে। শুনতে থাকে উৎকর্ণ হয়ে—'আমার দেশের দীন দরিদ্র অভাগা ছেলেরা ঘোর অন্ধকারে ডুবে রয়েছে।······ধনীর হাতে লাঞ্ছনা ভুগতে ওদের জন্ম—এই ওদের ধারণা।······ওদের দুঃখ কল্পনা করতে পার কি? আজ যদি বিনা বেতনে প্রতি গ্রামে ওদের জন্যে আমরা শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেও থাকি, তবুও ওরা লেখাপড়া করতে পারবে না। পেটের ভাতের জন্যে মাঠে-ঘাটে খাটতে বাধ্য ওরা, এমনি কঠোর ওদের দারিদ্র্য।···আসলে আমাদের টাকাই নাই, আমরা বিদ্যাদান করব কি?—'

চিৎকার ক'রে উঠতে চায় মার্গারেটের মনটা। ইচ্ছে হয় তার—ইচ্ছে হয় জীবনের সর্ব বস্তু ইন্ধন ক'রে দিতে অকাতরে। সেবার মন দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে ভারতবর্ষের আর্তপীড়িত মানুষদের পার্শ্বে।

আবার শুনল স্বামিজীর কণ্ঠ মার্গারেট—'গরীবের ছেলেরা যদি স্কুলে না আসতে পারে, স্কুলই যাবে তাদের কাছে···মাঠে, কারখানায় সব জায়গায়—'

এবার বেসামাল হয়ে পড়ল মার্গারেট। আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে। একটা অশ্রান্ত তরঙ্গ স্পন্দিত হয়ে উঠল তার অন্তরে। তার মনটা যেন চায় ধেয়ে যেতে—

চায় স্বদেশের মোহন মায়া ছেড়ে সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে—ভারতবর্ষে। কেন, কেন সে পারবে না? কি আছে তার সংসারে? জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে যৌবন। ভাটার মন্থর প্রবাহ এসেছে কামনার সমুদ্রে। শুকিয়ে গেছে মালা। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির পীড়ন নেই আর। এবারে সে নিষ্কাম প্রেমের স্বচ্ছ নির্ঝর। ওর মতো আর স্বাধীন কে? যেথা খুশী চলে যেতে পারে মুক্ত বিহঙ্গের মত। মমতাময়ী বললে মধুরকণ্ঠে, বললে আবেগ আকুল চিত্তে—'যদি তাই হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমি আসব আপনার পাশে আপনার কাজে যোগ দেব, আমরা খাটব একসঙ্গে একই লক্ষ্য পথে—'

মন যেন কেমন ক'রে ওঠে স্বামিজীর। এ কথা মার্গারেটের মুখে বেশী নয় কিছু। জানেন তা স্বামিজী।

যে প্রেম একদিন ওর যৌবন মথুরায় এসে গেয়ে গেল বিরহের গান। রেখে গেল কান্নার অশ্রু, আজ যে সেই বেদনার আলাপ এসে আছড়ে পড়তে চায় চিরজীবী প্রেমাস্পদের পদ-প্রচ্ছায়। কিন্তু সন্ন্যাসী তা কেমন করে মেনে নেবে?

কেমন ক'রে গ্রহণ করবে তার সান্নিধ্য ? বসে রইলেন আনতমস্তকে স্বামিজী। আকাশ-বিসারী ভাবনার দিগন্তে নির্বিবাদে ছেড়ে দিলেন মনকে।

কিন্তু না !

পেলেন সমাধান খুঁজে—

খুঁজে পেলেন স্বামিজী তাঁর বিভ্রান্ত মনে স্থির সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি।

কি ?

প্রত্যাখ্যান ! তাই বললেন এক সময়—

বললেন মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে—তা হয় না। তনুহার শেষে যে মিলনের আনন্দ, সেটুকুই হোক তোমার কাম্য, তোমার সাধ্য। তোমার সাধনা। 'আমি সন্ন্যাসী।'

বিরহের চিতা উঠল বহ্নিমান হয়ে মার্গারেটের অন্তরে।

মন্থর হয়ে এলো জীবনের ছন্দ। স্বর ভেঙ্গে গেল কণ্ঠের।

সিক্ত হোল দু'নয়ন জলে।

জানত মার্গারেট --

জানত সে, সন্ন্যাসীর কাছ থেকে আসবে অবহেলার উক্তি। প্রত্যাখ্যানের বেদনা। দূরে সরিয়ে দেওয়ার আঘাত।

কিন্তু মন মানে না। ভুলে যায় মাঝে মাঝে মার্গারেট—

ভুলে যায় বিগত জীবনের ব্যর্থময় অধ্যায়ের কাহিনী।

আবেগ উচ্ছ্বাসে স্মৃতির সৌধকে আড়াল করে এসে দাঁড়িয়েছিল—দাঁড়িয়েছিল মার্গারেট বাহ্যিক জগতের মাঝে।

কিন্তু বেদনার সঙ্গে যার অন্তরের অন্বয়, সে কেমন করে করবে উন্মোচন দুঃখের যবনিকা? যে প্রেম চেয়েছিল নিবেদনের আনন্দ, চেয়েছিল অর্পণের অধিকার কিন্তু ফিরে এলো, তা অন্তর দহনের অগ্নি নিয়ে নীরবে, তার ভাগ্যে এর চেয়ে অধিক কি আর জুটবে?

বসে রইল মার্গারেট আনত মস্তকে। পৃথিবীর যা কিছু মোহনীয় রমনীয়, তারা যেন সকলে করছে তাকে বিদ্রূপ। হাসছে তার পানে তাকিয়ে থেকে থেকে। হায় মন, তোমার আশার শেষ অঙ্কুরটিও বিনাশপ্রাপ্ত না হোলে বুঝি মিলবে না—

মিলবে না বুঝি দয়ানিধির উৎসঙ্গ!

বেজে ওঠে মার্গারেটের মনে—

বেজে ওঠে ব্যথার বীণ। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে রজনীর মত মৌন হয়ে।

সমস্তটা অন্তর ব্যাপী জেগে ওঠে একটা গভীর গর্জন।

ভেঙ্গে পড়ে কলরোদনের উচ্ছল তরঙ্গে কামনার কূল।

অন্তরবিশ্বে একটা আবেগ-স্পন্দিত ঝড় জাগে। ধূমায়িত হয়ে ওঠে গ্লানির বহ্নি।

তাকিয়ে থাকেন স্বামিজী। বুঝে নেন মার্গারেটের মনোবিক্ষোভের ভাষাটি। তার মনকে ফিরিয়ে আনেন কর্মের ফেনিলে।—দাঁড়াতে হবে দীন-দরিদ্রের পার্শ্বে। তাদের সেবার মাঝ দিয়ে লাভ করতে হবে ঈশ্বরকে। যারা আর্ত, পীড়িত, অসহায়

—তাদের সবাইকে ভালোবাসো। অর্চনা কর নারায়ণ জ্ঞানে। সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে তাদের জীবনের বেদনাকে লাঘব কর। শান্তি পাবে! চিত্ত চৈতন্যের ছোঁয়া পাবে।

কিন্তু আঘাত যার আজীবনের সঙ্গী, কান্না যার হৃদয়ের সান্ত্বনা, সে কেমন করে পদপাত করতে সাহস পায় কর্মময় বিশ্বে?

'শূন্য মন্দির মোর।'

বারে বারে মনকে ঐ একটি কথাই বড় পীড়া দিচ্ছে! তাই বুঝি, তাই বুঝি স্বামিজীর কাছ থেকেও তাকে শুনতে হোল—

শুনতে হোল প্রত্যাখ্যানের প্রচ্ছন্ন উক্তি—'আমি সন্ন্যাসী।'

কিন্তু যিনি মানসগোচর, যিনি অন্তরের খবর জানেন, যিনি খুঁজে খুঁজে ফেরেন মানুষের মনের ভাষাটি—তাঁর কাছে আর গোপন মনের কথাটি নীরব থাকে কি করে?

সব বুঝে নিলেন বিবেকানন্দ—

বুঝে নিলেন মার্গারেটের অধীর আকুতির অন্তরটিকে।

বলতে লাগলেন—'এ অবস্থায় ওদেশে যে কত বাধা ঠেলতে হবে সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নাই—' মার্গারেটের অন্তরে একটি আবেদনের সুর জাগে—মেনে নেব স্বেচ্ছায় সে বিঘ্ন-বন্ধুর বাধাকে। মেনে নেব দুঃখের তপস্যার সাধনটি। তবুও একটিবার অধিকার দাও, দাও তোমার পাশে পাশে চলতে, তোমার কর্মাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনকে জীবের জনতায় বিলিয়ে দিতে। তবেই হবে জীবন আমার ধন্য। বুঝব বৃথায় যায়নি আমার সাধন। তা কি তুমি দিতে পার না?

বললেন বিবেকানন্দ, 'মানব পুত্র যীশুর মাথার নীচে দিয়ে শয়ন করবার মত এক টুকরো পাথরও ছিল না, এই রমৃতা সন্ন্যাসীদেরও মাথার ওপরে কোন আচ্ছাদন নেই, সূর্যের আগুন—তাতে দিন ভোর তাদের পথ চলা। কিন্তু শুধু পথ চলার দিন আজ ফুরিয়েছে। আমার বিশ্বাস এমন দিন আসবে, যে দিন দল বেঁধে সন্ন্যাসীদের যেতে হবে গ্রামে গ্রামে। সারা দিনের হাড়ভাঙ্গা শ্রমের শেষে সন্ধ্যায় চাষীরা যখন ফিরে আসবে ঘরে, তখন গিয়ে বসবে এরা তাদের কাছে, বলবে কথা। সন্ন্যাসীকে শুধু ধর্মের কথা বললেই চলবে না—পাশ্চাত্য ভাষায় যাকে বলে 'শিক্ষা' সেই শিক্ষা দেওয়ার ভার নিতে হবে তাদের। এই নিরক্ষর অগম্য চাষী-মজুরের চোখ ফোটানোই হবে সন্ন্যাসী সঙ্ঘের কাজ।'

তাকিয়ে আছে মার্গারেট। মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে আগুন তার বুকে।

ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় মুহূর্তে—

ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় কর্মের সফেন সমুদ্রে।

বললেন আবার বিবেকানন্দ, 'ভারতবর্ষের সঙ্গে ঘটাতে হবে তাদের পরিচয়। বলতে হবে দেশের কথা, পাশ্চাত্যের জীবন যাত্রার স্বরূপকে ধরতে হবে তুলে ওদের চোখের সামনে।······রাখতে হবে তাদের সম্মুখে একটা বলিষ্ঠ নৈতিক আদর্শ। ওরা যে ছোট নয় এই আশ্বাস দিয়ে সঞ্চার করতে হবে তাদের মনে আত্মোন্নতির আশা। তবেই সফল হবে সন্ন্যাস জীবনের আদর্শ। সফল হবে তাদের সাধনা।'

কয়েকজন শিষ্য নিয়ে যাত্রা করলেন স্বামিজী সুইজারল্যাণ্ডে। বড় ভালো লাগল স্বামিজীর। পার্বত্য দেশ। শ্যাম সবুজ-বর্ণ পথ। যেন বিস্তার করে দিয়েছে মায়ের মত স্নেহ-শীতল অঙ্ক। চলে যায় কবির মন, চলে যায় কোন এক দূর আকাশের কোলে। ভাবস্নিগ্ধ অন্তরে জাগে ব্রহ্ম সমুদ্রের উচ্ছ্বাস।

ছিন্ন হয়ে যায় আমিত্বের বন্ধন।

মিলিয়ে যায় অনোরণীয়ান মহতোমহীয়ানে তার সমস্তটা সত্তা।

আঁজল ভরে দেন ভক্তির অর্ঘ্য—

অর্ঘ্য দেন পর্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবীর শ্রীচরণে।

কণ্ঠে ধ্বনিত হোল হিন্দু মন্ত্রের প্রাসাদ ঝঙ্কার। আভাসিত হোল তার মানস-নেত্রে একটি কল্পিত তীর্থের গৈরিক পথ। আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে ব্যক্ত করলেন তা—ব্যক্ত করলেন স্বামিজী সে মোহন মধুর স্বপ্নের কথা সেভিয়ার দম্পতির কাছে। স্থাপিত করতে হবে একটি মন্দির এই হিমালয়ের হিম-শান্ত ক্রোড়ে। পূব আর পশ্চিমের অধ্যাত্ম প্রবাহে অভিষিক্ত হবে সে তীর্থ পীঠ। ধ্যান, সাধন, ভজন ও কীর্তনে উঠবে মুখর হয়ে পর্বতের বিজন গহন।

কথাগুলো নিবিষ্ট মনে শুনে যায় সেভিয়ার দম্পতি। প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে তার চেতনায় স্বীকৃতির শপথ। গুরুর স্বপ্ন-সাধনায় করল তারা আত্মোৎসর্গ। গুডউইনের সহৃদয়তা এবং সেভিয়ার দম্পতির শুভ কামনায় কাজ চলতে থাকে ধীরে ধীরে।

মন অধীর হয়ে যায় মার্গারেট নোবিলেরও। ইচ্ছে হয় ঝাঁপিয়ে পড়তে ওদের মত স্বামিজীর কাজে। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বন্ধন হয়েছে ছিন্ন। আর কোন ভাবনা নেই মনে। এবারে স্বামিজীর পাশে পাশে থাকবার জন্যেই মার্গারেট ব্যগ্র, ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

এমনি দিনে বললেন স্বামিজী মার্গারেটকে—

বললেন, 'একটা পরিকল্পনা করেছি স্বদেশে স্ত্রী-শিক্ষার, মনে হয় অনেক সাহায্য পাব তোমার কাছ থেকে।'

মার্গারেট চমকে উঠল। এ যে তার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কতবার মাথা কুটে নির্জন অন্ধকারে বলেছে মনের একান্ত আকুতির কথাটি। শুনতে চেয়েছে মনের মৌনের মুখর কণ্ঠ। কিন্তু ঘটেনি তা ভাগ্যে, চোখের জলে ভেসে গেছে গণ্ড। দীর্ঘশ্বাসে দীর্ণ হয়ে গেছে বক্ষ। সম্মুখে কেবল দেখেছে নিরাশার মরু-বালু তীর। আর বলেছে বেদনঘন কণ্ঠে—

বলেছে মার্গারেট—'শূন্য মন্দির মোর।'

আজ কি তবে শূন্য মন্দিরে এসে অধিষ্ঠিত হোলেন দেবতা!

বুঝি তাই। ভক্তি আপ্লুত অন্তরে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে মার্গারেট, তাকিয়ে থাকে আরো কিছু শুনবার জন্যে।

স্বামিজীর মুখখানা যেন সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলতে লাগলেন তিনি, 'ভারতবর্ষের হাজার হাজার মেয়ে আছে প্রতীক্ষা করে, তাদের পাশে গিয়ে যদি দাঁড়ায় পশ্চিমের একটি মেয়ে, যদি বোঝে তাদের জন্যে, দেখিয়ে দেয় যদি পথ, তবে তারা মাথা তুলে সাড়া দেবে। অবরোধে রুদ্ধ হিন্দু মেয়ের অন্তর শিশুর মতই অর্ধ উন্মিলিত, কিন্তু তাদের চারিত্রিক মাধুর্য আছে। আছে সরল বিশ্বাস আর অক্ষয় ৎসাহের অনুপম ঐশ্বর্য। তাদের জীবন-গড়া ত্যাগ ও সহিষ্ণুতায়, তারা জানে আদর্শ রক্ষার জন্যে জীবন সংগ্রামে লড়তে। এই গুণে অম্লান হয়ে জ্বলছে সতীর তেজ তাদের মাঝে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির বন্যায় ভেসে যাবে একদিন ওদেশের গ্রামের কুটীর, কয়েকখানা পর্বত, বনানী আর জনাকীর্ণ নগর বন্দর—জেগে উঠবে সারা দেশ তার নামে। সেদিনের সে আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্যে চাই কর্মী—নারী-পুরুষ দুই-ই—'

আকুল হয়ে যায় মার্গারেটের মন। ছটফট করে যেন। মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। অধীর অন্তরে তুফান জাগে। ঘনিয়ে আসে ঘোর। পথ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয় মার্গারেট। একটা অসহ্য যাতনা তাকে পেয়ে বসে। মাঝে মাঝে প্রদীপ্ত বহ্নির মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার আশার রোঁসনাই। আবার ক্ষণ-ভাতির মত যায় তা মিলিয়ে—

মিলিয়ে যায় নিরাশার নিরন্ধ্র অন্ধকারে। বড় অসহায় হয়ে পড়ে মার্গারেট। মন মধ্যাহ্নের প্রখর্য থেকে চ'লে আসে গোধূলির গভীর গুহায়। শূন্য লাগে বুক। জল আসে চোখে। মার্গারেট কেঁদে ফেলে নীরবে। অসুস্থ মন।

অধীর চিত্ত। হৃদয়ের দহন জ্বালায় আপন সত্তাকে চায় সে স্বামিজীর পদপ্রচ্ছায়ে প্রলীন করে দিতে। জগতের মঙ্গল, জগতের সেবা, এই হবে তার জীবনের ধ্যান জ্ঞান। কিন্তু মন আবার মুক্তির পরিধি থেকে চলে আসে—চলে আসে সংকীর্ণ ভাবনার গণ্ডিতে। যে স্বপ্ন মার্গারেটের চোখে দিন রাত আভাসিত হচ্ছে থেকে থেকে—পীড়া দিচ্ছে গভীর ভাবে, মার্গারেটে কি সে পথে পা দেওয়ার উপযুক্ত হয়েছে? স্বামিজীর কাছে কি তার কার্যক্রম স্বীকৃতি পেয়েছে?

উল্টো ভাবনার ঝড় এসেও তাকে বিধ্বস্ত করে যায় মাঝে মাঝে। হৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো মুহূর্তে ভেঙ্গে যায় খান খান হয়ে। আত্মদ্বন্দ্বের প্রবল মন্থনে

নিস্তেজ হয়ে পড়ে মার্গারেট। তার সমস্ত আশার আকাশখানা জুড়ে যেন উড়ে আসে মলিন মেঘের পাল। মার্গারেট হতাশায়, বেদনায় হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। মনে পড়ে স্বামিজীর কথা, 'জগতের ভাল করা মানে আসলে নিজেরই ভাল করা।'

মনটা আবার যেন একটু বল ফিরে পায়। ভাল করে বিশ্লেষণ করে মার্গারেট—বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দের উক্তিটি।

যে ভুবন বাইরে পরিদৃশ্যমান হয়ে আছে, ঠিক অমনি আর একটি ভুবন ঘুমায় অন্তরে। সেখানে যেতে হয় মনের সোপান বেয়ে বেয়ে। জীবনের তিনটি স্তরকে পরিক্রম করে সেখানে গিয়ে পৌঁছিতে পারা যায়। মুমুক্ষু সাধকের মোক্ষলাভ হয় তিনটি স্তর পরিক্রমার পারে। তিনটি অবস্থার অন্তে উন্মুক্ত হয় তার সিদ্ধি-দ্বার।

দুনিয়ার মানব গোষ্ঠীর সন্নিবেষ্টিত চৈতন্যকে বলে মনু। এই মনুরূপ চৈতন্যের অনুই হোল মনুষ্যরূপ। তাই তো আখ্যা দেওয়া হয় মনুষ্যগণকে মনুজ বলে। মানুষের যখন মনুজ ভাব, তখন থাকে তার অহং বোধ জাগ্রত। উদ্দীপ্ত হয় সে 'আমিত্বের' অহংকারে। পরিবেষ্টিত থাকে তার চেতনার অখণ্ড 'মন্দিরটি' ক্ষুদ্র খণ্ড সসীম সীমানার গণ্ডীতে। সে তখন আমিত্বের মোহে মুগ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু যখন সে উপনীত হয় বোধময় ক্ষেত্রে, তখনই লাভ হয় তার মনুত্ব।

মনুত্ব কি ?

মনুত্ব লাভ করলে সাধক তখন হয়ে যায় অষ্টম। তবে অষ্টম কি ?

'অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ ঐশ্বর্য্যাণি বা নিয়ন্তে অস্মিন্ ইতি অষ্টমঃ।'

যোগাসক্ত সাধকের লাভ হয় যোগলব্ধ ঐশ্বর্য। অনিমা লঘিমা ইত্যাদি সিদ্ধি হয় তার আয়ত্তাধীন। অষ্টাশ্বৈর্য লাভ ক'রে ভক্ত উপলব্ধি করে ভগবৎ সত্তা। অবগাহন করে আনন্দের রস সমুদ্রে। খসে যায় তার অষ্ট পাশ। থাকে না আর লজ্জা, মান, ভয়, বাধা ইত্যাদির আবরণ। এই ভাবটিকেই বলা হয় অষ্টম।

অষ্টমের পরেই ব্রহ্ম বোধ। জীব-শিবে অভিন্ন ভাব। নারী-নরে প্রভেদহীনতা। অভেদ জ্ঞানে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের পরীক্ষা। যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণিকে সম্মুখে রেখে।

মনকে কর মন্দির। প্রতিষ্ঠা কর সেখানে আত্মাকে। তারপরে অর্চনা। অঞ্জলি আর আরাধনা। তবেই সত্য স্ফুরিত হবে। চৈতন্যের আকাশে উদয় হবে চন্দ্রের। বিশ্ব এসে ধরা দেবে হৃদয়ের অঙ্গনে।

তবে মার্গারেট সেই অষ্টম হবার সাধনায়ই করবে আত্মোৎসর্গ। দাঁড়াবে জীবের

জনতায় সেবার মন নিয়ে। মনের আর্শীতে একটি উজ্জ্বল শপথের লেখা ফুটে উঠল —'স্বামিজীর কাজ করতে হবে।'

হেনরিয়েটা মুলারকে অনুরোধ করল মার্গারেট—

অনুরোধ করল তার প্রগাঢ় অন্তরের অভিলাষ পেশ করবার জন্যে স্বামিজীর কাছে।

সম্মত হোল হেনরিয়েটা।

মার্গারেট অধীর প্রতীক্ষায় দিন কাটাতে লাগল। এলো সে শুভ লগন। বলল সব কথা খুলে—

খুলে বলল হেনরিয়েটা স্বামিজীর কাছে।

ছিল সে দিন মার্গারেটও স্বামিজীর সঙ্গে।

শুনলেন সব কথাগুলো স্বামিজী—

শুনলেন নিবিষ্ট মনে আবিষ্ট অন্তরে। বললেন অবশেষে, বললেন ওদের দিকে তাকিয়ে, 'আমি আমার কথাই বলতে পারি। দেশের যে কাজের ভার নিয়েছি মাথায়, তার জন্য আমি দু'শোবার জন্ম নিতে প্রস্তুত।'

মার্গারেটের মনটা মুহূর্তে যেন সজাগ হয়ে উঠল। বুঝে নিল সে, স্বামিজীর ইঙ্গিত তাকে উদ্দেশ্য করেই।

'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়—'

কর্মময় মুখর বিশ্বে লোকশিক্ষা দিতে হবে কাজের মাধ্যমে। বক্তৃতায় কিছু এগোবে না। মানুষের চেতনার উদ্বোধন হয় আদর্শের জাগ্রত স্বাক্ষরে। মন ও মুখ এক করতে হবে। তার পরে কৃচ্ছ্র সাধন। বীর্যবান আদর্শ পুরুষের লক্ষণ হোল এই। পাশ্চাত্য যাকে নাম দিয়েছে 'সাইক্লোনিক হিন্দু' তার মুখে এমন বজ্রনিনাদ ধ্বনিত হবে না তো কি?

বললেন আবার স্বামিজী—

বললেন মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে—'হাঁ, ভারতবর্ষই তোমার আপন ঠাঁই! কিন্তু সে জন্য তোমায় তিলে তিলে প্রস্তুত হতে হবে।'

নিজেকে তৈরি করতে হবে কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে। ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বিপদ বন্ধুর পথে। দহন, বেদন, দুঃখ, হাহাকারকে অন্তরের অন্তস্থলে ঠাঁই দিয়ে অনুভব করতে হবে জীবের দুঃখ। তার পরে উৎসর্গ করতে হবে জীবন। সেবা ধর্মের আদর্শে দীক্ষিত করতে হবে শত শত প্রাণকে। মুছিয়ে দিতে হবে আর্ত পীড়িত অসহায় মানুষদের চোখের জল।

সংসারে দুঃখ আছে অনেক। কিন্তু সে দুঃখের পঙ্কেও যে পঙ্কজ ফোটে, তাই জানিয়ে যেতে হবে জনে জনে। কান্নার শেষ নেই জীবের। কিন্তু শিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠার মন্ত্র উচ্চারণ করে ক'জনে? কেবল স্বার্থের গুণনে অসত্যের অভ্রভেদি চূড়ারোহণের স্বপ্ন বিলাসে মন মগ্ন। এই মগ্নতাকে দিতে হবে মোড় ঘুরিয়ে। রাখতে হবে তাদের সম্মুখে শুভ সত্যের জ্যোতির্ময় শিখা।

মার্গারেট দিন গুণতে লাগল—

দিন গুণতে লাগল তার শৈশবের মানচিত্রে দেখা ভারতবর্ষের তীর্থ-পথের জন্যে।

সংসার সমুদ্রে যে বেদনার মন্থন জাগে, সে মন্থনে যারা পড়তে পারে ঝাঁপিয়ে হাসিমুখে, তারাই হতে পারে জীবনযুদ্ধে জয়ী। প্রতিভার যেমন বহুমুখী রূপ আছে, আছে যেমন মন মাতান গন্ধ ফুলের, তেমনি বেদনারও আছে বিচিত্র বিলাপ। কিন্তু এর সবার ওপরে আছে এক অদৃশ্য শক্তির খেলা। সে খেলার সঙ্গে যারা পরিচয় লাভে অক্ষম, তাদের দুঃখের রাত্রি আর অবসান হতে চায় না। তিলে তিলে পলে পলে তারা তপ্ত তাপিত হয় বাসনার বিলোল বেদনায়। বারো আনা লোকেরই এই ভাব। তাদের চেতনা বহির্মুখী। অবশেষ যারা, তারা হন আত্মগত, মনমুখী। তাকান অন্তরের দিকে।

উপনিষদ বলেছে :—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাং পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যাগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

(কঠোপনিষৎ)

বাইরের দিকে ইন্দ্রিয়দ্বার খুলে যায় সহজে। এ বিধান বিধাতারই। তার মাঝে দু' একজনের দৃষ্টি হয় ধ্যানীর দৃষ্টি। তাঁরা তাকান না বাইরের দিকে। অমৃতকামী মন তাদের অন্তরের দিকে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ করেন সত্যস্বরূপকে।

কুমারী মার্গারেট সেই বহুর একজন। চেয়ে আছে অন্তরের দিকে। হয়ে আছে তন্ময়। দিন গুণছে এক, দুই করে।

১৮৯৬ সন। নভেম্বর মাস। আর কয়েকটা দিন। তার পরেই স্বামিজী যাত্রা করবেন ভারতবর্ষের তীর্থপথে।

বায়না ধরল শিষ্য-শিষ্যা—তারা যাবে স্বামিজীর সঙ্গে। সম্মতি জানালেন বিবেকানন্দ। দিলেন আশ্বাস। আনন্দে ভরে গেল তাদের হৃদয়।

কিন্তু নীরব একজন। তাকিয়ে আছে হৃদয়ের গহনলোকে। বহির্লোকে তার আবেদন পায়নি এখনো উত্তরণের আশীর্বাদ। কিন্তু তাই বলে খেদ নেই মার্গারেটের মনে। তাকে যে তৈরী হতে হবে প্রতিটি পল মেপে মেপে। তিলে তিলে প্রস্তুত করে নিতে হবে মনকে। এখনো দ্বন্দ্ব আছে। আছে প্রশ্নের প্রভঞ্জন অন্তরে। তাই সে রয়ে গেলো।

দুর্গমের দিগন্তে পা দেওয়ার পূর্বেই যত ভাবনার তুফান। একবার পদপাত

করলে পরে আর ফিরে তাকাবার অবকাশ থাকে না যে, তাইতো স্বামিজী তাকে আরও গভীর, আরও নিবিড়ভাবে ভাবতে সময় দিয়েছেন।

কিন্তু সাথীরা একটু অবাক হোল। অবাক হোল মার্গারেটকে স্বামিজীর সঙ্গে না দেখে।

ঝড়ের বেগে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন বিবেকানন্দ। সাঙ্কেতিক লেখক গুডউইন টুকে নিচ্ছেন তা কাগজে,--'সগুণ ঈশ্বরের কল্পনাটা নেহাৎ অযৌক্তিক। কিন্তু বেদান্ত বলেছেন, মানুষের মনে নির্গুণের ধারণার চরম প্রকাশ ঐ সগুণে। সে দিক থেকে বিচার করলে ওটা যে যুক্তিসিদ্ধ শুধু তা নয়, ও-ছাড়া মানুষের চলেও না।' ২০শে নভেম্বর বললেন স্বামিজী মার্গারেটকে -'প্রকৃতির সব রহস্যের ব্যাখ্যা তার বুক চিরেই উদ্‌ঘাটন করতে হয়, এই দিক দিয়েই বেদান্ত আর বিজ্ঞানে আশ্চর্য মিল। দ্বৈতবাদী ধর্ম বা শাস্ত্র বাইরে হাতড়িয়ে মরে শুধু। প্রকৃতির তত্ত্ব খুঁজতে হবে তার নিজের মাঝে।'

মার্গারেটের প্রসুপ্ত চেতনার আকাশে ধীরে ধীরে চৈতন্যের চন্দ্রোদয় হোল। তার মনের সব কালিমা ধুয়ে-মুছে গেল। একটা নতুন দিগন্তের দুয়ার খুলে এলো উজ্জ্বল দীধিতি।

মার্গারেট হয়ে গেল আরো নীরব। হয়ে গেল আরো মৌন। এ যেন ডুবুরী নিমগ্ন হয়ে যাচ্ছে অন্তরের গভীরে। অতলায়িত হয়ে যাচ্ছে অন্তরের মধুরে।

মাস ছয়েক পূর্বে লিখেছিলেন স্বামিজী মার্গারেটকে—'আমার জীবন দর্শন কী, অল্পকথায় তা বলতে পারি। মানুষ যে অমৃতের পুত্র, এই বাণী শোনাতে হবে তাকে, কী করে ফুটিয়ে তুলবে জীবনের প্রতিটি কর্মে এ সত্যকে, তারই শিক্ষা দিতে হবে।'

এক এক করে সমস্ত কথাগুলোই স্মরণ হোল মার্গারেটের। মনের ক্রান্তিবৃত্তে এসে ছায়ার মত সঞ্চারিত হোতে লাগল স্বামিজীর কর্মময় জীবনের ছবি। ধ্বনিত হোয়ে উঠল যেন তারই কণ্ঠ--'সমস্ত জগৎ বাঁধা কুসংস্কারের শিকলে। আমি যে শুধু নির্যাতিতকেই করুণা করি তা নয়, যে নির্যাতন করে তার জন্যও আমার দুঃখ হয়। একটা কথা আমার কাছে দিনের আলোর মত স্পষ্ট—দুঃখের একমাত্র কারণ অবিদ্যা,—তাছাড়া কিছুই নয়। কে দেখাবে জগৎকে আলোর পথ? প্রাচীনকালে যজ্ঞ বা আত্মোৎসর্গকে মানা হত বিশ্বের বিধান বলে; যাই বল না কেন, যুগ-যুগ ধরে এ বিধান কায়েম থাকবে। পৃথিবীর যাঁরা বীর, যাঁরা মহাপ্রাণ, তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করবেন বার বার 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়চ'। অনন্ত প্রেম ও করুণা নিয়ে এক বুদ্ধ নয়, আসতে হবে শত শত বুদ্ধকে জগতের প্রয়োজনে।'

'……আজ পৃথিবীর প্রয়োজন চরিত্রবল। এমন মানুষ চাই, যাদের জীবন শুধু নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমের একটা বহ্নিদহন।'

'তুমি যে সংস্কারমুক্ত এতে আমি নিঃসংশয়। তোমার গভীরে আছে জগৎকে টলিয়ে দেওয়ার বীর্য।…জাগো, জাগো, হে বিরাট! হাঁকো, হেঁকে চলো—ঘুমন্ত দেবতার ঘুম ভাঙুক, অন্তরের ঠাকুর সাড়া দিন তোমার ডাকে। জীবনে এ ছাড়া আর কি করবার আছে?……আমি শুধু বলে চলি, জাগো, জাগো।

নিজে জেগে জাগ্রত কর জগৎকে। তাদের কানে রাখ জীবনের মন্ত্র। প্রাণে দাও জ্বালিয়ে দহনের অগ্নি। তবেই তারা দুর্গমের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। ছিঁড়ে আনতে শিখবে নিশীথ রাত্রির বৃন্ত থেকে প্রস্ফুটিত প্রভাত।

যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন স্বামিজী। ১৬ই ডিসেম্বর রওনা হলেন। ভারতবর্ষের স্বপ্ন তাঁকে উতলা করে দিল। এমনি দিনে যাত্রার প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করেছিল একজন ইংরেজ বন্ধু স্বামিজীকে—

'স্বামিজী! চার বছর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরব মুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্যভূমিতে ভ্রমণের পর আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগবে!'

বলেছিলেন বিবেকানন্দ—'…এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার নিকট এখন পবিত্র মাখা, ভারত এখন আমার নিকট তীর্থস্বরূপ।'

এলেন চলে স্বামিজী ভারতবর্ষে। কিন্তু লণ্ডনের শিষ্য ও বন্ধুদের কর্মপ্রবাহ একটু মন্থর হয়ে গেল। তারা যেন পড়ল ভেঙে। তাদের মাঝে দেখা দিল অনুদ্যমতা।

কিন্তু মার্গারেট অটল। দাঁড়াল এসে মিঃ স্টার্ডিকে নিয়ে ঝিমানো জনতার সামনে। এমনি দিনে এসে গেলেন স্বামী অভেদানন্দ লণ্ডনে। ভাঙা হাটে বেজে উঠল মিলনের ঐকতান।

এগিয়ে চললেন বিবেকানন্দ শ্যাম সবুজ ভারতবর্ষের পথে পথে। বিপুল সংবর্ধনায় মুখর হয়ে উঠল জনতা। চলে এলেন স্বামিজী কলকাতায়।

আগত ঠাকুরের জন্ম বার্ষিকী। যোগ দিলেন এসে কর্মব্যস্ত সতীর্থদের সঙ্গে বিবেকানন্দ।

এবারে বিবেকানন্দ নেতা। পশ্চিমের সংগঠনী কৌশল হয়েছে তাঁর আয়ত্তাধীন। গুরুভাইদের নিয়ে তিনি প্রথমেই অভিযান শুরু করলেন হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করবেন দেশকে। শোনাবেন সাম্য,

মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী। ভেঙ্গে ফেলবেন ভেদাভেদের পাঁচীল। দাঁড়াবেন এসে তিনি দলিত, লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত মানুষের পাশে। দেবেন তাদের পবিত্র অধিকার-প্রতিষ্ঠার মন্ত্র। মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেও যারা মানুষের মত বাঁচতে পারলে না—তাদের আনতে হবে টেনে। শোনাতে হবে জীবন-বেদের সাম স্তোত্র।

বললেন তাঁর অনুরাগী ভক্ত ও সতীর্থদের সম্বোধন করে স্বামিজী—

"বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যারা এই উচ্চাদর্শ ভুলে যায়—বৃথৈব তস্য জীবনং। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগন-ভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ বিধুরার প্রাণে শান্তি দান করতে, অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।······আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—আমাদের জন্ম। কি কচ্চিস্ সব বসে? ওঠ্—জাগ নিজে! নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্—নরজন্ম সার্থক করে দিয়ে চলে যা—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

প্রবল তোড়ে চললেন ভেসে—

ভেসে চললেন স্বামিজী। যুগধর্মের মহান বাণী দিতে লাগলেন ছড়িয়ে, ছড়িয়ে দিতে লাগলেন মানুষের মনোলোকে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ। ১লা মে।

আহ্বান করলেন বিবেকানন্দ গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দকে—আহ্বান করলেন বাগবাজারে—বলরাম ভবনে।

যুগের জীবনে এসেছে নব তরঙ্গ। জেগেছে কল্লোল। মহান মন্ত্রের ধ্বনি উঠেছে রণিত হয়ে। স্বামিজীর কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনির মর্মছেঁড়া বিঘোষণ—'নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হ'তে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈয়ারী করা বা সাধারণের সম্মতি নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে যখন ইতর-সাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন মত মতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্র মতে সঙ্ঘের কার্য চল্‌তে পারবে। সেইজন্য এই সঙ্ঘের একজন প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সকলের মত নিয়ে কার্য করা হবে।'

ওরা উৎকর্ণ হয়ে শুনছে, শুনছে নিবিষ্ট মনে।

বললেন আবার স্বামিজী—"আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস, আপনারা এ কার্যে সহায় হোন।"

সম্মতি জানাল সকলে। প্রতিষ্ঠিত হোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্। ঘোষণা করলেন উদ্দেশ্য, আদর্শ মিশনের। শুরু হোল কাজ। ৫ই মে প্রস্তাবের একখানা অনুলিপি পাঠিয়ে দিলেন স্বামিজী, পাঠিয়ে দিলেন নিবেদিতার কাছে। পত্র লিখিলেন —'এক একটা সময় আসে যখন মানুষের মন একেবারে ভেঙ্গে পড়ে—বিশেষতঃ, একটা আদর্শের পিছনে সারা জীবন খেটে তাকে অংশত সার্থক করবার ক্ষীণ আশার মুখে হঠাৎ যদি মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ে।

'রোগের জন্য আমি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করি না···তুমি তো জান, মুশকিল হল টাকার অভাব।··অবশ্য কাজ আমি আরম্ভ করেছি কোনও মতে। একটা নড়বড়ে ছোট্ট পুরোনো বাড়ীও ভাড়া হয়েছে তিন টাকায়, সেখানে প্রায় চব্বিশটি তরুণকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।'

পত্র পেয়ে মার্গারেট মনের আনন্দে উঠল নৃত্য করে।

জয় দিলে ঈশ্বরের নামে। ছড়িয়ে দিলে এ সংবাদটি—

ছড়িয়ে দিলে জনে জনে। মঠের উদ্দেশ্য ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হোল সে। মিলিয়ে নিল আপন জীবনাদর্শের সঙ্গে ওখানকার দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহের পল অনুপল-গুলো।

মন মগ্ন হোয়ে গেল মুহূর্তে। আত্মার আকাশে চির ভাস্বর অরুণ লেখার মত স্বামিজীর পত্রখানা আভাসিত হতে লাগল বারে বারে। ভেসে এলো তার আশার তরণী, ভেসে এলো দেহ পিঞ্জরের মনোসায়রে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা এসে উঁকি দিল --

উঁকি দিল তার মনের বিরলে—'মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলা হয়েছে।'

যদি কোনদিন মার্গারেট আসে, আসে যদি ভারততীর্থে, তবে অমন করে একটি স্কুল সে করবে। তারই মাধ্যমে নূতন শিক্ষা-দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে তুলবে সে কচি কচি শিশুমনগুলোকে।

দুখ-যামিনীর বুকে হয়েছে আলোর সঞ্চার। আশাহত মরণীয় মন পেয়েছে প্রাণের পরশ। খুশিভরা চিত্ত। ছোঁয়া লেগেছে অনন্ত নীলিমার। আর ভাবনা নেই। অপসৃত হয়েছে মেঘের মালিন্য। মুছে গিয়েছে কুয়াশার কুহেলী। নক্ষত্রের উজ্জ্বল দীপ্তির মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে মার্গারেটের মন। আজও থেকে থেকে স্বামিজীর পত্রগুচ্ছ মনের আশিতে উঁকি দিয়ে যায়—'তোমায় স্পষ্ট করে বলি, তোমার প্রত্যেকটি কথার দাম আছে আমার কাছে। প্রত্যেকটি পত্রই হাজারবার সুস্বাগত। ইচ্ছে হলেই সুযোগ মিলবে। আমায় পত্র দিও। যে কথা মনে আসে স্পষ্ট করে লিখো। ভুল বুঝব না তোমায়, কোন কথাই উড়িয়ে দেব না অবুঝ হয়ে। ওখানকার কাজের কোন খবর পাইনি আজও। কেমন চলছে কাজ? আমায় নিয়ে যতই উৎসব হোক না কেন, ভারতবর্ষ থেকে কোন সাহায্য পাওয়ার আশা আমি রাখি না। কারণ এরা বড় গরীব!' ১৮৯৭ সালের ২০শে জুনের পত্র। লিখেছেন স্বামিজী আলমোড়া থেকে।

চিঠি পড়তে পড়তে মার্গারেটের অন্তর কেঁদে ওঠে। সংগ্রামের প্রথমেই কষ্ট। সমাধান হয়ে গেলে তো রাজার আসন। তৃপ্তির প্রশান্তি। দুঃখের শেষ ধাপে আলোর আভাস, কিন্তু দুঃখপ্রবণ মন চাই। কেন? সেই আলোর রথকে অভ্যর্থনা জানাতে। এমন দিনে মার্গারেট যদি থাকতে পারত স্বামিজীর কাছে—তবে সে তার প্রাণ উজাড় করে দিত স্বামিজীর আরব্ধ কর্ম প্রবাহে। এ অধিকার সে কবে পাবে? কবে মার্গারেট যোগ্যা হবে যোগীর? যুক্ত হবে ভারত-তীর্থ-পতির সঙ্গে তাই নিয়ত ভাবছে। স্বামিজীর হৃদ্-বিদারণ আর্তি যে অসহনীয়। বড় মর্মান্তিক ও পীড়াদায়ক—'গাছতলায় বাস করে কোন মতে দেহ টিকিয়ে রেখে চলা---এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। কাজও শুরু করেছি ঠিক সেই ভাবেই।...কয়েকটি ছেলেকে পাঠিয়েছি দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে। ফল হয়েছে অদ্ভুত। এ আমি জানতাম, এবারে চোখে দেখলাম। এরা সব ভদ্র ঘরের ছেলে।...নিম্নবর্ণের জন্য কিছু দিন সবুর করতে হবে। প্রথমে ভদ্র ছেলেদের একটা দল পাঠিয়ে দেশের সর্বত্র কাজের ভূমিকা রচিত হবে। দেশের অধ্যাত্ম প্রগতির পথে এরা কুলি-মজুরের কাজ করে রাস্তা তো পরিষ্কার করুক, তারপর আসবে বড়-বড় সিদ্ধান্ত খাটানোর সময়, দর্শন-চর্চার অবকাশ।'

চিঠিগুলো সহজ, সরল। কিন্তু তার মাঝে রয়েছে একটা বেদনার স্বর। যা মার্গারেটের অন্তরেও তুলে দিয়েছে ঝড়।

সে দ্বিধাহীন হয়ে পথে নামল। এ বীর যোদ্ধাকে কিছুতেই বিফল হতে দেবে না মার্গারেট। তার হৃদয় বৃত্তির সব শক্তি দিয়ে রচনা করবে সে নিজেকে। এই তো সুযোগ। দেবতারে না যদি প্রিয় করে নিতে পারল, তবে আর সাধনা কিসের। গুরু থেকে শুরু করতে হয়। তার পরে গুরুর মাঝ দিয়েই লাভ হয় অনন্তের অখিলের অধিপতির।

স্বদেশের স্তিমিত মর্মে স্বামিজী সঞ্চার করতে লাগলেন অগ্নির উত্তাপ। বিদেশের সংশয়াচ্ছন্ন মনগুলোকে উদ্দীপ্ত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্গারেট। এ যেন দুই সীমান্তে দুই ধাত্রী বিশ্বধারণের মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে।

মার্গারেট স্বামিজীকে সাহায্য করার জন্যে চাঁদা তুলতে নামলেন। দ্বারে দ্বারে গিয়ে নিবেদন করলেন ভারত বিগ্রহের বাণী। শোনালেন নতুন জীবনের নতুন সংবাদ। সংবাদপত্রগুলো লিখল—

লিখল লণ্ডনের সংবাদপত্রে—'এক অভিনব ধর্ম প্রতিষ্ঠান, খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুর সমবায়ে গড়া এমন সঙ্ঘ বুদ্ধের পর থেকে আর হয়নি। আপনারা দান করুন মুক্তহস্তে। একমাসের মধ্যে দশ হাজার লোককে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করেছে এই সঙ্ঘ! এক মুঠো চালের বিনিময়ে একটা মানুষ ছিনিয়ে আনা যায় মরণের মুখ থেকে। আমাদের সাহায্য আজ একান্ত প্রয়োজন।'

এক মুঠো চাল।

সোনাভরা ভারতে সে আর কতটুকু? কিন্তু না। এই এক মুঠো করে লক্ষ কোটি মুঠো চালের সঞ্চয়ে রচিত হয় অন্নের পাহাড়। মুক্তহস্তে লণ্ডনবাসী ভারতের আর্ত-পীড়িত নিরন্ন ভাই-বোনদের দুঃখের দিনে দান করতে লাগল। উপকৃত হ'ল ক্ষুধাক্লিষ্ট জন ও জনতা। পেল তারা বল। শাক্ত শক্তির নব বলে বলিয়ান হয়ে উঠল তারা। স্বামিজীর অন্তর আনন্দে ভরে গেল। তারই হাতে গড়া মানুষ এরা, যারা আজ দূরে থেকেও কাছে ঘনিয়ে আসছে। প্রীতির প্রশান্তি দিয়ে রচনা করছে তারা মমতার মন্দির। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' তাদের আগমনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আসবে। তারা আসবে ভারতবর্ষের তীর্থপীঠে জীবনের সার্থকতা খুঁজতে। আসবে ভোগবাদের চূড়া থেকে ত্যাগ তিতিক্ষার সমতল সৈকতে—যেখানে পাওয়ার ক্রন্দন নেই, নেই ভোগের বাসনা, এমন দেশটি না দেখে তারা কিছুতেই ছাড়বে না।

তাই তো মার্গারেটের মন আকুল। ব্যাকুল বাসনায় ক্লিষ্ট।

পত্র এলো স্বামিজীর কাছ থেকে ১৮৯৭-এর ২৩শে জুলাই।

কি লিখেছেন?

লিখেছেন আনন্দের সঙ্গে—'এখানে না এসে যদি তুমি লণ্ডনে থাকো, তবে আমাদের হয়ে ঢের বেশি কাজ করতে পারবে। নিরন্ন ভারতবাসীদের জন্য বিপুল আত্মত্যাগ তোমরা করলে। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।'

এ জগৎটা ভরা আছে সুখে, দুঃখে। দয়ায়, মায়ায়। প্রেমে ও প্রীতিতে।

মানুষ ব্যথা পেলে কাঁদে। নীরবে চোখের জল মোছে।

কিন্তু সে দুঃখের শিয়রে যদি এসে দাঁড়ায় সমব্যথী, দরদী, তবে ব্যথা পেলেও তা সইবার সামর্থ্য থাকে।

স্বামিজী ভারতবর্ষে ফিরে বড় হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছিলেন। এখানে আবেগ আছে। ত্যাগ আছে। আছে তিতিক্ষা। কিন্তু দরিদ্র নিরন্নের দেশ শিখেছে শুধু গোলামী। আপন ভাগ্য জয় করতে গিয়ে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে বক্ষ। আত্মশক্তির অভাবে অভিভূত হয়েছে দুঃখে। দৈন্যের পীড়নে পীড়িত হয়েছে বৈ পীড়ন কাউকে করেনি তারা। কিন্তু আজ শক্ত পোক্ত জীবনের আবির্ভাব না হ'লে মরুর কান্না কেউ ঘুচাতে পারবে না। পারবে না তপ্ত পিপাসায় ঢেলে দিতে দুই বিন্দু তৃষা-শান্তির বারি।

মার্গারেটের দান এলো এমন দিনে।

গ্রহণ করলেন স্বামিজী—

গ্রহণ করলেন মহাতৃপ্তি ভরে। বল পেলেন অন্তরে। মন্থর ভাবনায় এলো আশার আশ্বাস। শুনতে পেলেন যেন অসীমের সঙ্গীত। ঘুমন্ত শক্তির বুকে চাবুক কষিয়ে দাঁড় করাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হ'লেন বিবেকানন্দ। দৃঢ় পদপাতে এগিয়ে চললেন সম্মুখের দিকে।

জীবনেরই জয়, জীবনেরই সাফল্য আবার জীবনেরই কান্না।

মানুষ ব্যথা পেলে কাঁদে। ডুকরে কাঁদে। দীর্ঘশ্বাসে দীর্ণ হয়ে যেতে চায় বক্ষ। আড়ষ্ট হয় দেহ। স্তিমিত হয় চোখ। হাহাকার হতাশায় ভরে ওঠে অন্তর।

কিন্তু এ থেকে মুক্তির উপায় কি?

মুক্তির উপায় হ'ল অধিদেবতার চরণ বরণ। অন্তরতমের ভাবনায় ডুবে যেতে হবে। কান্নার অশ্রু অঞ্জলির প্রসূন ক'রে অর্ঘ্য দিতে হবে প্রেমময়ের শ্রীচরণে।

কাজের বিরাম নেই, কিন্তু মার্গারেটের মন গিয়েছে আকুল হয়ে। তার অন্তর

নিকুঞ্জে বেণু বাজে বিরহের। রাতের ঘুম ঝরে পরে চোখের বৃন্ত থেকে। মনটা ছুটে আসতে চায় হু-হু করে ভারতবর্ষের মর্ত্য-তীর্থে।

পত্র লিখল মার্গারেট—

পত্র লিখল স্বামিজীর কাছে—'আমি ভারতবর্ষের কোন্ কাজে লাগব। আপনি আমায় খুলে লিখুন। কেমন করে নিজেকে প্রস্তুত করলে ভারতবর্ষের সেবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব? আমি ওখানে আসতে চাই।'

শুধু এসেই ক্ষান্ত হবে না মার্গারেট—উৎসর্গের আনন্দে নিজেকে মিলিয়ে দেবে—মিলিয়ে দেবে দেব-বাঞ্ছিত ভারতবর্ষের সেবায়। অতন্দ্রিত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকবে মার্গারেট—

দাঁড়িয়ে থাকবে অন্তিম দিনটি পর্যন্ত।

হে পূষণ! তোমার তেজোতপ্ত কটাক্ষে মুছে যাক আমার মনের মালিন্য। ক্ষয়ে যাক অহংকারের অভ্রভেদী অর্গল প্রাচীর। জীবনের দেউল-দ্বারে ধ্বনিত হোক সত্যের বিজয় বিঘোষণ। আমি ছুটব। যেমন হাওয়া চলে সকল বাধা-বিঘ্নের দুস্তর পারাবারকে অতিক্রান্ত করে—ঠিক তেমনি আমি ছুটব। আনন্দ আর আরতি, সেবা আর পূজন এই হোক জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। অন্তর ভরে দাও খুশির প্লাবনে। তুলে দাও হাতে অর্চনার উপচার। তবেই মনে করব, জীবন আমার বৃথায় যায়নি। ব্যর্থ হয়নি আমার আজন্মের সাধনা।

এতদিন একটু কিসের যেন গর্ব ছিল মার্গারেটের মনের দিগন্তে। মাঝে মাঝে আত্মদম্ভে আসক্ত হয়ে প্রজ্ঞার দীপ জ্বালতে গিয়েও ফিরে এসেছে অনেকবার। কিন্তু আজ? আজ সে মুক্ত। শুদ্ধ। পবিত্র। তাকে আসতেই হবে ভারততীর্থে। এই মনোহরণ মরকত শয্যা। পেলব স্নিগ্ধ পুলিন। গহন মধুর শ্যামসমারোহ। এর মাঝে মার্গারেট প্রণিহিত করবে নিজেকে। পূর্বাশার পূষণ যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে তার আকাশে। কেমন করে থাকবে সে বন্দীকারার অন্তরালে? স্থির হয়ে গিয়েছে মন। ভাবনার ভবনে আর বসে নেই সে। এবারে নির্ভাবনার নিশ্চিত আশ্বাসের অপেক্ষাটুকু শুধু। সুন্দরের মন্দির নির্মাণ করতে আসবে সে—

আসবে নির্মল নীল একফালি আকাশের মত একখানা মন লয়ে। সেখানে বাজবে না মেঘের গর্জনি। থাকবে না দ্বন্দ্বের নিশীথ প্রহর। অসত্যের অশিব নর্তন। কিন্তু মার্গারেটের চিঠির জবাব তো এখনো এলো না।

দিনের পর দিন যায়। রাত্রি আসে চুপি চুপি। চিন্তার আপ্লবে ডুবে যায় মার্গারেট। ডুবে যায় সেই পত্রের প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায়। বিলাপ করে আত্মদহনের অনল হুতাশনে—আর কতদিন বসে থাকব তোমার পথ চেয়ে? তুমি ডাকো। আমি আমার সর্ববস্তু ইন্ধন দেবো তোমার কর্মযজ্ঞে। জীবনের যা' কিছু রমণীয়, বরণীয়, তা যেন তোমার জন্যেই ধরে রেখেছি। আমার আত্মগর্ব নেই! নেই অহংকারের মিথ্যা বক্ষস্ফীতি। তোমার গর্বে গর্বিত হতে দাও। তোমার সেবায় উৎসর্গ করতে দাও জীবন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ। জুলাই মাস। ২৯ শে। পত্র এলো স্বামিজীর। এ যেন বিক্ষুব্ধ মনোসায়রে একখানা প্রশান্তির আশ্বাস বাণী।

কি লিখেছেন ?

লিখেছেন, 'ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বে অবশ্যই ভেবে দেখবে ভালো করে। আর কাজে নামবার পর যদি ব্যর্থকাম হও কিংবা ভেঙে যায় মন, আমার দিক থেকে কথা রাখছি, তুমি এ দেশের কাজ কর আর না-ই কর, বৈদান্তিক হ'তে পার আর না-ই পার, আমরণ আমি থাকব তোমার পাশে। "মরদ কী বাত হাতি কা দাঁত" একটা কথা আছে। পুরুষের জবানের নড়চড় হয় না। আমি কথা দিচ্ছি তোমায়—

জীবনের উপল ঠেলে চলতে চলতে যদি আসে অবসাদ, আসে যদি ক্লান্তি, তবে ক্ষয়ে পড়বার আগেই উজ্জীবনের মন্ত্র উচ্চারণ করবে সাগ্নিক সন্ন্যাসী। ঝিমানো জীবনে এনে দেবে চলার ছন্দ। তবে আর ভাবনা কি ? এবারে যাত্রা কর। চলে এসো দেববাঞ্ছিত ভারতবর্ষের গৈরিক পথে।

তারই প্রস্তুতি চলতে লাগল।

এলো এমনি দিনে আর এক পত্র।

১৮৯৭-এর ১লা অক্টোবরের লেখা চিঠি। লিখেছেন স্বামীজি, 'সবচাইতে মুশকিলের কথা এই অনেককেই দেখলাম, তাদের প্রায় সবটুকু ভালবাসাই দিতে চায় আমাকে। কিন্তু আমি তো পারি না বিনিময়ে আমার সবটুকু অন্তর তাদের বিলিয়ে দিতে। তাহলে যে আমার কাজ সেই দিনই যাবে খতম হয়ে। অথচ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির ব্যাপ্তি যাদের আসেনি, তারা কিন্তু এমনি প্রতিদানের আশাটি রাখবেই। মানুষের প্রাণঢালা ভালোবাসা যত পাই ততই ভালো, নইলে কাজ চলবেই না। কিন্তু আমাকে থাকতে হবে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক।…তুমি এটা বোঝ তাতে আমি নিঃসন্দেহ।…আমি নিজে যা, তাই বলছি। অত্যন্ত গভীরভাবে কাউকে ভালবাসতে পারি, কিন্তু দরকার হ'লে নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" উপড়ে ফেলার শক্তি রাখি। ভালবাসব পাগলের মত, কিন্তু থাকবে না কোন বন্ধন। ভালবাসার শক্তিতে জড় চিন্ময় হচ্ছে, এই হলো বেদান্তের শিক্ষা—'

রিক্ত করে দিতে হবে হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা। প্রাণ ঢেলে সেবার পসরা সাজাতে হবে প্রিয়জনের। প্রেমের স্পর্শে পবিত্র করতে হবে জীবন ও মনন। তার পরে সে ব্যক্তি-সুখের মানস-সরসীকে করতে হবে সরোবর। এনে দিতে হবে বিশ্বপ্রবাহের অশ্রান্ত কলনাদ। ক্ষুদ্র স্বার্থের পিছু ছুটে অজ্ঞানীরা রচনা করে অশান্তির কণ্টকশয্যা। কিন্তু যার প্রাণ বিশ্ব-প্রবাহের পরশ পায়—তার চোখ খুলে যায়। জ্বলে ওঠে প্রজ্ঞার আলো। পাষাণের বুকে প্রসূন ফোটে। জড় কাঁদে মমতায়। সুখে বিগতস্পৃহ হয়ে দুঃখকে মেনে নেয় তারা নিরুদ্বিগ্ন মন লয়ে।

কিন্তু জীব-জীবনের মর্মে যে সঙ্গীত ধ্বনিত হয় তাকে এড়িয়ে যাওয়া তো সহজ সাধ্য কাজ নয়? বিক্ষত জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে আক্ষেপের আর্তনাদ প্রতি নিয়ত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছে তার জবাব দেবে কে? কে মার্গারেটের মনোপুলিনে বাঁশরী বাজাবে? কে তার 'শূন্য মন্দির' পূর্ণ করে দেবে মধুমিলনের পরশ প্রশান্তিতে?

নারী তার হৃদয়ের সবটুকু স্থানকে ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু বিনিময়ে সে কি চায়?

চায় একটু পরশ। ভালবাসা। প্রেম ও নির্ভর।

কে দেবে তা মার্গারেটকে? কে করবে তার বুভুক্ষিত নারী-হৃদয়ের সার্থক রূপায়ণ?

স্বামিজী?

হ্যাঁ।

স্বামিজীই তার মনোভঙ্গের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ছড়িয়ে দেবে আশার আশিস্। জীবন-বেদের পাতায় পাতায় লিখে দেবে শোভন মধুর আখর। যে প্রেম শুধু দিয়ে যায়, নেয় না কণাটিও, স্বামিজী সেই প্রেমের মালঞ্চে সাজাবে মার্গারেটকে। করবে আশীর্বাদ। প্রেমের পরশ মধুরে ডুবিয়ে দেবে মার্গারেটের অতীত জীবনের বিধুর আর্তি। তৃপ্তির তড়িৎস্পর্শে তাপিত হৃদয়ের তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে বেজে উঠবে মিলনের সুর লহমা। সার্থক হবে মার্গারেটের জীবন। সুন্দর হবে সে। দেহপিঞ্জর রূপান্তরিত হবে দেবাধারে।

তবে কি স্বামিজী মার্গারেটকে ভালবাসলেন? প্রেম হ'ল দুজনায়?

হ'ল বটে। প্রেম হ'ল। ভালবাসলেন। তাই তো এবারে কাছে ডাকছেন তাকে।

কিন্তু এ কেমন প্রেম? সন্ন্যাসী তো নিরাসক্ত সাধক। তিনি আবার ভালবেসে প্রেমে পড়বেন কি করে? কেমন করে বা লিখলেন তিনি মার্গারেটকে—'আমরণ আমি তোমার পাশে থাকব···পুরুষের জবানের নড়চড় হয় না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।'

কিন্তু এ কেমন প্রেম? কি রূপ তার? কি বা এ কথার অর্থ?

প্রেম সমদর্শী। সেখানে তো নারী-নরের ভেদ নেই। নেই ছোট-বড়র মাঝে ব্যবধান। সাত ঋষির ঘনীভূত বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ। তাই তো অমন উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করতে পেরেছেন মার্গারেটকে। তার অন্তর দৃষ্টির রশ্মি-শলায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে ভোগলিপ্সু জগতের একটি নিরাসক্ত মনের স্বর্গ। মার্গারেট চলেছে নিত্য নতুনের অভিসারে পূর্ণতার পরিতৃপ্তি কুড়াতে। দোষ কি তাকে ভালোবাসতে? তার নারী মনের সমস্ত কামনা-বাসনা অঞ্জলি দেয়ার অপেক্ষায় দিন গুণছে।

প্রেম কি?

বাহ্যিক জগতে প্রেমের যে রূপ আমাদের চোখে এসে ধরা দেয় তা কি সত্যিকারের প্রেম?

ভালোবাসা। ভালোলাগা। দু'টি জীবনের মিলনে ভোগের স্বপ্নে মগ্ন হওয়া—এতো আর প্রেম নয়। এর মাঝে মোহ রয়েছে। বাসনার আগুন জ্বলছে। কামনার সমুদ্র-গর্জন ধ্বনিত হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের দারুণ প্রভঞ্জন অলক্ষ্যে একটু হেসে হেসে পায়তাড়াও দিচ্ছে।

কিন্তু যে প্রেম যুক্ত হয়েও মুক্ত, পূর্ণ হয়েও রিক্ত—সেখানে ঝরে স্বর্গের আশীর্বাদ। দেবতার প্রসন্ন দৃষ্টি। কথায় কথায় যে শব্দটি অতি সহজ হয়ে গিয়েছে, আমাদের উপেক্ষা অবহেলা এবং হাসির অপেক্ষায় পড়ে ধুকছে—সে অত সহজবোধ্য কথা নয়। প্রেম। ভালবাসা। আকুলতা ও কান্না—এ দিয়ে বাঙলার ভক্ত সাধকেরা দেবতাকে করেছে প্রিয়, প্রিয়কে করেছে দেবতা। জীবনের যৌবনে যে বাসনার বিশাল ঢেউ একদা তাদের ঘর থেকে বিতাড়িত করেছিল পথে—সে নৈর্ব্যক্তিক মন মগ্ন হয়ে গেল শেষে রাজচক্রবর্তীর দ্বারে। যুগের পর যুগ কেটে গেল। ঘর হাতছানি দিল। মায়ের আঁখিধারে বক্ষ সিক্ত হ'ল। প্রিয়া কাঁদল উচ্চকণ্ঠে। কিন্তু তবুও ভাঙল না তাদের অনন্ত মগ্নতা। অচ্ছেদ্য একতা। মার্গারেট তো আসছে সেই পুণ্য-ধন্য পীঠস্থানে। আসছে সেই ত্যাগ তিতিক্ষার তপোদীপ্ত তাপসের আহ্বানে।

প্রেম ভালো। কিন্তু প্রমাবিহীন প্রেম নয়। বিবেক-বিজ্ঞানের পাতাগুলি উল্টে যেতে হবে সযত্নে। সাধারণ থেকে চলে আসতে হবে অসাধারণে। প্রেমের মাঝে যে সৃষ্টির শক্তি নিহিত রয়েছে তাকে নিয়োজিত করতে হবে নীরাজনের প্রস্তুতিতে। শ্রদ্ধা-ভক্তি আর নিষ্কাম আসক্তি—এ দুইকে সম্বল করে জ্ঞান-নয়নকে রাখতে হবে প্রহরী। তারপরে অপরিমিত প্রেম। অনন্ত ভালোবাসার মাঝে আত্ম সমাহিত ভাব।

"ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু—
রুদ্রবহ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক; হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো, পুষ্পধনু—
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥"

যা মরণীয় তা নয়ে স্মৃতির বোঝা ভার করে কি লাভ? অতীত মধুর হ'লে রমণীয়। কিন্তু অতীত যদি বেদনার বিশুষ্ক মরুতে জ্বালার দহন জেলে দেয়—তবে তাকে যতো পারো দূরে রেখো।

মার্গারেট আর তাকাবে না পেছন ফিরে। সে জীবনের কণ্টক-শয্যায় বড় জ্বালা। বড় বেদনা। সেখানে কান্না বৈ আর কিছু নেই। সেখানে মনোভঙ্গ বৈ মনোসমৃদ্ধি নেই। পেছনে গেলে শূন্য মন্দির শূন্যই রয়ে যাবে। পূর্ণতার তৃপ্তি আর মিলবে না।

ব্যক্তি অনিত্য। কিন্তু বক্তব্য নিত্যের। মানুষ মরণশীল, তা বলে প্রেম মরণীয় নয়। সে জীবন্ত। শাশ্বত। তার রূপ ভাগবতী।

নর ভালোবাসে নারীকে। ললাটে করে আশিস্ চুম্বন। উদ্দীপ্ত যৌবনের বন্ধন-হীন চাঞ্চল্যে মিলনের স্বপ্ন দেখে। ভোগের বাসরে পুষ্প ছড়ায়। কাছে ডাকে। নির্মাণ করে নৈকট্যের মন্দির।

এই যে আবেগ আকুলতা ও আর্তি, এ দিয়ে তরী ভরে যদি একবার উজান পথে চলা যায়—তবেই লাভ করা যায় প্রিয়কে—সে মনে দেবতার আসন বিছানও চলে। যে প্রেম কামগন্ধহীন হয়ে শুধু চায় একটু দর্শন, একটু মিলনের সুখ-স্পর্শ, সে প্রেমের কণ্টকে প্রেমময়ের অন্তরকেও ক্ষত-বিক্ষত করা চলে। তাঁকেও কাঁদাতে পারা যায়।

মার্গারেট যে এই শিক্ষাই পেয়েছে স্বামিজীর কাছ থেকে। উদ্বুদ্ধ হয়েছে এই আদর্শে।

জীবনের যত বাণী বেদনার গান
সব যদি দিতে পারো মান অভিমান,
তবে শান্তি কান্তির প্রবাহ—
আজ শুধু একবার সেই গান গাহ।
যাহা ক্ষুদ্র, খণ্ড-ভগ্ন যাহা
সীমিত গণ্ডির গর্ভে লীন হোক তাহা;
তুমি নিত্য, বিবেক-বিজ্ঞানী—
প্রজ্ঞার প্রদীপ জ্বালো ধ্যানের প্রশান্তি মনে আনি।
হে তমঘ্নো, ভেঙ্গে ফেল দুঃখের নির্মোক
তব জয়—জয় তব হোক।

আর এতটুকুও দ্বিধা নেই মার্গারেটের মনে। সে পারবে প্রেমের পারাবারে পঙ্কজ-

প্রভা বিকিরিত করতে। মায়ের কাছে ছুটে গেল ত্রস্ত পদ-সঞ্চারে। বলল—'আমি ভারতবর্ষে যাব। আমাকে যেতে দাও।'

সহসা মায়ের মনের আর্শীতে অভাষিত হ'ল মেয়ের শৈশব। সেই ভারত থেকে ফিরে-আসা যোগীর যোগসিদ্ধ বাণীটি যেন মূর্ত হয়ে উঠল তার অন্তরে। বলেছিলেন তিনি, বলেছিলেন মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে—তোমার ঠাঁই ভারতবর্ষে। আমাকে যেমন করে একদিন ডাক দিয়েছিল—তোমাকেও তেমনি একদিন ডাকবে।

আজ সে মধুক্ষণের শুভাগমন হয়েছে। হাতছানি দিচ্ছে ভারত তীর্থ। আর নীড়ের মায়া নেই। আসক্তির ছায়া নেই। আছে শুধু শবরীর প্রতীক্ষা। তাকে যে গ্রহণ করতেই হবে স্বামিজীকে। মাও এজন্য প্রস্তুত ছিলেন। দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন তিনি—

আশীর্বাদ করলেন মার্গারেটকে। বললেন করুণ-কাতর কণ্ঠে—'প্রভু, তুমি যদি এই চাও, তবে তাই হোক। তোমার পায়েই সঁপে দিলেম মেয়েকে।'

ভাই-বোন, মা একদিকে দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে ওর বান্ধবীরা। ধীরে ধীরে জাহাজ নোংগর তুলল। ওদের চোখ ফেটে এলো কান্না। নীরব আঁখিপাতে প্রত্যক্ষ করতে লাগল তারা—

প্রত্যক্ষ করতে লাগল মার্গারেটের প্রশান্ত-গম্ভীর মুখখানা। এতটুকু বিষাদ নেই। এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। এ যেন শীতের সমুদ্রে একটি সবিতার প্রতিবিম্ব।

জাহাজ পাড়ি উজিয়ে দিল নীল জলের নিঃসীমে। পাড়ি উজিয়ে দিল ভোগের সাম্রাজ্য থেকে ত্যাগের গৈরিক-তীর্থে।

তীর্থে এসেছে মার্গারেট—

এসেছে ভারতবর্ষে। শ্যামলিম বনানী। কল্লোলিনী গঙ্গা। প্রশান্ত সমীরণ। প্রস্নিগ্ধ জ্যোছনা। এ যেন স্বপ্নে তৈরী দেশ। স্মৃতির একখানা স্বর্গ।

এখানকার মানুষেরা হৃদয়ের কারবারী। ভোগ বিলাসে এদের চোখে ঝরে দুঃখের অশ্রু। নৃত্য করে ত্যাগের আনন্দে। দান করে পায় তৃপ্তি। ধ্যান করে লাভ করে প্রজ্ঞা। বীর্যের বলে অর্জন করে শক্তি। অস্ত্রধারীকে দেয় ধিক্কার। বলে দুর্বল। করে ঘৃণা। অবাক লাগে মার্গারেটের। স্তব্ধ হয়ে যায় বিস্ময়ে। তাকিয়ে থাকে অপলক আঁখিপাতে।

দেখ, চেয়ে দেখ—কানন কুন্তলা বন। তার কোলে কত পাখী। কি অপূর্ব তাদেরকণ্ঠ। সুরের লহরে কেবল শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন।

ঐ যে নদী—চলেছে কুলু কুলু করে। কি কথা কইছে? আমায় নীরব করে দাও। অবসান হোক এ কান্নার। মিলনের সুখস্পর্শে লীন হয়ে যেতে দাও তোমার অতল গহনে। আমার আমিত্ব রেখো না। তুমিময় হতে দাও।

কাকে বলছে?

বলছে সাগরকে। বলছে, আমার সারা জীবন জুড়ে রয়েছ তুমি। তবু আমি তোমার বুকে গোত্রহীন হয়ে থাকব বলে কাঁদি। তুমি কি সাড়া দেবে না?

দেখ, আরো দেখ—গাছে গাছে কত ফুল। কি মনোরম তাদের শোভা। কি মনহরণ গন্ধ। কিন্তু তাকিয়ে আছে সেই স্বয়মাগত সুন্দরের দিকে। তার জীবনের সার্থকতা হলো নিবেদনে। নিজের জীবন উৎসর্গ করেই পুষ্পের তৃপ্তি। শুধু দিয়ে যায়। নেয় না কিছুই।

আনন্দে ভরে যায় মার্গারেটের মন। প্রাণের পরিধিটা যেন আরো অনেক দূর অবধি বিস্তৃত হয়ে যেতে চায়। সুন্দরের নন্দন নিকেতনে একখানা মরকত শয্যায় এলিয়ে দিতে চায় দেহ। প্রাণ ভরে যায় একটা অজানিত মধুর স্পর্শে।

সহসা চমকে ওঠে মার্গারেট। গাড়ির গতি মন্থর হয়। ফিরে তাকায় পিছু পানে। শুনতে পায় স্বামিজীর জলদমন্দ্রিত কণ্ঠ। শুধান স্বামিজী, 'কেমন আছে লণ্ডনের বন্ধুরা মার্গারেট? তোমার মা ভালো আছেন তো?—

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল গা —

চলল গন্তব্যস্থানের দিকে।

পার্ক ষ্ট্রীট। থাকেন সেখানে মিশনের কয়েকজন সতীর্থ। সেখানে এসে উঠল মার্গারেট। বসল। ক্ষণ বিরতি। বললেন এক সময় স্বামিজী, 'কাউকে পাঠিয়ে দেব গিয়ে তোমায় বাংলা শেখাতে।'

একফালি কাঁচা রোদ্দুরের মত মার্গারেটের অধর যুগলে চুমু দিয়ে যায় একটু তৃপ্তির হাসি।

আর বিলম্ব নয়। এবার কর্মের সমুদ্র-সৈকতে এসে দাঁড়াবে মার্গারেট। দেখবে। শিখবে। তারপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে অন্তহীন অনন্ত-সমুদ্রে। সেখানে ভালো আছে। মন্দ আছে। আলো আছে আবার আছে অন্ধকারও। সেই অন্তহীন আঁধার সায়রে মার্গারেট জ্বালিয়ে দেবে আলোর দীপাবলী। একি কম আনন্দের? মার্গারেট উৎফুল্ল চিত্তে বের করল তার ডায়রী বই। লিপিবদ্ধ করল সে—

লিপিবদ্ধ করল নবজীবনের মোহন মুহূর্তটি—'২৮শে জানুয়ারী, ১৮৯৮। আমি বিজয়িনী, শেষ পর্যন্ত ভারতে এসেছি।'

সন্ধ্যার অন্ধকার নামল। আকাশে ঝিকমিক করছে তাহার তপোস্নিগ্ধ আঁখি। চাঁদ হাসছে। ছেঁড়া ছেঁড়া খণ্ডমেঘের পাল উড়ে যাচ্ছে। মেদুর মেঘের মাদকতায় মার্গারেট তন্ময়ের মত তাকিয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের আর্শীতে আভাসিত হয় দেশের কথা। দশের কথা। ঘুম নামে। চোখের পাতা বুজে আসে। ঘুমিয়ে পড়ে মার্গারেট। এ যেন প্রশান্ত সাগর-বেলার একটি শুচির শতদল।

একটা দিন কেটে গেল। প্রত্যাসন্ন প্রভাত। আকাশের দিগন্তে পড়েনি এখনো অরুণিমার আলো। উষার হাসি ফুটল। ডাকল পাখি। কর্মব্যস্ত মানুষেরা দু'-একজন সবে বেরিয়েছে পথে।

ঘুম ভেঙে গেছে মার্গারেটের। তাকিয়ে আছে; দেখছে, শুচিবাস পরে যেন ধরণী হয়েছে লগ্না। এখনই হবে যাত্রার সূচনা।

ধীরে ধীরে ক্ষীণ অন্ধকারও অপসৃত হলো। মার্গারেট তৈরী হয়ে নিল। বলে গেছেন স্বামিজী পাঠিয়ে দেবেন লোক বাংলা শেখাতে। মার্গারেটের মনের মাঝে থেকে থেকে সেই অনাগত মুহূর্তটি আর সেই অদৃশ্য মানুষটির আগমন আর্তি গুমরে গুমরে উঠছে। পথ চাইছে সে—পথ চাইছে আকুল হয়ে।

এ মাটির এমন গুণ, এ হাওয়ার এমন টান যার স্পর্শে স্থিত হয় মন। খুলে যায় প্রজ্ঞার চোখ। দূর আসে নিকটে। দুর্লভ হয় সুলভ। এখানে মনের মাধুরী আর কান্নার অশ্রু পেলে দেব দেবী আনন্দে আভাসিত হন। তার পরে তো মানুষ। এক সময় সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন।

মার্গারেট ঠিক যেন একটি শিশুর মত তাকায়—
তাকায় সন্ন্যাসীর তনু-কান্তির দিকে।
বাঙলা শেখাতে এসেছেন সন্ন্যাসী।

বসলেন। অবনমিত আঁখি। দুখানা বই রাখলেন টেবিলের 'পর। বললেন মার্গারেটকে উদ্দেশ্য করে—'যত শিগ্‌গির সম্ভব এ দুটি অনুবাদ করতে হবে ইংরেজীতে।'

বই দুখানায় লিপিবদ্ধ রয়েছে ঠাকুরের কথা। মার্গারেট একবার তাকালেন। বললেন আড়ষ্ট কণ্ঠে 'কোন্ ঠাকুর ?—'

জবাব দেন সন্ন্যাসী, 'আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।'

একটা সত্যসন্ধানের দীপ যেন জ্বলে উঠল মার্গারেটের অন্তরে। লজ্জারক্ত মুখখানা সহসা ভাস্বর হয়ে উঠল। জানাল সম্মতি। অন্তরের অনন্ত প্রণতি জানাল অন্তরতমের উদ্দেশ্যে। প্রার্থনা করল সাফল্যের।

হে জীবননাথ, আমার হৃদয়ের রিক্ত মরুতে এনে দাও তোমার আনন্দ লোকের আশ্বাস। প্রাণের পুলিনে এসে লাগুক ভাব-গঙ্গার ঢেউ। সত্যের দীপাবলী প্রজ্বলন্ত হোক। আমার কর্ম-জমিনে সোনার ফসল যেন ফলে। লোক কল্যাণে নিবেদন করতে দাও জীবন। আমার অন্তরের সকল কামনা বাসনা নিয়োজিত হোক তোমার প্রীতি ও প্রার্থনায়।

এক একটা দিন যায়। রাত্রি আসে নেমে। মার্গারেট শুয়ে শুয়ে কর্মের হিসেব মিলায়। নির্ধারিত করে আগামী দিনের কর্মসূচী।

কাজ তেমন পায়নি সে। কিন্তু তবুও তার বিশ্রাম নেই। মনের মোহন বেণু দিয়েছে তাকে পাগল করে। সে যেন আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে। এমনি দিনে ম্যাকলয়েডের আমন্ত্রণে পার্ক ষ্ট্রীট থেকে সে চলে এলো—

চলে এলো বেলুড়ে।

স্বামিজীর দুই অন্তরঙ্গ মিসেস্ বুল ও ম্যাকলয়েড এসেছে বেলুড়ে। সঙ্গে এসে যোগ দিল মার্গারেটও। বেশ লাগে এখানে। গঙ্গার অবারিত বিস্তার। ওপারে দেখা যায় কারখানার চিমনি। জাহাজের মাস্তুল। আর ছোট ছোট ডিঙি নৌকার মাঝিদের তরঙ্গ-সঙ্কুল গঙ্গাবক্ষে নৌকা নিয়ে পারাপারে যাওয়া আসা। আহা, এমন মধুর দৃশ্য মার্গারেটকে মুগ্ধ করে দেয়। চোখের পাতা স্থির হয়ে যায়। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ বিদেশ-ব্রহ্মচারিণী অবাক হয়ে দেখে। আর মনে ভাবে এ কোন্ দেশ!

আটচল্লিশ বছরের মেয়ে।

মেয়ে নয়তো যেন অনিন্দ্য সুন্দরী। রূপ যেন উছলে পড়ে। স্বভাবটিও মিষ্টি। তার মাঝেই ধীর, স্থির, প্রশান্ত। কিন্তু ব্যক্তিত্বে অটল। গম্ভীর।

নাম কি ?

নাম হলো বুল। অর্থ আছে প্রচুর। তেমনি প্রাণ। মমতায় মধুর। সমতায় শান্ত। প্রেমে প্রসন্ন। প্রীতিতে পূর্ণ। যে দেখে তারই লাগে ভালো, শুধু ভালো লাগা নয়—ভালোবাসেও। তাইতো বান্ধবীরা খুশিভরে নাম রেখেছে 'ধীরা মাতা।'

মার্গারেট পরিচিত হলো 'ধীরা মাতার' সঙ্গে। বড় ভালো লাগে—

ভালো লাগে বুলের প্রতিটি কর্ম। প্রতিটি কথা। মার্গারেট এগিয়ে গেল তার কাছে। আলাপ করল। হলো মুগ্ধ। দোসর পেল সে। দোসর পেল একক জীবনের।

বিদেশী মেয়ে। কিন্তু স্বদেশের তুলনায়ও যেন ভারত তাদের অধিক প্রিয়।

তাতো হবেই।

কেন ?

হৃদয় পায় যেখানে অবারিত পথ। প্রাণ যেখানে মলয়ের মত মুক্ত। সেখানে শুক্তি কিসের ? কিসের বিঘ্ন মিলনের মন্দির নির্মাণ করতে ? ভারতবর্ষের আত্মার আকাশে লেখা ত্যাগের মন্ত্র। সে যে ঘরকে পর করে পরকে করেছে আপন। তার স্নেহ কোমল প্রচ্ছায়ে কার মন না গলবে ?

ওদের পানে তাকিয়ে স্বামিজীর মনটাও যায় ভরে। আনন্দে আয়ত আঁখি বেয়ে নামে জলের ধারা। উজাড় করে দেন অন্তরের ঐশ্বর্য। প্রাণের প্রসুপ্তি ভেঙ্গে চেতনার উদ্বোধন হয়। মুখর স্বামিজীর পানে তাকিয়ে থাকে—

তাকিয়ে থাকে তাঁর শিষ্যারা।

অধীর আগ্রহ। অশ্রান্ত অধ্যবসায়। নীরব হয়ে কেবল শুনছে—

শুনছে স্বামিজীর মরমী মনের বাণী। মানুষই সাধনার বলে ঈশ্বরায়িত হয়ে যায়। সাধনা বলতে নির্জনে বসে ধ্যান জপ নয়। দুঃখের দুয়ারে দাঁড়িয়ে অপসৃত করতে হবে বেদনার নির্মোক। আত্ম-প্রকাশ করতে হবে তমোঘ্নের মত।

তার পথ কি ?

সেবা। সেবা কর মানুষের। নারায়ণ জ্ঞানে নরের নয়ন-নীর মুছে দাও। সেবার মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবনের চরম সার্থকতা। বেদান্তের সত্য প্রতিষ্ঠিত কর। প্রতিষ্ঠিত কর সেবাধর্মের পবিত্রতম কর্মে। তবেই খুলে যাবে হৃদয়ের বাসরঘর। প্রতিভাসিত হবেন নরলোকে নারায়ণ। আনন্দের আপ্লবে আত্মার আকাশে আভাসিত হবেন জীবন-দেবতা। সে প্রকাশ বড় মধুর। বড় রমণীয়।

'মানুষের সেবা পূজাই একমাত্র উপাসনা, যার দ্বারা সাধক সাধনা ও সাধ্যবস্তুর সাযুজ্য ঘটে। ...খাঁটি দেশ প্রেমিকের নিষ্ঠা থাকা চাই আমাদের। এই হাজার হাজার জীবন মরছে না খেয়ে, আচ্ছন্ন হয়ে আছে অজ্ঞানে, এ দেখে কি হৃদয় কেঁপে ওঠে না ? প্রত্যেককে বুঝতে দাও যে, সে ছোট নয়, সে ব্রহ্ম স্বরূপ। ...তাদের ডেকে বল, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, ঝাঁপ দাও কাজে।'

কর্মের ফেনিল তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়। ঘোষণা কর মানবাত্মার জয়গান। রিক্তের বেদনা বিদূরিত কর। জ্বেলে দাও আশার দীপাবলী। মানুষের আত্ম নিগ্রহের মাঝে আত্মপ্রকাশ কর মঙ্গল বিধাতার মত। বেদনার সাহারায় সমুদ্রের ঢেউ হয়ে আস। রাত্রির বুকে পূষণের মত প্রদীপ্ত হয়ে ওঠো। জনজীবনের জয় ঘোষণা করে বল—

মানুষ ফানুস নয় রং-শাড়ি মেঘেদের মত।
সোনালী ডানায় ঢাকা গোধূলির মত ঝিল্ মিল্।
প্রদোষের সাথে তার জনমের মতই অমিল।
গাঙ্-পারে উড়ে উড়ে ঢেউয়ের ঝাপটে হয় ডানাগুলি ক্ষত ;
তবুও সেখানে যায় পাখীদের মত ? যেতে হয় ঢেলে দিতে প্রাণ তিল তিল।
মানুষ ফানুস নয় রং-শাড়ি মেঘেদের মত।

মুক্ত আকাশ চায়—অবারিত পথ চায়—আলোকের সাথে তার শাশ্বত মিল। লাখো কোটী জীবন যদি বেদনার সাহারায় পড়ে ডুক্‌রে কাঁদে—

কেঁদে কেঁদে যদি এগিয়ে যায় অনাহার ক্লিষ্ট প্রাণগুলি মৃত্যুর দিকে—তবে ধর্মের কথা রেখে দিয়ে বাঁচবার মন্ত্র উচ্চারণ কর। শোনাও জীবনের বাণী। বিকাশ ঘটুক মানুষের। বিকিরিত হোক যৌবনের মাধুর্য। বিদূরিত হয়ে যাক বোবা রাত্রির কান্না। ধর্ম মানুষের। ধর্ম আকাশের নয়। ঈশ্বর পৃথিবীর। তিনি অদৃশ্য জগতের কল্পবস্তু নন। মানুষই সাধনার বলে রূপান্তরিত হয় ঈশ্বরে।

জগতের সুখ দুঃখের মাঝেই রচিত হয় তাঁর শান্তি তীর্থ। যদি তাই হয়—তবে

যে ধর্ম জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন তা নিয়ে কি হবে? নর তীর্থের মঙ্গলকর্মে যা হবে না নিয়োজিত, তা নিয়ে কেমন করে হাজির করা চলে মানুষের সভাতে? মাটি ও আকাশ, সমীর ও সুধা, চাই দুটোই। ধর্মের মর্ম দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে নিষ্ঠার মন্দির। যারা আজও পদে পদে বঞ্চিত হচ্ছে। যাদের পাশে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলবার নেই কেউ। তারা কি চিরদিন অবজ্ঞার অন্ধকারে পড়ে ধুকে ধুকে জীবনের আয়ুর ঋণ পরিশোধ করবে?

না।

তবে?

বুকের রক্ত ঢেলে দূর করতে হবে রিক্তের কান্না। বলতে হবে তাদের ডেকে—বলতে হবে কবির ভাষায়—

“মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনই জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে।
যখনই দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ যার, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে॥”

অগ্নিরেখ আকাশের মত উদ্দীপ্ত হোক মনের দিগন্ত। মানুষের বেদনায় ব্যথিত হোক চিত্ত। নিঃস্বার্থ মনটাকে ফেলে রাখ মানুষের সেবার মধ্যে। ‘বেদ কোরাণ পুরাণ শাস্ত্র-টাস্ত্র এখন রেখে দে কিছুদিন। মানুষ হচ্ছে জ্যান্ত ঠাকুর, প্রেম আর সেবা দিয়ে তার পূজা চালা। ভেদ বুদ্ধিই হল বন্ধন আর অভেদ জ্ঞানেই মুক্তি। আমাদের কাজে সকল ধর্মের ছেলেদেরই আমরা নেব, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বা সে যা-ই হোক।’

সেবাধর্মের মহামন্ত্রে উদ্দীপ্ত করলেন স্বামিজী তাঁর শিষ্যাদের।

ওরা পলকহীন নয়নে শুনতে লাগল ভারত আত্মার মর্মবাণী। নব নব আশার সঞ্চার হয়। নতুন আলোর ঝলকে মনের মালিন্য মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। আত্মার আকাশে স্বর্ণ আখরের মত উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে সন্ন্যাসীর কথাগুলি। জীবনের নব রূপায়ন ঘটে। কর্ম সমুদ্রের পারে এসে দাঁড়ায় ওরা, দাঁড়ায় লাখকোটী মানুষের সেবার সংকল্প নিয়ে।

আজও মনে পড়ে সেসব দিনগুলির কথা। সংস্কারের প্রবল ঝড়ে বিধ্বস্ত জীবন। সত্য ছেড়ে মিথ্যা নিয়ে মাতামাতি। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ। জন-জীবনের বুকজোড়া বেদনার ক্রন্দন। তার মাঝে স্বামিজী যখন এসে দাঁড়ালেন উদ্ধত বজ্রের মত তখন তাঁকেও কম আত্মনিগ্রহ সইতে হয়নি। কিন্তু মানুষের নিন্দাকে তিনি করলেন অবহেলা।

সত্যাশ্রয়ীবীর এগিয়ে চললেন—

এগিয়ে চললেন হিমাদ্রির মত উন্নত শিরে।

দুর্বলের মত ভগ্নমন হলেন না তিনি। পূর্ব পশ্চিমের সেতু বন্ধনে ফেনিল সমুদ্রের পারে এসে দাঁড়ালেন। অজস্র তুফান এলো। বুক পেতে প্রতিহত করলেন তা। ঝড় জাগল। তবুও দুর্যোগ দেখে চলার পথের আলো নিভিয়ে বিশ্রামের বৈঠকখানায় অপেক্ষা করলেন না তিনি। যা অনিবার্য। যা অতিক্রম করতেই হবে তা থেকে দূরে সরে না গিয়ে তড়িৎ বেগে এগিয়ে এলেন—

এগিয়ে এলেন 'সাইক্লোনিক হিন্দু যোগী'।

মনে পড়ে। আরো অনেক স্মৃতি উঁকি মেরে যায়। বিস্মৃত জীবনের সোনায় মোড়া স্বপ্নের কাহিনী প্রজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আয়ত দীপ্ত আঁখিদুটো বড় হয়ে যায়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন স্বামিজী, দেখেন অতীত দিনের অনন্ত উপলব্ধির আকাশ-খানা। সেখানে আজও সমাসীন রয়েছেন তাঁর জীবন-দেবতা। যার প্রভাবে বিদূরিত হয়েছিল তাঁর অন্তরের সংশয়। জবাব পেয়েছিলেন জীবন জিজ্ঞাসার। তিনি যে এখনও জাগ্রত। জীবন্ত। একবার যেন মনটা ফিরে যেতে চায় পেছনের দিকে। বড় মধুর ছিল সে দিনগুলি।

প্রবল তন্ময়তা। তিতিক্ষিত অন্তর। ঘরের মায়া নেই। আসক্তির কায়া নেই। কেবল প্রাপ্তির আকুলতা। অসীমের আরাধনা।

হে সুন্দর, জীবনের মধুবাসরে এসো। খুলে দাও আমার সুপ্তির চোখ। তোমাকে জানতে দাও। দাও বুঝতে। চাইনা সংসার। চাইনা ঐশ্বর্য। কেবল থাকতে দাও ধ্যান চোখে বসে। তন্ময় হয়ে যাই যেন শুকদেবের মত। দাও আমাকে নির্বিকল্প সমাধি। জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য। এই তিন গুণে আমাকে গুণী কর। আমায় ছুটী দাও জগতের কল-কোলাহল থেকে। আমি প্রাণের বীণায় তোমার নাম গানে মুখর করে দেই আমার সমস্ত সত্তাকে।

স্বামিজীর এ নৈরাশ্যবাদকে আঘাত করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। টেনে নিয়ে এলেন বিশ্বসভার 'দরবারে। বললেন, 'নিজের জন্য সমাধি সুখলাভ, সেওত নিছক

ব্যক্তিগত কথা। বিপুল বিশ্বে নিরবধি কাল-প্রবাহের সঙ্গে তার যোগাযোগ কোথায়?……

তুই হবি বিরাট বটবৃক্ষের মত, শত সহস্র যোজন বিস্তৃত হবে তোর শাখা-প্রশাখা!

সংসারে যারা দুঃখ পীড়িত দুর্বল, ব্যথিত আর্ত যারা তারা এসে তোর জীবন-মহীরুহে স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় পাবে, শান্তি পাবে, আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার শক্তি লাভ করবে। সর্বতোভাবে উৎসর্গীকৃত হবে তোর জীবন। তোর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সংস্পর্শে এসে সংশয় পীড়িত নর-নারী সাহস সঞ্চয় করবে, বল লাভ করবে।'

সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি চনমন হয়ে ওঠে। একটা জন্মান্তর ঘটে গেল।

বিশ্বনাথ নন্দন নরেন্দ্রনাথ এসে দাঁড়াল শতাব্দীর প্রদোষ লগ্নে।

দাঁড়াল এসে অতন্দ্রিত প্রহরীর মত হাতে লয়ে দীপশিখা। ঘোষণা করল অগ্নিবর্ষী কণ্ঠে, 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় কর্ম করিব—'

বিংশ শতাব্দীর সংশয় পীড়িত মানুষ হয়ত শ্রীরামকৃষ্ণের এই উদ্বোধনী বাণীকে নিছক একটা আধ্যাত্মিক রং দিয়ে আত্মিক মুক্তির দিকটির কথাই বলবেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাহলে ঠাকুরের প্রতি সু-বিচার করা হবে না। কারণ তিনি এ কথাও অকুণ্ঠ চিত্তে ঘোষণা করেছেন—'মোটা ভাত মোটা কাপড় না হলে ধর্ম হয় না।'

মোটাভাত মোটা কাপড়ই হলো আর্ত পীড়িত নিরন্ন মানুষের বাঁচবার একমাত্র সম্বল। এবং তা অর্জন করতে হয় জীবনের দাম দিয়ে। আজ দিকে দিকে বিশ্বের প্রতিটি দেশে দেশে এই মোটা ভাত মোটা কাপড়েরই সংগ্রাম চলেছে। জীবন প্রতিষ্ঠার অঙ্গনে তারা মুক্ত মনে মাথা তুলে বাঁচতে চাইছে। চাইছে কষ্টে ক্লিষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে এক মুঠি অন্ন সংগ্রহ করে। কিন্তু তাও যেন হয়ে উঠছে না। পথে প্রান্তরে অজস্র নিরন্ন মানুষের কঙ্কাল আজও অন্তরকে মথিত করে দেয়। আগুন জ্বালিয়ে দেয় হৃদয়ের মরু-দিগন্তে। চোখ ফেটে কান্না আসে। দলে দলে জনতা বাঁচার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে যায় মৃত্যু যজ্ঞের মুখে। তবুও তারা দমে না। শত সহস্র জীবন বলি হয়ে গেল। রক্ত ঝরল বুকের। কণ্টক বিদ্ধ হল পা। রেখে গেল তারা অন্তিম আকুতি পৃথিবীর আগামী মানুষদের জন্য।

এই হানাদারী বিশ্বের বিজনে বসে ধ্যান নয়—চাই কর্মের ময়দানে উল্কার মত আত্ম-প্রকাশ। এবং শ্রীরামকৃষ্ণও সেই বলিষ্ঠ আত্ম প্রত্যয়ের কথাই বলেছেন।

বলেছেন প্রথমে জাগতিক মুক্তির কথা। তার পরে আত্মিক মুক্তি। আত্ম সাক্ষাতের আকুলতা। এবং আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন দর্শনের জীবন্ত রূপটি দেখতে পেলাম বিবেকানন্দের মধ্যে।

বললেন স্বামিজী, 'সবল বা দুর্বল, ব্রাহ্মণ কি পারিয়া ব্রহ্মোপসনা করতে পারে সবাই, সে অধিকার আছে সকলের।'

ধর্ম হলো অন্তরের সম্পদ। সেখানে জাত্যাভিমানের ঠাঁই নেই। ঠাঁই নেই সংস্কার, সন্দেহ, ভেদ ও বিভেদের। অনুভূতি আর উপলব্ধি। এর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে ভক্তির অশ্রু অর্ঘ্য। তবেই বিকিরিত হবে তৎপুরুষের তনুভাতি। এখানে ছোট বলে কাউকে অবজ্ঞা করবার অধিকার নেই।

ভারতবর্ষের মাটি ও মানুষ আত্মসত্তার 'পর নির্ভর না করতে পারলে মুক্তি নেই। কর্ম ত না হলে বন্ধন হয়ে বন্দী করে রাখবে তাকে সংশয় সন্দেহের কারাগারে। এ সত্য স্বামিজী শিখেছেন তাঁর দেবোপম গুরুর কাছে। শিষ্যাদেরও তিনি তাই শেখাচ্ছেন, 'দীন দরিদ্রের অন্তরের সম্পদকে গ্রহণ করবার মত প্রশস্ত কর হৃদয়কে। তোমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেখলে তারা যেন মনে করে, দেবতা ঘরে এসেছেন। ক্ষুধায় জর্জর দীনহীন কাঙাল ওরা, বঞ্চিত মানুষের অধিকার থেকে।

কিন্তু ওরাই এনে দেবে পরমার্থকে তোমাদের করমুঠিতে, কেননা তোমাদের মাঝেই তাদের পূজার ঠাকুরকে তারা দেখতে পাবে! এর বিনিময় তোমরা দেবে কি তাদের?'

হৃদয়কে কর দেব-বাসর। ঝাঁপ দাও ফেনায়িত কর্ম সমুদ্রে। ডেকে তোল স্তিমিত মানুষের দমিত সত্তাকে। তার পরে যাত্রা কর—

যাত্রা কর রাত্রির রিক্ততাকে সিক্ত করে দিতে আলোর আপ্লবে।

অবাক বিস্ময় শিষ্যাদের চোখে মুখে। ওরা শোনে স্বামিজীর মর্মস্পর্শী বাণী। হৃদয়ের অঙ্গনে অঙ্কুরিত হয় নব নব চিন্তা। প্রাণ কেঁদে ওঠে ব্যথিতের বেদনায়। ম্লান মুখে অশ্রুসজল চোখে ওরা থাকে তাকিয়ে, তাকিয়ে থাকে স্বামিজীর বেদনা ক্লিষ্ট মুখের পানে। আড়ষ্ট কণ্ঠে শুধায় ম্যাকলয়েড, 'স্বামিজী, কি করে আপনার সবচাইতে বেশী সেবায় লাগব?'

উত্তরে বললেন স্বামিজী, 'ভালোবাস ভারতকে। সেবা কর তার।······পূজা করতে শেখ এ দেশকে।' তবেই মনে করব, তোমরা যা দিলে তা অতুলনীয়। দরিদ্র ভারতবর্ষ তোমাদের সেবা পাক। কৃতার্থ হোক। বিভ্রান্ত যুগের বুকে নেমে আসুক বিশ্রান্তির প্রশান্তি। মানুষ মাথা তুলে বাঁচতে শিখুক। জানুক, এ পৃথিবীর মাটিতে রয়েছে তাদের পরিপূর্ণ অধিকার।

বড় ব্যথা মার্গারেটের মনে।

মাঝে মাঝেই হারিয়ে যায় খেই। প্রশান্ত মনটা হয়ে ওঠে উদ্বেল। তাকিয়ে থাকে অন্তহীন অনন্তের দিগন্তে।

রাতের ধারা নামে। অঝোর ধারা। মার্গারেট বসে বসে কাটিয়ে দেয় সারাটা রাত। করুণ নয়নে নামে জলের ধারা। হারা হয়ে যায় সে। চিত্তের চত্তরে ক্ষণকাল দাঁড়াবার জন্যে খোঁজে পথ। প্রত্যক্ষ করে রাত্রির নির্ঝর। দেখে আকাশের তারা। দীপ্তি তাদের দিগন্ত বিসারী। তারই মাঝে চন্দ্রের মমতা মধুর স্নেহ। হু হু করে মন তার ধেয়ে চলে। এই নিঃসীম গগন পানে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভাবে—কবে আমার লগন হবে। কোন সুদূরে পড়ে রইল আমার সাফল্যের প্রস্নিগ্ধ রাত। বাসর জাগি। একাকী কেটে যায় রাত। কই, প্রাণের বঁধু তো আসে না!

এর চেয়ে যদি মার্গারেট বাউল বাতাসের মত ছুটতে পারত উদ্দাম হয়ে, তবুও একটু শান্তি ছিল। ছিল অনেক ভালো যদি সে এই মনোদহনের দিগন্ত থেকে দিশারীর দীক্ষায় পারত মনকে উদ্বুদ্ধ করতে।

কেন, কিসের জন্য মার্গারেট এসেছে ভারতবর্ষে? কি ছিল স্বামিজীর মনের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ? বান্ধবীদের কাছে অনেক দিন সে বলেছে। ভেবেছে একথা নিয়ে বান্ধবীরাও। কিন্তু আজো তার যথার্থ জবাবটি মেলে নি। কেন এত জ্বালা! এত আত্ম পীড়নের দহন!

যে আশায় বুক বেঁধে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল দিগন্তশায়ী সমুদ্রের শীতল শয্যায়, যে আশ্বাস বাণী শুনে উদ্বোধনের মন্ত্র উচ্চারণ করল জীবনের, তার কথা তো একটিও বলেছেন না স্বামিজী! তবে কি সত্যিই এ মন্দির শূন্যই থাকবে? কেউ কি আসবে না এ ফুল বাসরে অভিসারে।

হায়রে মন, তোকে নিয়েই যত জ্বালা। নীরব হয়ে যা। শান্ত চিত্তে বিত্তহীনকে মর্মের অজস্র লিপি পাঠিয়ে দে। ছাখ পাষাণ যদি তবে গলে। আসে যদি আশার আকাশ থেকে আর্তির জবাব।

অজস্র প্রশ্নের শর বর্ষণে বিক্ষত মার্গারেট। এ শর নিক্ষেপের অভিলাসে মাঝে মাঝে হিল্লোল হয়ে ওঠে তার মন। ইচ্ছে হয় স্বামিজীকে প্রশ্ন বাণে জর্জরিত

করতে। এ আত্মনিগ্রহের রাত্রি আর চলবে কত দিন? কোন অনন্ত শায়রে প্রসুপ্ত রয়েছে তার ললাট ফলকের সূর্য? সে অতনু-স্পর্শ না পেলে প্রত্যয় প্রসন্ন হতে চাইছে না মন। ঘন বর্ষার দেয়া গরজনে বুক ফাটল। ভিজল চোখ। কিন্তু এলো না তো সমাধানের শায়ক শান্তি! যা অভ্রান্ত, অখণ্ড, ঠিক এমন একটি স্বীকৃতি চায় মার্গারেট। শুধু তাই নয়—এ জড় জীবনের স্থবিরত্বকে ছুড়ে ফেলে দিতে চায় কর্ম ফেনিলে। ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে অশান্ত হয়ে ওঠে মন। তা যদি মার্গারেট না পারে তবে সে আর বাঁচবে না। ধরে রাখতে পারবে না মনকে দেহ পিঞ্জরের গেহে।

অভিমান আর অভিমান। কিন্তু অনুরাগের এতটুকু কমতি নেই তা বলে। রাগ করে অনুরাগের পথটা আরো পরিষ্কার করে নেয় সে। সঙ্গ ছাড়ে না স্বামিজীর। শূন্য হয়ে ধেয়ে চলে পূর্ণের পানে। সবহারা হয়ে একজনকে আঁকড়ে ধরে মার্গারেট। দুজনার মাঝে এখনো যে ব্যবধান সেই অন্তরালটুকু ঢেকে দেওয়ার জন্য মত্ত হরিণীর মত ধেয়ে যায় সে। দুরন্ত মন অনন্তের পথ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে যায়! শুনতে চায় আশা ও আশ্বাসের বাণী। কিন্তু পাষাণে ফোটে না ফুল। নীরব বিবেকানন্দ। শুধু হেঁটেই চলেছেন তিনি। দেখছেন নিবিষ্ট চিত্তে প্রাকৃতিক শোভা।

পথ। দুধারে কাটা বনের ঝাড়ে। শ্যামলীম বনানী। মলয় অনিলের ঘন নিঃস্বন। তারই কোলে পাখা মেলে ভেসে বেড়ায় পাখী। মাঝে মাঝে গান গেয়ে ওঠে।

মার্গারেটও চমকে ওঠে। ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে যায় মুখ। পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করে তনু। মনে বাজে ব্যথার বেণু। মার্গারেট চাইছে আত্মোপলব্ধির স্থির মহিমা। এ নৈশব্দের মাঝেও ধ্যানচিত্ত জেগে বসতে পারে। কিন্তু কৃপা না হলে যে তাও সম্ভব নয়। এক সময় স্বামিজী কথা বললেন—বললেন মার্গারেটকে—"এ আলো প্রাণ ভরে শুষে নাও, দেখ চোখ মেলে, কি সুন্দর চারিদিক! কোনও পরিকল্পনা নয়, ও তোমার কাজ না।"

প্রকৃতির এই শোভা মধুর মাধুরীর সঙ্গে নিজের অন্তর বিশ্বের মিলন ঘটুক। উপলব্ধির অমৃত প্রস্রবণে ধুয়ে মুছে যাক সঞ্চিত গ্লানির আবিল। কঙ্কর কণ্টকিত দুর্গম বন্ধুর পথকে পরিত্রাণ কর তোমার ভাবনার আকাশ থেকে। দুঃখকে গ্রহণ করতে শেখ বুক পেতে। সুখে হবে না দিশাহারা। তবেই জীবনের যৌবনে দেখতে পাবে সুন্দরের তনু-ভাতি।

সব কথাগুলোই মার্গারেট শুনে যায়। "স্বামিজী কেন কোন কাজের কথা বলছেন না ?" ম্যাকলয়েডের কাছে বড় দুঃখে নালিশ জানায় সে।

এইটাই বড় প্রশ্ন। কেন স্বামিজী কথা বলছেন না। এ কথাটা সবাই ভাবে! ভাবেন বোধ হয় স্বামিজীও। কাজের কথা বলবার আগে আধার তৈরী করে নেয়া দরকার। উত্তরায়ণের যে পথ, সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার পূর্বে দেহ দেউলের দীপ জ্বেলে নিতে হবে যে। ধর্মাচার্যদের তাড়া নেই, কিন্তু আছে আজন্মের আনন্দদানের একটা প্রস্তুতি। কিন্তু সে যে সময় সাপেক্ষ কাজ। বলে বুঝান যাবে না। ওর নিজেকেই নিতে হবে বুঝে। বাইরের দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করলে তা কখনো স্থায়ী হয়না। মনোদীক্ষার আদর্শে হতে হবে সুন্দর। কাজের হিসাব তখন আপনিই বুঝতে পারবে মার্গারেট। প্রতিবাদের রূপ থেকে অরূপের সন্ধানে মন মধুর হয়ে উঠলেই আত্মার বাণী অন্তরে মুখর হয়ে উঠবে। স্বামিজী নীরব। কিন্তু তিনি একথা ঠিকই জানেন, কেমন করে মার্গারেটকে নিতে হবে তৈরী করে। বাইরে থেকে নিষ্ঠুর মনে হলেও তিনি নিষ্ঠুর নন। অন্তরে যে ফল্গুধারার নীরব প্রবাহ বয়ে চলেছে তার সন্ধান লোকে জানে না বলেই উপর থেকে দেখে কেউ কেউ বলবে স্বামিজীকে কঠোর। তা বলে বলুক। আরব্ধ কর্মের ধারায় চলতে হলে কঠোরতাটুকু না হলে নিত্যধামে পৌছান কষ্ট।

মার্গারেট স্বামিজীর কর্মধারার মাঝ থেকে একটা সত্য স্পষ্টই বুঝে নিয়েছে। তা হচ্ছে এই—গত দিনের জীবনকে যেতে হবে ভুলে। কায়িক সংযমের বিধানে বাঁধতে হবে নিজেকে। সংযম, ত্যাগ ও তিতিক্ষা দিয়ে মনকে প্রস্তুত করে নিতে হবে। এদেশের ব্রহ্মচারিণীর মত শয়ন করতে হবে তৃণ শয্যায়। পরতে হবে এক বস্ত্র। হাতে ধরে খাবারটা পুরে দিতে হবে মুখে। শুধু তাই নয়, কামনার প্রসূন ছিড়ে অর্ঘ্য সাজাতে হবে দেবতার উদ্দেশে। বেদনার মধ্য থেকে খুঁজে নিতে হবে আনন্দের সংবাদ। এ বিধি-নিষেধগুলো কেন, এ সত্য যত দিনে না অধিগত হয় মার্গারেটের তত দিনে আত্মার নির্মাণ শক্তির জন্যে এ কঠোরতা একান্ত দরকার। এ তাকে মানতেই হবে।

এমনি করে মার্গারেটের দিনের পর দিন কেটে গেল। এল শুভ মুহূর্ত। এবারে স্বামিজী ওকে কর্মের প্রেরণায় যথার্থ দেশনেত্রী করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। বললেন গুরুভাইদের—"ওর স্বাধীনতায় তোমরা কেউ কোন দিন হাত দিও না।"

উভয়ই যেন উভয়ের পরিপূরক। একজন বিনে আর একজনের চলতে পারে না। কোন কিছু অভাব বোধ হলেই মার্গারেট ছুটে যেত স্বামিজীর কাছে। নিয়ে আসত স্ব-সিদ্ধান্ত। এমনি এক বৃন্তে দুটি প্রসূনের মত নিবেদিতা আর বিবেকানন্দ জীবন প্রবাহের অনাদি স্রোতে ভেসে চললেন। নিষ্কাম প্রেমের পবিত্র স্পর্শে যোগী জনোচিত চিত্তের বিকাশ ঘটতে লাগল। মার্গারেটের জীবনায়ন ঘটল। তবুও পথ চলতে চলতে যখন আসত শ্রান্তি, পড়ত যখন ক্লান্তির কোলে এলিয়ে, তখনই সে স্মরণ করত শ্রীগুরুর স্নিগ্ধ তনু। নিশীথের গাঢ় অন্ধকার এসে যখনই মার্গারেটকে চাইত গ্রাস করতে তখনই সে শুনতে পেত স্বামিজীর জলদ মন্দ্রিক কণ্ঠ—"তাকাও সম্মুখের দিকে। ঐ যে আলো! দেখ কী স্বচ্ছ কী সহজ সব।"

ওর তন্দ্রাচ্ছন্ন মনটা চমকে উঠত। ফিরে পেত সম্বিৎ। আত্মার আর্শিতে আভাসিত হতো স্বামিজীর দিব্য স্নিগ্ধ তনু। মার্গারেট সেই তমিস্রার শুক্তি-লগ্নে শক্তি সাধিকার মত বসত নয়ন মুদে। জড়িমা জড়িত মনটা প্রবৃত্তির সায়র থেকে চলে আসত নিবৃত্তির নিরাসক্ত ধামে।

মার্গারেট নিবিষ্ট ভাবে বসত মনের দোসর হয়ে। সে মুহূর্তগুলো বড়ই মধুময় লাগত। মাঝে মাঝে তা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে বলেই মার্গারেটের বিক্ষিপ্ত চিত্তটা আর যেন পিঞ্জরের পোষ মানতে চায় না। যে প্রাণ একবার শান্তির সজীব স্পর্শে উজ্জীবিত হয়, তা যদি সে ক্ষণেকের মত্ততায় হারিয়েও ফেলে তবুও আজন্মের বিস্মৃতি আসে না। জীবনের এক একটা স্তর আছে। মনটা এই জীবন-যুক্ত স্তরে ওঠা নামা করে। কখনও তার গতি এতটা ক্ষিপ্র ও বেগবান হয় যে, মানুষের চিন্তার বাইরেও মনটা কি যেন খুঁজতে খুঁজতে যায় হারিয়ে। তখন যে কথা উৎসারিত হয় কণ্ঠ থেকে তা কক্ষণও মানুষের সচেতন স্পর্ধার দাবী জানাতে পারে না। সেগুলো হলো তার অন্তর পুরুষের বাণী। বাইরে এসে তা-ই আবার আখ্যায়িত হয় কাব্য বলে। মার্গারেটের সে কবি মনটার কথা যখনই স্মরণে সজাগ হয়, তখনই বড় বেদনা বোধ হয় মনে। ধীরে ধীরে তার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ এসে প্রশ্নের শর বর্ষণে হয় রূপান্তরিত। বিলোল হয়ে ওঠে চিত্ত। স্বামিজী সম্বন্ধে নানা কথার ফুলগুলো কখনও ভুলের বালু ছড়িয়ে যায় চোখে। অন্ধের মত পথ হাতড়িয়ে বেড়ায় শুধু।

দ্বিধার অন্ত নেই। দ্বন্দ্বের অবসান হয় না।

গভীর গুহায় বসে একটু শান্তির স্পর্শ, একটু আলোর ঝলক দেখবার জন্যে অনেক দিন মার্গারেট আকুল হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও একটা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কিছু হলো না। কতদিন চলে গেল। হয়ত আরো কত দিন যাবে। জীবনে সে অনুভূতি যদি কোন দিন না আসে! চমকে ওঠে মার্গারেট। একথা ভাবতে গেলে তার বুক শূন্য হয়ে যায়। মনের আর্শিতে আভাসিত হয় অতীত দিনের উদ্দাম মুখর স্মৃতিগুলো। কত প্রভেদ। সে দিন গুলো ছিল যেন সোনায় মোড়া স্বপ্নের। আর আজ? আজ চলেছে একটা অজানার অভিসারের অজ্ঞাত অভিযান। তবুও মার্গারেট হাল ছেড়ে দেয় না। বিধ্বস্ত জীবনের যত কিছু আবেদন নিবেদন সব কিছুকেই এক মুখো করবার জন্যে সে যত্নশীল। একাগ্র মনটায় মেঘ জমে বটে, কিন্তু ভুবন মঙ্গলের স্বপ্ন মন থেকে মুছে যায় না। মহৎ চিন্তার বিকাশ প্রার্থনা করেই তো এ জ্বালা।

স্বামিজী সবই বুঝতে পারেন। বুঝতে পারেন মার্গারেটের মনের অবস্থা। এই ক্লিন্ন জীবনের অবসাদ যে দিন ভাবনা হীন সমাধানের পথ পাবে খুঁজে, সে দিনই ওর সব প্রশ্নের জবাব মিলবে। স্বামিজী শুধু দেখে যাচ্ছেন। সময় হোক। তৈরী হোক আধার। তার পরে বপন করবেন বীজ। যত অস্থিরতা বাড়ে ততই যেন মৌন হয়ে যান স্বামিজী। এটা হচ্ছে যোগী পুরুষের লক্ষণ। কেন এমন হয় মানুষ তার কিছুই বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না মার্গারেটও। কিন্তু এমন হয়। হয়ে থাকে। বাহ্যিক উপেক্ষা দ্বারা তাঁরা প্রক্ষালন করে নেন তন্‌হা ক্লিষ্ট মনকে। আমরা আর কিছু না পেয়ে এই অবস্থাকে পরীক্ষা বলে করি আখ্যায়িত। পরীক্ষাই তো বটে। যদি তা না হবে, তবে কেন এখনো স্বামিজী নীরব। এমন তো কথা ছিল না! কত আশ্বাস কত আশাই তো রেখেছিলেন স্বামিজী মার্গারেটের সামনে। ও যে এসেছে সে তো শুধু সেই কথার উপরই নির্ভর করে। মন ভেঙ্গে না গিয়ে পারে মার্গারেটের? দেশকে ছেড়েছে মার্গারেট। তার জন্মলব্ধ সংসার ও চিন্তার ক্ষেত্র থেকেও এক দু' পা করে সরে সরে এসে দাঁড়িয়েছে ভারত-সাধনার বন কান্তারে। এই আত্ম নিগ্রহের বহ্নি-দহন তবুও যদি না নির্বাপিত হলো তবে কেন আসা, কি আশ্বাস?

এমনি ধারা দিনের পর দিন চলেছে। সহসা একটা অভূতপূর্ব দর্শন হলো সেদিন। যা ছিল না মার্গারেটের কপোল কল্পনায়। আত্মহারা হয়ে গেল মার্গারেট। লাভ করল অপূর্ব এক আত্ম প্রত্যয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য নবগোপাল বাবু। মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। আয়োজনটা চলছিল সকাল থেকেই। তারই নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা।

সহসা মার্গারেটের দৃষ্টিটা গেল স্রোতস্বিনী গঙ্গার দিকে। অপলক আঁখি পাতে তাকিয়ে থাকে মার্গারেট। কি দেখছে চেয়ে চেয়ে?

দেখছে তিনখানা নৌকোয় জ্বলছে মশাল। গঙ্গার উজান ঠেলে নৌকো এসে লাগে পারের মাটিতে। আরোহীরা সকলেই সন্ন্যাসী। আছেন তাদের ভেতরে স্বামিজীও; তাঁরা নামলেন। জয়ধ্বনিতে মুখর হলো চতুর্দিক। ঠাকুরের নামে বারে বারে আনন্দধ্বনি করতে লাগল পারের মানুষ। বাজতে লাগল কাঁসর-ঘণ্টা। বাজতে লাগল খোল করতাল। স্বামিজী আত্মহারা। নৃত্যছন্দের আনন্দে আপন ভোলা বিশ্বনাথ বিশ্বভোলা ঈশ্বরানন্দে উন্মত্তের মত নৃত্য করতে করতে এগোতে লাগলেন। গলায় ফুলের মালা। কণ্ঠে উদ্‌গীত। অন্তরে তৃপ্তির সুধা সমুদ্র। কান পেতে গানটা শুনে নিল—"দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে এসেছে আলো করে, কেরে ওরে দিগম্বর এসেছে কুটীরদ্বারে।"

সকলের কণ্ঠেই এক সঙ্গীত। সবই যেন স্বামিজীর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছেন মাতোয়ারা হয়ে। ক্রমে শোভাযাত্রা এলো নবগোপাল বাবুর বাড়ির সম্মুখে। বেজে উঠল শঙ্খ। বর্ষিত হলো চাঁদের আশীর্বাদ। স্বামিজী প্রণাম রাখলেন মাটিতে। মার্গারেট একেবারে অবাক হয়ে গেল। এত যার গাম্ভীর্য, যার একটা কথা শুনবার জন্য মার্গারেট উদগ্রীব হয়ে রয়েছে দিনের পর দিন, তাঁর মধ্যে একি অপূর্ব উচ্ছলতা! বিস্ময়ে নির্বাক মার্গারেট। কত প্রশ্ন কত কথাই না যেন তার মনটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে চায়। আর দশজনের মত মার্গারেটের মনেও সেই চির পুরাতন কথার কান্না জেগে ওঠে—"একী উদ্দাম আনন্দ!"

মন যেন সায় দেয় না পুরোপুরি। নেতি নেতি করে এসে দাঁড়ায় বিরতির পারে। তবুও প্রত্যয় দৃঢ় করতে পারে না মনকে। মনটা আবার বলে ওঠে—"একি পাগলামি, না ভক্তের দৈন্য, না ঈশ্বর প্রেম—কী এ?"

লক্ষ ভাবনার দোলায় দুলতে দুলতে মার্গারেট একদিন শুনল স্বামিজীর মুখে—"ভবিষ্যতের কোনও প্রত্যাশা তোমার যেন না থাকে। আসল আত্মোৎসর্গকে দেখো না বড় করে। এই বর্তমানটুকুই শুধু সত্য—এই ক্ষীণ কণাটি, যা রহস্যে মূক, নিথর। এই তো কালরূপে স্বয়ং ঈশ্বর…অপ্রতর্ক্য…সর্বব্যাপী।…

আগ বাড়িয়ে চলতে গিয়ে বেদনার গরল পান করে লাভ নেই। এ একটা মানুষের স্ব-দম্ভ আস্ফালন। ভবিষ্যৎ অদৃশ্য। তাকে নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে পথ

বেঁধে যাও বর্তমানের। তা না পারলেই দুরাশার অপমৃত্যু। মার্গারেট নির্বাক। কে যেন ভেতর থেকে ঠেলছে। কোথায়? আত্মোপলব্ধির দুর্গম পথে। আরো দুজন আমেরিকান বন্ধুর রয়েছে। তারা কত সুখী। তাদের ভাবনা নেই আশ্রম জীবনের। চিন্তা নেই ব্রহ্মচারিণীর ব্রত গ্রহণের। কাজ করে যাচ্ছে। মনের কোন একটা তারে এতটুকু বে-সুর নেই। মার্গারেট কেন ওদের মত কাটাতে পারে না জীবনটা?

এইটাই সবচেয়ে বড় কথা। কেন ওদের মত জীবনের সব কিছুকে গ্রহণ করতে পারে না মার্গারেট হাসি মুখে।

এতো হবেই। কেন?

জীবনে যখন লগন আসে, আসে যখন শুভ দিনের ইঙ্গিত, তখন বাইরের সব সঙ্গীত নিথর রাত্রির মত নীরব হয়ে যায়। কে যেন ভেতরের দুয়ার খুলে বসে থাকে একাকী। কখনো গান গায়। কখনো কাঁদে। আবার কখনো বা ভেসে চলে আনন্দের অমিয় লহরে। ব্যক্তিত্বের বালাই থাকে না। কিন্তু যখন সে আবেশ যায় কেটে তখনই যত সব জ্বালা। নানা প্রশ্ন। নানা তর্ক বিতর্কের দুর্বিসহ বোঝা এসে বারে বারে যায় বিধ্বস্ত করে। একে বলা যায় প্রাপ্তির প্রাক্ পর্ব। উত্তোরণের প্রথম সোপান।

মার্গারেটের এ মনো-বিহ্বলতাকে স্বামিজী এক দিন ভেঙে দিলেন। ভাসিয়ে নিলেন তার দ্বন্দ্বাভিঘাতের সমুদ্রোদ্বেল খর তুফানকে।

সকালের সোনার আলো সে দিনটায় ঝলমল করছিল আকাশে। সকাল। শুচিতার দীক্ষায় যেন দীক্ষিত হবার মধুর মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল মার্গারেট। স্বামিজী এলেন। বললেন মার্গারেটকে—"শিষ্যকে বর্জন কি গ্রহণ সে তো তাঁর ইচ্ছা। তাদের হৃদয়ে যে বাসনা বীজ হয়ে আছে তারও তিনি খবর রাখেন।"

সহসা নতনেত্রে মার্গারেট দুহাতে মুখ ঢাকে লজ্জায়। যেন একটা বজ্র সম্পাত হলো। মনের গভীরে যে বাণী নিয়ত বিভ্রম ঘটিয়ে যাচ্ছিল, স্বামিজী যে তারই কথা বললেন। কোথায় মুখ লুকোবো সে। কেমন করে চোখ তুলে তাকাবে। আজ সে প্রত্যক্ষ ভাবেই বুঝতে পারছে তার মনোময় সত্তার স্বদম্ভ ভাবটা। এটা ছিল সম্পূর্ণ অজানা মার্গারেটের। আজ স্বামিজী তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন সব। ব্যক্তিত্বকে এবারে আহুতি দিতে হবে। আত্মদানের মাঝ দিয়ে লাভ করতে হবে আত্মতৃপ্তির শান্তি। তাই করবে মার্গারেট। এবারে তার আমিটিকে বিসর্জন দিয়ে যাবে 'তুমি' ময় হয়ে।

ফেব্রুয়ারী মাস।

উৎসব মুখর বেলুড় মঠ। সমাগত ঠাকুরের জন্ম-তিথি। স্বামিজীর বিশ্রাম নেই। এবারে একটু বড় রকমেই উদ্‌যাপিত হবে ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী। সর্বোপরি দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হবে। অজস্র নিরন্ন দুঃখীর ক্ষুধা ক্লিন্ন অন্ন-রিক্ত জঠর জালায় স্বামিজী তুলে দেবেন অন্নাহুতি। এলো সে শুভদিন। অবিচ্ছিন্ন মিছিল। দীন দুঃখীর ভীড় জমে গিয়েছে। ক্ষুধার্ত জনতার মধ্যে পড়ে গিয়েছে অভূতপূর্ব সাড়া।

খাবার এলো। মিষ্টান্ন, ফল, শাক-সব্‌জি কতকিছু। ভক্তগণের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল 'হরিনাম'। ক্রমেই ভীড় বাড়ল। জনতার মিলিত জমায়েতের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন বিবেকানন্দ "প্রত্যেক হিন্দু প্রত্যেকের ভাই। এবারে পরস্পরে ঝগড়া বিবাদের পালাটা চুকে যাক। অবসান হোক দলাদলির। আমরা প্রচার করব আশা ও আনন্দের বাণী। আমরা সবাই ভাই ভাই। সবার সমান অধিকার।"

মানুষ তার যথার্থ দাবী নিয়ে বাঁচতে শিখবে। জানাবে তাদের পবিত্র অধিকারের বারতা। যারা লাঞ্ছিত, অবহেলিত অবজ্ঞাত এবারে মাথা তুলে দাঁড়াবার পালা তাদের। জগতের বুকে যে ধনী দীনে বৈষম্য তা চিরদিনের জন্য চুকিয়ে দেবার সাধনায় আত্ম নিয়োগ করলেন বিবেকানন্দ। জাত্যভিমানের পাচিলটায় হানলেন প্রবল আঘাত। কেঁপে উঠল সারাটা হিন্দু সমাজ। আজন্ম সংস্কারের ভ্রান্ত বনিয়াদের শক্ত ভিতটা যেন চাইল দীর্ণ হয়ে যেতে।

গঙ্গাস্নান সমাপনান্তে প্রায় পঞ্চাশ জন ভক্ত এসে প্রণাম করল ঠাকুরের মন্দির ফলকে। হলো তাদের উপনয়ন। স্বামিজী তাদের কানে রাখলেন গায়ত্রী মন্ত্র—

"ওঁ ভূঃ ওঁ ভূবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ;
ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥"

এই গায়ত্রী মন্ত্রের সার্থকতা কি? পরব্রহ্মের বাচক হলো প্রণব। এতে তিনটি অবস্থা অভিব্যক্ত হয়েছে। কি, কি? জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ। এই তিনটি অবস্থা ভেদে প্রয়োগ করা হয়েছে আকার, উকার ও মকার। একে বলা

যেতে পারে সৃষ্টি স্থিতি সংহার। আবার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনটি তত্ত্বের বাচকও একে বলা হয়ে থাকে। এর পর আসা যাক অর্দ্ধমাত্রায়—যার ভেতরে নিহিত রয়েছে বিন্দু নাদ ও কলা। শুধু তাই নয়—জানতে হবে কলার অতীতকে। জানতে হবে শুদ্ধ আত্মা ও চিৎকলার ব্যাপ্তি। কাজেই যাত্রা করতে হবে নিম্নস্তর থেকে। চলে আসতে হবে পরম সত্তা পর্যন্ত।

প্রত্যেক জপের মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি তিন তত্ত্ব। গায়ত্রী জপের মধ্যেও নিহিত রয়েছে এই তিনটি তত্ত্ব। এই তিন তত্ত্বের সাহায্যে পৌঁছে যেতে হবে ভগবদ্ধামে। তা কেমন করে সম্ভব? ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ মন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে চিত্তকে। তার পরে ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং মন্ত্রের শক্তি আরোপ করে আপন চিত্তকে এবং তত্ত্বকে পরিভাবিত করতে হবে ভগবদ্ ভাবনায়। চলে এলে ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ মন্ত্রে। এখানে এসে আপন সত্তাকে সম্পূর্ণ ভাবে ভগবদ্ ভাবে বিলীন করে দিয়ে আস্বাদ করতে হবে পরব্রহ্মের স্বরূপ।

প্রাচীন ঋষিরা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, আছে তা ভাণ্ডেও। একথার অর্থ কি? অর্থ হলো এই যে আমাদের ক্ষুদ্র এই দেহ ভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড সুপ্ত। জগতের সব তত্ত্বের সন্ধানই আমাদের ব্যষ্টি দেহে নিহিত রয়েছে। কিন্তু তাকে খুঁজে বের করতে হবে। সাধন দৃষ্টির রশ্মি শলাকায় আমার অন্তর রাজ্যের পুরুষ মহাজনকে জাগ্রত করে নিতে হবে। জাগ্রত করে নিতে হবে সৃষ্টি রহস্যকে কেন্দ্র করে। আমাদের মনে যে ভাবনার সাতটি স্তর ভগবদ্ধাম থেকে তামসিক ভূমি পর্যন্ত বিভক্ত হয়ে রয়েছে—তারা হলো এক একটি তত্ত্বের অধিষ্ঠান ভূমি। গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা মেরুদণ্ডের মধ্যবর্তী সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে যে ছয়টী চক্র রয়েছে তার সর্ব নিম্নস্তর মূলাধার থেকে পৌঁছে যেতে হবে সর্বোন্নত স্তরে। এবং সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে পারলেই অপূর্বজ্যোতি, অসীম আনন্দ হৃদয়ের সব আবিলকে অপসৃত করে দিব্যলোকের প্রস্নিগ্ধ ভূমিতে ভূমার সঙ্গে মিলিয়ে দেবে। মন তখন মগ্ন হয়ে শুধু নির্বাক সেই বাক্য মনের অতীতের রসসম্ভোগে তন্ময় হয়ে যাবে। যদিও তিনি অস্পৃশ্য, অব্যক্ত এক চিদানন্দ জ্যোতি, তবুও সাধকের সাধনায় এই জ্যোতিঘনঃ চিদানন্দময় অনন্ত এসে সীমার মাঝে তনু পরিগ্রহ করেন। প্রথমে স্বরূপ সাক্ষাৎ। তার পরে তপোমনের মন্দিরে জ্যোতির্ময় ভাবুকের ভাবনার অনুরূপ রূপ প্রকটিত হয়ে সাধকের তিতিক্ষিত মনকে প্রশান্তির স্বর্গে নিয়ে যায়। তখন ধ্যানী আর ধ্যেয়ে কোন প্রভেদ থাকে না।

স্বামিজী তার অনুগত ভক্তদের গায়ত্রী মন্ত্রের মহাশক্তি দান করে নিয়ে এলেন

অন্ধকার থেকে ঊষালোকে। নবজন্মের মাধুর্য মণ্ডিত জীবনগুলোর পানে তাকিয়ে তাদের সম্বোধন করলেন 'দ্বিজ' বলে। ঈশ্বরের আরাধনা করতে জাত কুলের বালাই নেই। ওটা মানুষেরই সৃষ্ট ধূর্তামি। এই সমস্যাটা নিয়ে স্বামিজী মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তেন। তার আত্মা বিদ্রোহ ঘোষণা করত।

মানুষের শাশ্বতদাবীকে খর্ব করবার অধিকার মানুষের নেই। জগতের যা কিছু বর্জন, পীড়ন ও লাঞ্ছনা তার অনেকটার জন্য মানুষই দায়ী। তাই তো বিবেকানন্দ বলতেন—"কে আর্য আর কে ম্লেচ্ছ ? যে অহংকারের পুঁটুলি হয়ে সবাইকে তফাৎ করে রেখেছে সে, না যে জাতিবর্ণের গণ্ডির বাইরে গিয়ে পরম সত্যের সর্বজন গ্রাহ্য বার্তা এনেছে সে ?"

অধ্যাত্ম ভাবনায় মানুষকে যদি সঙ্কীর্ণ করেই দিলে, ধর্ম যদি এনে দিলে মানুষের মনে মানুষকে ঘৃণা করবার মন্ত্রণা, তাহলে তা কোন ধর্ম ? কেমন ধর্ম ? জীবনের বিকাশ হোক সবিতার মত। সৌরভ ছড়িয়ে পড়ুক প্রসূন পরাগের মত। আর বিস্তৃত হোক এই মায়িক দেহটার পঞ্জরাবদ্ধ বক্ষ। সেখানে ভেদ বিভেদের অনু-কণাটিও যেন না থাকে। মানুষকে উচ্চকণ্ঠে তাই বলে আলিঙ্গন কররার সামর্থ্যটুকু যেন প্রতিটি জীবাত্মার জীবনের সম্পদ হয়ে ওঠে। তবেই ধর্মের সার্থক রূপায়ণ হবে সমাজে, দেশে, জীবে ও বিশ্বে।

স্বামিজীর এ বজ্রদৃঢ় আহ্বানে সে দিনকার গোড়া হিন্দু সমাজ হয়ত খুশি হতে পারেনি। হয়ত নিন্দার বস্তু বলেই করেছে উপেক্ষা। তা করুক। তিনি তবুও নির্দিষ্ট কর্ম থেকে ছুটী নিয়ে নির্জন বনে ধ্যানাসনে আসীন হলেন না। জীব জীবনের মধ্য দিয়ে শিব প্রকাশ প্রত্যক্ষ করবার বিলোল বাসনায় হয়ে উঠলেন উদ্বেল। হিন্দু-সমাজের বর্ণবিধ আর অহিন্দু বর্জনের বিবেক-ধ্বংস নীতিকে করলেন তিনি অমান্য। মনস্থির করলেন আইরিশ শিষ্যা মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা দেওয়ার জন্যে। নেতা বিবেকানন্দের জীবনে এ একটা ইতিহাস খ্যাত ব্যাপার। সে দিনের বাঙলা দেশটা অপলক হয়ে তাকিয়েছিল এই বিদ্রোহী আত্মার অগ্নিদীপ্তি প্রজ্ঞার দিকে।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ। ২৫শে মার্চ। সাক্ষী রইল দু'জন আমেরিকান বান্ধবী। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান। নীলাম্বর মুখার্জীর বাড়ি। মার্গারেট নবজন্মের প্রত্যাশায় দাঁড়াল গিয়ে স্বামিজীর সম্মুখে। এ যেন একটা যুগ ও জীবনের রূপান্তর সাধিত হতে চলল। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একজন সাধিকা হতে চলেছে মার্গারেট। তার অন্তর-সায়রে যেন কিসের একটা গুঞ্জরণ। মহাজ্ঞানের ক্ষীণ স্পর্শ এসে তার এ মোহনীয় মুহূর্তটিকে আরো মধুর করে তুলল। মনে পড়ে, অতীতের দিনগুলোর

কথা। যে সব দিনগুলো ছিল মার্গারেটের একান্ত নিজস্ব দিন। সেই মায়ের মুখ। বাবার স্মৃতি। আর ভারত প্রত্যাগত সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ বাণী। ধীরে ধীরে মার্গারেট একবার চোখ বুজে তাদের কথা স্মরণ করল। জানাল মনে মনে প্রণাম। তার পরে স্বামিজীর কাছে এসে দাঁড়াল। স্বামিজী তার ললাটে পরিয়ে দিলেন হোমকুণ্ডের বিভূতি। এইতো তার জীবনের সেরা সম্পদ। এই পুণ্য তিলক চিহ্নই তাকে চিহ্নিত করবে মানুষের দরবারে। সে যে সেবা ধর্মের পবিত্র দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে এসেছে। ভারতআত্মার চিৎশক্তির সঙ্গে হবে আজ তার শুভ দৃষ্টি। একি তার জীবনে কম স্মরণীয়? কম গৌরবের?

মার্গারেট নোবেল—পিতামাতার ক্রোড়ে এই নাম নিয়েই পরিচিত হয়েছিল শৈশবে। জীবনের যাত্রা পথে পদপাত করেও এই নামই শুনেছে জন ও জনতার মুখে। তার পর তার আভিজাত্যের মোহ মিনারটায় কে যেন গিয়ে ধরিয়ে দিলে ফাটল। একের পর এক ক্ষয়ে যেতে লাগল কামনা বাসনার পাপড়িগুলো। জীবনের বিস্তৃত পটে প্রত্যাসন্ন হলো প্রভাতের অরুণ লেখা। মার্গারেট একবার চোখ মেলে তাকাল।

কি দেখল ?

দেখল, মানব মনের বিচিত্র গতি ও প্রকৃত। সেখানে কত না দ্বন্দ্ব, দুঃখ, হাহাকার ও হতাশা। এত সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তারা পথ চলে। সংগ্রাম করে। স্বপ্ন দেখে আকাশ-বিসারী আশার। ঝিমানো জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মৃত্যুহীন স্পর্শ পেয়েও উজ্জীবনের দুর্জয় বাসনা লয়ে প্রিয়ার আবক্ষ আলিঙ্গনে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সন্তানের কচি কচি মুখের পানে তাকিয়ে বলে—ওরা বড় হলে আর ভাবনা কি।

এ জীবনে মাদকতা আছে। আছে নেশার মৌতাত। কিন্তু তা স্থায়ী হতে চায় না। দু'দিনের খেলা ঘরে মানুষ হাসে, কাঁদে আবার চলে যায় এ আবরণ উন্মোচন করে মহাকালের পদ্-প্রচ্ছায়ে। আমরা যারা নিত্য দুঃখ, নিত্য মৃত্যু লয়ে পলে পলে ডুকরে কাঁদছি, তাদের পানে তাকিয়ে এক অস্পৃশ্য অদৃশ্য শক্তি মুখ টিপে হাসছে। আমাদের শাস্ত্রকাররা বলে থাকেন—সংসারটা হলো কর্ম-খালনের ভোগ-পীঠ। মানুষকে এখানে আসতেই হবে। হবে কাঁদতে ও খেলতে। মানলাম। কিন্তু এ ভোগ-পীঠে যারা ত্যাগের তপো-বহ্নি প্রজ্জলন্ত করল, তারাও তো মানুষই ছিলেন। শক্তিমান যারা, যাদের কটাক্ষে করুণা, অভিশাপে আশীর্বাদ, তাদের বিচিত্র খেলা তো এই মহাভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রেই সংঘটিত হয়ে গেল। একবার চোখ মেলে তাঁদের 'পানে যদি তাকাই তবে কি দেখতে পাই ?

সংসারটা তাঁদের কাছে অবজ্ঞার না হলেও পরম কল্যাণীয় বস্তু নয়। তাঁরা ঘরে থাকে কিন্তু পরের মত। হাতে কাজ করে। আবার হৃদে নামও জপে। এই নাম জপার মধ্যেই তারতম্য। যারা নাম জপে তারা আত্মাহুতি দেয় আত্ম-পুরুষের চরণ প্রান্তে।

দুঃখকে করে নেয় জীবনের সারথী। আর বেদনাকে করে বন্দীকারার করুণা। সেই বেদনার উত্তাপেই গলে গলে ক্ষয়ে যায় সব কাঠিন্য। দুচোখ সিক্ত হয় জলে। সুরু হয় যাত্রা। সারথী দুরন্ত গতিতে বিবেককে বৈরাগ্যের পথে টেনে নেয়ার জন্যে চরম লাঞ্ছনার মধ্যে নিয়ে উপায়হীন দিশাহারা করে তোলে। তখনই মহাবোধের জাগরণ। মহামিলনের শুভলগ্ন সমাগত হয়ে থাকে।

মার্গারেট নোবেল তার জীবন দিয়ে এ সত্য বুঝেছে একদিন। অন্তর দিয়েও যে ফিরে আসতে হয় প্রত্যাখ্যানের যাতনা লয়ে তা সে আপন জীবনে করেছে প্রত্যক্ষ। অবিশ্যি এ আঘাতের প্রচুর প্রয়োজন হয়ত তার ছিল। কারণ ভেতরের দুয়ার খোলে না বাইরে ঝড় না জাগলে। তাই মার্গারেট নোবেল তার প্রস্ফুট যৌবন প্রসূন লয়ে যখন উৎসর্গের আয়োজন করেও ব্যর্থকাম হলো তখন তার সেই অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রভাস্বর হয়ে উঠলেন মহাভারতের মহা ঋত্বিক বিবেকানন্দ। প্রথম দর্শনেই প্রায় ঝুঁকে পড়েছিলেন। ধীরে ধীরে এগিয়েই এলো। আর পিছু তাকাবার অবসর হলো না। আজ সেই মহা মোহের দহন এসে পরশ পেয়েছে ত্যাগের। ভোগলিপ্সু মনটা হয়েছে যোগ-যুক্ত। রিক্ত হৃদয় ভরে গিয়েছে ভাব-বন্যায়। এবারে তৈরী হয়েছে আধার। আর দ্বিধার অবকাশ নেই। স্বামীজি ডাকলেন মার্গারেটকে। করলেন আশীর্বাদ। নাম রাখলেন—নিবেদিতা।

এ তার জীবনের মহা-লগ্নই বলতে হবে। কারণ এ নিবেদন শুধু যে কেবল আত্ম-পুরুষের আরাধনায় গুহাগহনে ধ্যান-বিনয়ী হয়ে থাকা, তা নয়—এ নিবেদন হলো জীবের পায়ে। নরের পায়ে। জীব এসে সেবা নেবে শিব হয়ে। নর এসে নারায়ণ হয়ে অবগাহন করবে নিবেদিতার ভাব-সমুদ্রে। ওকি যে সে? ও হলো ভোগ ও ত্যাগের সেতুবন্ধ। ঝড় ও ঝর্ণার মিলিত প্রবাহ।

স্বামীজি জানতেন না নিবেদিতার মায়ের কন্যা উৎসর্গের সংবাদটি। মিস ম্যাকলয়েড একদিন সে গোপন সত্য করল পরিবেশন। জানাল স্বামীজিকে। সে দিক থেকে নিবেদিতার এ আত্ম নিবেদন কিছুই চমকপ্রদ নয়। কিন্তু এ অপাপবিদ্ধ জীবনের ব্রহ্ম-উপলব্ধির পরম মুহূর্তটিতে নিবেদিতার দীপ্ত মুখের প্রভাস্বর দীপ্তি বলতে গেলে দর্শনীই হয়েছিল। শুধু তাই নয়, স্বামীজি তখন যেন ভাসছিলেন আনন্দ-সায়রে। তাঁর হৃদ্ যমুনার অজস্র আপ্লব এসে তাঁরই সারাটা দেহ প্রাণকে করে তুলেছিল আপ্লুত। যার বাস্তব স্বাক্ষর বহন করল দৃপ্ত কণ্ঠের অমিত উৎগীত। স্বামিজী তানপুরা নিয়ে গাইতে লাগলেন—

"পর্বত পাথার ব্যোম জাগো রুদ্র উদ্যত বাজ
দেবদেব মহাকাল, ধর্মরাজ শঙ্কর শিব তার হর পাপ" ।

শৈব যোগী তখন যোগ-যুক্ত। ভাবের আবেশে ঢল ঢল। ব্রহ্মচারীরা পায়ের কাছে বসে বসে মন্দিরায় তাল ঠুকে যাচ্ছে।

সহসা সঙ্গীত থেমে যায়। বলে চলেন স্বামিজী—"আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। তার কাজের ভার তিনি আমায় দিয়ে গেছেন। সে কাজ শেষ না করে আমার ছুটি নেই।"

দৃষ্টিচ্ছটা দিগন্তবিসারী আকাশ পেরিয়ে চলে যায় ওপারে, দক্ষিণেশ্বরে। কণ্ঠে জাগে দৃঢ় প্রত্যয়ের বাণী—"নিবেদিতা, আমি চাই ঐখানে মেয়েদের জন্যে একটি মঠ হোক। আকাশে উড়তে দুটি পাখা লাগে পাখীর। ভারতবর্ষের চাই শিক্ষিত নারী-পুরুষ দুই-ই।"

স্বামীজির এ আশার আকাশে নিবেদিতা একটি অপরিচিত পাখী। তার মনের ভুবনে তখন নিয়তই ধ্বনি-মধুর হয়ে উঠছিল একটা কথা,—আমি কি তোমার আরব্ধ কর্মের যোগ্য পাত্রী হতে পারব? কোন দিন কি তোমারই মতন সর্বত্যাগী ফকীরের গেরুয়া পরবার সৌভাগ্য আমার হবে? আমার মৌনতা ভেঙ্গে দাও। কর বাঙ্ময়। প্রাণময়। জগতের ঘরে ঘরে দুঃখ পীড়িত আর্তজনের সেবায় আমাকে সাহায্য কর। দাও প্রাণভরে বল, মন ভরে সেবার বৃত্তি।

মার্গারেটের নবজন্ম হলো। সে তখন যেন শুনতে পাচ্ছিল গুরুর সেই কথাটি—'মার্গারেট, তোমার জপের মন্ত্র অন্য কিছু নয়, শুধু 'ভারত, ভারত'!'

মনের ভুবনে জেগেছে ঝড়। এসেছে আড়ষ্ট চিন্তার ক্ষেত্রে ফসলের বন্যা। হৃদয়ের মরুদহন নিয়ে যাবে সাফল্যের সকালে নিবেদিতাকে। সেখানে শুধু কাজ আর কাজ। ভাবের ঘুর্ণী থেকে আকাশচারী মন এবারে বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করবে ধর্মতত্ত্বের। নিছক কতগুলো ভাববাদের বুলি বলে কাজ হয় না। কাজ হয় না বস্তুবাদকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়ে ভাববাদের চূড়ারোহণ করলে। মানুষের ধর্ম কি? এ প্রশ্নের জবাবে শুধু একটি কথাই আজ বলা চলে। তা হচ্ছে মানুষের পৃথিবীতে মানুষেরই দাবী নিয়ে সুস্থ জীবন যাত্রার পথ করে দেয়া। আমরা পরস্পর হিংসা, লোভ ও অসাম্যের কুটিল আবর্তে পরে এক একটি পুণ্য তীর্থকে নরকের আবাস করে তুলছি। প্ররোচনা দিচ্ছি একে অপরের অমঙ্গল চিন্তায়। ফলে জনতীর্থের নির্মল নির্ভেজাল প্রান্তরে নেমে আসছে রাত্রির অভিশাপ। দুর্দিনের ঝঞ্ঝা। কিন্তু নিবেদিতা আজ যে মহাব্রতের যজ্ঞ বহ্নিতে নিজেকে উৎসর্গ করল—সেখানে রয়েছে সম্পূর্ণভাবে মানবাত্মার বিজয় বিঘোষণ। রয়েছে মানুষের সেবাধর্মের চরমতম বিকাশের সাত্তিক পথ।

দীক্ষান্তে নিবেদিতার মনে একটা আকাঙ্ক্ষা পর পরই ঘুর পাক খাচ্ছিল—আমি কি গেরুয়া পরতে পারব কোন দিন? এ আন্তরিক বাসনার বাণী স্বামী বিবেকানন্দের মনেও চাপ ধরিয়ে দিয়েছিল। স্বদেশবাসী এই অপরিচিতাকে কেমন চোখে দেখবেন, গ্রহণ করবার সামর্থ্য তাদের হবে কিনা এই মেয়েকে, একথা নিয়ে অনেক চিন্তা করতে হয়েছে—স্বামিজীকে। যদিও নিবেদিতা নিজেকে দান করেছে ভারতের সেবায়। কিন্তু সে দানগ্রহণ করবার লোক চাই তো। এ কথা নিশ্চিত ভাবে স্বামিজীকে একটা ভাবনার মধ্যেই ফেলেছিল। তাই তো আমরা দেখতে পাই গুরু হয়েও শিষ্যাকে তিনি আড়াল করে রয়েছেন ছায়া-শান্ত মহীরুহের মত। দিয়েছেন আশ্বাস। হয়েছেন তার জামিন। শুধু তাই নয়—কেমন করে নিবেদিতাকে লোক-প্রিয় করে তোলা যায় এনিয়েও একটা ছক একে ফেলেছিলেন স্বামিজী মনে মনে। সে দিক থেকে মা সারদা দেবীর সঙ্গে ওর ভালো ভাবে পরিচিত হওয়া একান্ত দরকার ছিল। কারণ মা হচ্ছেন সকল ছেলের জননী। সঙ্ঘ মাতা। তাঁর স্নেহ পেলে সবাই ভালোবাসবে নিবেদিতাকে। জানাবে

অভ্যর্থনা। স্নেহ দিয়ে, মমতা দিয়ে প্রীতির ডোরে বেঁধে রাখবে এই পাশ্চাত্যের পরিজনকে। এ গেল একদিক। অপর দিকে স্বামিজী নিবেদিতাকে একমুঠো ফুলের মত ছুঁড়ে দিলেন জনতীর্থের মধ্যে। সেখানে নিবেদিতার দাঁড়াতে হবে। গ্রহণ করতে হবে মানুষের নেতৃত্ব। অর্জন করতে হবে তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

১৮৯৮-এর ১১ই মার্চ। জনাকীর্ণ ষ্টার থিয়েটার। গমগম করছে লোকে। স্বামিজী বক্তৃতা দেবেন। বলতে হবে কিছু নিবেদিতাকেও। বলতে হবে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার প্রভাব সম্বন্ধে। দুরূহ কাজ। কিভাবে যে নিজেকে নিয়ে হাজির করবে মুখর জনতার মধ্যে—এ বিষয় যেন সম্পূর্ণই অজ্ঞ ছিল নিবেদিতা। কিন্তু সে বলতে পারে। আছে মনভরা বলার অনেক কিছু।

স্বামীজি পরিচয় করিয়ে দিলেন নিবেদিতাকে। উৎসুক জনতা। তারা শুনবে বিদেশীর মুখে ভারতাত্মার জয়গান। একটা দারুণ রহস্যের মত যেন মনে হচ্ছিল কারো কারো কাছে।

হলঘরটা ভরা লোক। স্বামীজি তার মধ্যে দাঁড়ালেন। মুখর জনতা স্তব্ধ হলো। শুনল তারা জলদ গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি—"ভারতে সিষ্টার নিবেদিতা ইংল্যাণ্ডেরই আর একটি দান…"

এর পরেই নিবেদিতার পালা, এলো সে মঞ্চে। একবার তাকাল জনতার পানে। তারপরে শ্রীগুরুকে স্মরণ ক'রে বলতে লাগল—"দীর্ঘ ছয় হাজার বছর ধরে রক্ষণশীল হয়ে থাকবার আশ্চর্য নৈপুণ্য আপনাদের আছে এই রক্ষণশীলতাতেই একটা জাতি বিশ্বের সর্বোত্তম অধ্যাত্ম সম্পদকে এতকাল ধরে অবিকৃতভাবে রক্ষা করতে পেরেছে। তার প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে শুধু সেবা করবার জ্বলন্ত আগ্রহেই আমি ভারতবর্ষে এসেছি—"

সচ্ছন্দ গতি। কোথাও নেই আড়ষ্ট ভাব। ঘোলাটে চিন্তা। এ যেন ছন্দে বাঁধা কাব্য। মন্ত্রের মতো উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছে নিবেদিতা। আর মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে জনতা।

"এদেশে এসে শিশুর মতো সবকিছু শিখতে হবে আমাকে। সবে শুরু হয়েছে আমার পাঠ। আমার সহায় হোন আপনারা। যখন পথ হবে দুর্গম, তখন আপনাদের মমতা ভরা দৃষ্টিতে সমাদরের যে ছবি আজ দেখলাম তা স্মরণ ক'রে আমি বাঁধব আমার বুকে সাহস—"

কথাগুলো বলতে বলতে নিবেদিতা একাত্ম হয়ে উঠল। নিজেকে মিলিয়ে দিল সম্মুখস্থিত জনতার মমতামধুর মনের সঙ্গে। সত্যি এ আশ্রয় শিবিরে এসে নিবেদিতা

যেন নিজেকে ধন্য মনে করছে। এদের নৈকট্যের মন্দিরে এতটুকু খাদ নেই। নিবেদিতা যে এই-ই চেয়েছিল। অপরিচিত হয়েও তার অন্তরের অজানা আবেগে সবাইকে যেন মুহূর্তেই আপন ক'রে নিতে পারল সে। এবং শুধু যে কেবল তার বেলায়ই একথা সত্য তা নয়—জনতার মনও নিবেদিতাকে গ্রহণ করল পরম আত্মীয়া বলে। ওযেন ভারতের নিভৃত অন্তরের কুটুম্ হয়ে উঠল।

আত্মতৃপ্তির প্রীতিতে নিবেদিতা একেবারেই চলতি প্রথার বাইরে চলে গিয়েছিল। স্নেহের স্পর্শে মন হয়ে উঠেছিল অজানা বাঁশীর সুর। আপন মনে তাই বাজাতে বাজাতে আনমনা নিবেদিতা জনতার সাধুবাদ শুনে চমকে উঠল। এ তার আকাঙ্ক্ষিত নয়। আত্মস্তুতি তাকে পীড়ন করল। ফিরে এলো তার সম্বিৎ। ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে আনল নিবেদিতা। চলে গেল আপন নিঃসঙ্গতায়।

বেশ পরিস্নিগ্ধ জনতা। তারা তৃপ্ত। দীপ্ত তাদের বহু যুগের সঞ্চিত গ্লানিবদ্ধ বক্ষ। একবারে যেন বোবা গুমট জলাশয়টা আন্দোলিত হয়ে উঠতে চাইল। আবার তারা বলে উঠল—সিষ্টার নিবেদিতা! সিষ্টার নিবেদিতা!

এ আনন্দধ্বনি তাদের আসক্তিরই পরিচয় বহন ক'রে নিয়ে এলো। স্বামিজীর মুখখানাও হয়ে উঠল উজ্জ্বল। তিনি এবারে দাঁড়িয়ে বললেন—"কিন্তু সবচাইতে বড় কথা, তোমরা আত্মবিশ্বাস হারিও না। তাহ'লে কালে ভগবদ্বিশ্বাসও পাবে। অফুরন্ত শ্রদ্ধা হ'তেই জাগে অন্তহীন অভীপ্সা, যদি শ্রদ্ধা আমরা ফিরে পাই, তাহ'লে আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাস-অর্জুনের যুগও আবার পাব ফিরে। আমাদের মানবতার যা কিছু মহান আদর্শ ফুটে ছিল তো সেই যুগেই।

সভা ভাঙল। নামল নিবেদিতা ভিড়ের মধ্যে। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে স্বামিজী। জনতার মুখে তখন নিবেদিতার স্তুতি-বন্দনা। নিবেদিতার সাফল্যের বিজয়উল্লাস। আনন্দের উৎফুল্লতায় যেন স্বামিজীও প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারলে আজ খুশীই হ'তেন। এ যে তাঁরই গৌরব। তাঁরই সাফল্য ঘোষণার অন্তরাগুলি।

ধীরে ধীরে—

অতি ধীরে এগিয়ে চলেছে একটা কল্লোল। কোথায় এর পরিসমাপ্তি, কোথায় গিয়ে হারিয়ে যাবে এর খেই তা কেউ জানে না ব'লেই নীরবে সকলে শুধু দেখেছে দেখেছে ভিন্ দেশী এক তরুণীর তপো-তিতিক্ষার অশ্রান্ত গতি।

জীবন সুন্দর। সুন্দর মনের অলিন্দের ভাবনাগুলো। নিবেদিতা সন্ন্যাসিনী হবে। পরবে গৈরিক। আত্মাহুতি দেবে দশের কাজে। দেশের ডাকে। প্রাণের সবটুকু প্রবৃত্তি দিয়ে প্রাণ-প্রভুর স্বপ্ন সাধনাকে ক'রে তুলবে সার্থক। এ-সংগ্রাম তো আর কম নয়! দুর্জয় বাসনার বহ্নিবন্যাকে বক্ষে ধারণ ক'রে তবে নেমেছে নিবেদিতা। নেমেছে ভারতবর্ষের আত্ম-সুন্দরের স্বরূপ দর্শনের আকুলতা লয়ে।

স্বামীজি অবিশ্যি জানেন। জানেন এ মেয়ের মায়া-মুক্ত মনের মীমাংসা কবে, কখন, কেমন ক'রে হবে। কিন্তু তা জেনে-শুনেও তিনি ফেলে যাচ্ছেন না মানবীয় প্রকাশভঙ্গীর বিভিন্ন স্তরগুলো। যা দিয়ে মানুষের জীবন বিকাশের সোপান তৈরী হবে তা নিবেদিতার মধ্যে পুরোপুরিই রয়ে গেছে। তাই তো ধ্যানের সঙ্গে যোগ ক'রে দিলেন স্বামীজি—জ্ঞানের গৌরব।

নিবেদিতা যেদিন প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিল মহানগরীর কেন্দ্রপীঠে দাঁড়িয়ে, সেদিন উৎফুল্ল জনতার পানে তাকিয়ে সে তো তৃপ্তই হয়েছিল। হয়েছিল গৌরবান্বিত। সে গৌরব বোধের পশ্চাতে একবিন্দুও অহংকার ছিল না তার। ছিল একটা পরিতৃপ্তির চাপা হাসি। সে একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারল। এই তো অনেক! আর কি!

কয়েকটা দিন কেটে গেল। এবারে তারা তিনজনে মিলে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে বাগবাজারে। তিনজনে তৈরী হয়ে নিল। তৈরী হলো মিসেস বুল, মিস ম্যাকলয়েড আর নিবেদিতা।

হিন্দু পাড়া। দু ধারে বড় বড় বাড়ি। কোনটা বা কঙ্কালের মতো। আর কোনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে মাথা উঁচু ক'রে আভিজাত্য স্পর্ধা লয়ে। তার মাঝ দিয়ে পথটা চলে গিয়েছে। ওরা তিনজন বিদেশী—সারদা দেবীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য যাত্রা করল।

এবারে আর একটা হিন্দু পরিবারের অন্দর মহলের সঙ্গে পরিচিত হবে নিবেদিতা। তার আদর্শ, তার আচার-নিয়মের সম্পূর্ণ উল্টা ধরণ-ধারণের বিচিত্র ভাবধারার সঙ্গে

নিবেদিতার মনটা নিশ্চয়ই প্রথমটায় হয়ত খাপ খেতে চাইবে না। চাইবে না ব'লেই স্বামীজি নিবেদিতাকে ওখানে পাঠাচ্ছেন। অবিশ্যি যতটা সম্ভব আটসাট বেঁধে নিয়েছেন স্বামীজি। প্রতিকূল পরিবেশে ফেলে আত্মমন্থনের মধ্য দিয়ে আহরণ করতে হবে আত্মসিদ্ধির মন্ত্র। ঝড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পরে শুনতে হবে জীবনের বাণী।

নিবেদিতার সে জন্য কোন সংস্কার নেই। নেই মনে দ্বন্দ্ব। সে তো জেনে-শুনেই ঝাঁপ দিয়েছে। আত্মবলি দিয়েছে আত্ম সাক্ষাতের বাসনায়।

ওদের বাগবাজারে আসবার খবরটা পাড়াময় ছড়িয়ে পড়ল। উৎসুক জনতা আথিবিথি করতে লাগল। কখন আসে কখন আসে ভাব সকলকে যেন বসল পেয়ে।

গাড়ি থেকে নামতেই সকলে ঘিরে ফেলল। আনন্দের জোয়ার বইল যেন। সারদা দেবীর ঘরের দরজাটা আধো মেলা। ওরা ভেতরে ঢুকল। জুতা বাইরে রেখেই গেল।

মা বসে। তাঁর চতুর্দিকে কয়েকজন মেয়ে। মুখে মাখা হাসি। প্রশান্ত দৃষ্টি। পরণে শুভ্র শাড়ী। আঁচলখানা মাথায় দেয়া। পা দু'খানি লাল টুকটুকে। আলতা পরিয়ে দিয়েছে শিষ্যারা।

ঘরে ঢুকে ওরা প্রণাম করল। মা হাত জোড় ক'রে জানালেন প্রতি নমস্কার! মাদুর পেতে দিল একটি মেয়ে। বসল ওরা।

অপলক নিবেদিতা। শুধু তাকিয়ে আছে মায়ের স্নিগ্ধশান্ত মুখখানার পানে। কথা নেই। আছে একটা ঘন গম্ভীর পরিবেশের প্রবল চাপ। যেন থমথম করছে সারাটা ঘর। একটি মেয়ে এসে ওদের সামনে পিতলের রেকাবিতে করে মিষ্টি, ফল ও চা রাখল। মায়ের সম্মুখে রাখল চিনামাটির একখানা পাত্র। সহসা কি হলো! বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল সকলে। মাতৃরূপে সারদা সন্তানের সামনে এগিয়ে এলেন। ওদের তিন বিদেশী মেয়ের সঙ্গে শুরু করলেন খেতে।

এ এক পরম লগ্ন যেন। নিবেদিতা অবাক। বিস্ময়ে তার আয়ত আঁখি দু'টো গিয়েছে অপলক হয়ে। চেতনার 'পর আছড়ে পড়েছে এসে কতকগুলো ভাবের ঢল। কি দেখছে নিবেদিতা? একি স্বপ্ন, না সত্য! নির্বাক। নিস্পন্দ। শুধু দ্বন্দ্বের দোলায় দুলছে তার অন্তর। ভেসে যাচ্ছে যেন কোন অজানা উজানে। সেখানে অফুরন্ত আনন্দ। অপরিমিত সুখ। অসীম তৃপ্তি।

সহসা চমকে উঠল নিবেদিতা। তার নিরবচ্ছিন্ন মনটার ভুবন থেকে কে যেন বলে ওঠে—"কি অপরূপ!"

ওরে রূপের কথা বলব কি তাঁর!
মায়ের অঙ্গে ক্লান্তি
স্পর্শে শান্তি
দেখলে ভ্রান্তি রয়না আর
ওরে রূপের কথা বলব কি তাঁর।
মায়ের এক হাতে মরণ ত্রাস
আরেক হাতে অভয়-আকাশ ?
ত্রিনয়নে অগ্নি ঝরে
কণ্ঠে দোলে মুণ্ডহার—
ওরে, রূপের কথা বলব কি তাঁর।
বৈকুণ্ঠে মা শ্রীলক্ষ্মীরূপা—
রামের বামে সতী সীতা,
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ শ্রীরাধিকা
শ্রীরামকৃষ্ণের সারদা—
ও, তাঁর চরণ পূজে করেন ঠাকুর
উন্মুক্ত তাঁর সিদ্ধিদ্বার
ওরে, রূপের কথা বলব কি তাঁর।

এই অপূর্ব মূর্তির সম্মুখে ধ্যান নিমীলিত নেত্রে বসেছিলেন মানুষের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। অকাতরে ইন্ধন দিয়েছিলেন জীবনের সর্ববস্তু। তাঁর চরণ প্রান্তে অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে বলেছিলেন—"হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরি মাতঃ, ত্রিপুরা সুন্দরি,—সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর। ইহার শরীর মনকে পবিত্র ক'রে ইহাতে আবির্ভূতা হয়ে সর্ব কল্যাণ সাধন কর।"

তারপর ?

সারদামণি, শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী অধিষ্ঠিতা হ'লেন মহাশক্তি রূপে। রামকৃষ্ণ বসলেন তাঁর পদমূলে। উচ্চারণ করতে লাগলেন মন্ত্র—"হে সর্ব মঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপে, হে সর্ব কর্ম নিষ্পন্নকারিণি, হে সর্ব দায়িনি, ত্রিনয়নি শিব গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম।"

দেবীরূপে সংস্থিতা হ'লেন সারদা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। স্থাপিত হলো দেহ ছেড়ে আত্মার আত্মীয়তা।

এই মহামায়ার মহাপ্রকাশ প্রত্যক্ষ ক'রে অভিভূত হয়েছিল বাগদি ডাকাত।

মানবহন্তা দস্যু ছেড়ে দিয়েছিল তার ব্যবসা। মাতৃ রূপের স্নেহে শান্তিতে সারাটা রাত জেগে বসেছিল ডাকাত ও তার পত্নী। যে মায়ের সম্মুখে ওরা জীবনের সাফল্য, কামনা ক'রে ফেলত চোখের জল, সেই ডাকাতে কালীর রূপ ধরে মা সারদামণি আজন্মের মনে নিভিয়ে দিয়েছিলেন ডাকাতের অন্তর-বহ্নির জ্বালা। প্রবৃত্তির ব্যভিচারকে নিবৃত্তির মাধুর্যে ভরে দিয়ে তাদের অন্তরকে করেছিলেন ভক্তির বৃন্দাবন।

এই শ্রীমুখের আশ্বাস পেয়েই সিমলার নরেন দত্ত দিগ্‌বিজয় ক'রে ফিরে এসেছিলেন বিবেকানন্দ হয়ে। আজ নিবেদিতা এসে উপবেশন করেছে সেই মহা-শক্তির পদপ্রান্তে। অমন দেখবে না তো কি?

এ যেন সমাপ্তিহীন পরিচ্ছেদ। যত দেখা তত মাতা। কিন্তু প্রকাশের ভাষা মৌন। মুখর কেবল অন্তর। আর মন্থর মনের গতি। কেন? এখনি যেন শেষ হয়ে না যায়। এখনই যেন হারিয়ে না যায়। সীমাহীনের মাঝে তুমি সসীম হয়ে এলে। এলে তো চলে যেও না। প্রাপ্তির মণিকণা ছড়িয়ে চোখকে ঢেকে দিও না রজত কুয়াশায়।

পঁয়তাল্লিশ বছরের একখানা প্রৌঢ়া মুখে যেন প্রতিভাসিত হয়েছে যারশীসুন্দরীর কনক-কান্তি। এ যেন অরুণোদয়ের সূর্য। উজ্জ্বল কিন্তু প্রশান্ত। দ্যুতিময় কিন্তু সৌম্য প্রশান্তির শীত-সকাল। জুড়িয়ে যায় দেহ, কিন্তু ফুরিয়ে যায় না তৃপ্তি।

একটু একটু হাসছেন শ্রীমা। দোভাষী একটি মেয়ের মারফৎ আলাপ জমিয়ে দিয়েছেন বেশ। বলছেন কথাবার্তা। নিচ্ছেন খবরাখবর। "তোমরা বাড়িতে ঠাকুর পূজা কর কিভাবে?"

নিবেদিতা জানিয়ে দেয় তাদের রীতি-নীতি। আবার প্রশ্ন "কি ধরণের প্রার্থনা কর তার কাছে? তোমাদের মা, বাবা কি বেঁচে আছেন এখনও?"

মধুর কণ্ঠ। ওরা যে যার কথা বলে যায়। অন্তরঙ্গতার রংমহলে জ্বলে ওঠে স্নেহ-প্রীতির মণিদীপ। আরো যেন ঘনতম হয় ওঁদের হৃদ্যতা।

কিন্তু এমন একটি সুধাময় পরিবেশে নিবেদিতার মন কি ভাবছে? কি চাইছে তার সারাটা অন্তর? এমন আনন্দের হাটে কেন আনন্দময় আসছেন না! "এমন বিমল আনন্দের অংশ গ্রহণ করতে কেন স্বামিজী অনুপস্থিত?" নিবেদিতার মন একান্তভাবে কামনা করছে বিবেকানন্দের সমুপস্থিতি। আকু-বাকু করছে নিবেদিতা। নীরবে তাকাচ্ছে ঘরে বাইরে। না, দেখতে পাচ্ছে না তো। তবে উঠেই যাবে সে! ডেকে আনবে তাঁকে?

ভাবনার বিঘোরে বিভ্রান্ত নিবেদিতা। এখন যেন স্বামিজী কাছে থাকলে আরো ভালো হ'ত। আরো মনোময় হয়ে উঠত এই পরিবেশ। সহসা চমকে উঠল সকলে। মাথায় টেনে দিল ঘোমটা। স্বামিজী এসেই মায়ের পায়ে প্রণাম রাখলেন। শ্রীমা করলেন আশীর্বাদ। নীরব সন্ন্যাসী আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বলে গেলেন শ্রীমাকে—বিদেশী মেয়েদের বিদায় দিতে।

চলে গেলেন স্বামিজী। বললেন মা—বললেন নিবেদিতার পানে তাকিয়ে—"তুমি আসায় খুব খুশী হয়েছি মা।"

ওরা বিদায় নিল। গোপালের মাও জুটলেন। যাবেন একসঙ্গে বেলুড়ে। শ্রীমার সঙ্গীনীদের মধ্যে গোপালের মা ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া। কিন্তু এই তিন বিদেশী, আত্মীয়াকে তিনি মনের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। তার মধ্যে আবার নিবেদিতার 'পরই যেন তার টানটা অধিক বলে মনে হলো। তিনি যে ঠাকুরের কৃপা পেয়ে ভবিষ্যৎ দেখতে শিখেছেন। তাইতো নিবেদিতার প্রত্যাসন্ন সন্ন্যাসীনির গেরুয়া বেশ যেন ভেসে উঠল তাঁর নয়নার্শিতে। এ হৃদ্যতা তো সেই জন্যেই। শুধু তাই নয়, সন্ধ্যার ধূপছায়া যখন নেমে এলো গঙ্গার কূল ছুঁয়ে, ধরণী হলো যখন লগ্না—ঠিক তখন দুই সঙ্গিনী নিবেদিতা আর গোপালের মা মিলে গঙ্গার ঘাটে নামলেন জপ করতে।

গরমের দিন এসে পড়ল। মে ও জুন মাস। কলকাতার বুকে যেন চাপা আগুনের গুমট গরম। সকলের মনে মহা ত্রাস। হয়ত দেখা দেবে প্লেগ।

এমনি দিনে এক পত্র এলো সেভিয়ার দম্পতীর। লিখলেন স্বামীজিকে যাবার জন্যে। তাঁরা এখন অবস্থান করছেন আলমোরায়। হিমালয়ে গিয়ে থাকা যাবে কিনা এ সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেবেন স্বামীজির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে।

বিদেশী শিষ্যাদের নিয়ে পাহাড় অঞ্চলে যাওয়াই স্থির করলেন স্বামিজী। উদ্দেশ্য যে আর কিছু ছিল না তা নয়। এই জনবহুল কোলাহলের মধ্য থেকে একটু আলাদা হ'তে পারলে নিবেদিতার জন্যেও কিছুটা সময় বেশী দেয়া যেতে পারে।

যুগসঞ্চিত আকৃতি লয়ে ভক্তের প্রাণ ছুটছে এই উপল বন্ধুর অরণ্যশঙ্কুল পথ পেরিয়ে। স্বামিজীর সঙ্গে ওঁরাও চলল। চলল হিমালয়ের হিম-রুক্ষ পরিবেশে দেহ ক্লান্তির বেদনা বিস্মৃত হয়ে। সঙ্গে চারজন সন্ন্যাসীও যাবেন স্থির হলো। প্রস্তুতির প্রথম পর্ব শেষ হলো। তৈরী হয়ে নিলেন তুরিয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ ও স্বরূপানন্দ। যাত্রার দিন স্থির হলো। ১৮৯৮-এর ১২ই মে প্রদোষ প্রচ্ছায়ে আলোর তীর্থে যাত্রা করলেন নগর সভ্যতার কেন্দ্রপীঠ থেকে।

সমভূমি পেরিয়ে যাত্রীদল প্রথম এসে পৌছলেন নৈনিতালে। সমুদ্র থেকে ছ'হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত শহর নৈনিতাল। এ যেন মোক্ষ-মুক্তির দুর্জয় বাসনা লয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়ের পদপ্রান্তে। লোভন মধুর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য। ফলে-ফুলে, পল্লবে-পাহাড়ে এ এক সৌন্দর্যের অমরা।

'খেতরির মহারাজ অভ্যর্থনা জানালেন অতিথিদের। বললেন "যিনি অতিথি, তিনি ভস্মে ভূষিত সাধুই হ'ন আর রাজপুত্র বা ভিখারিণীই হ'ন, গৃহস্বামী তাঁকে মনে করেন ঈশ্বর প্রেরিত।" শুধু তাই নয়, মহারাজ নৈনিতাল—অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দির

দ্বার খুলে দিতে আদেশ করলেন বিদেশিনীদের জন্যে। এ এক আশ্চর্য ব্যাপারই বটে। যে মন্দির বছরে মাত্র একবার ভক্ত-প্রাণ মুমুক্ষুদের দর্শন লোভন আকৃতি জুড়িয়ে দেয়, তা আজ কয়েকটি বিদেশী মহিলার জন্যে অবারিত হয়ে গেল। স্থানীয় লোকদের কৌতূহল উদ্রেক করল। ওরাও দু'একজন এসে ঢুকল ওঁদের পিছু পিছু। নৈনিতালের হ্রদে হাত ধুয়ে ওঁরা ঢুকল মন্দিরে। একের পর এক দেখে চলল ছোট ছোট দেউলগুলো। মন্দিরাভ্যন্তরের গর্ভগৃহের দেবী মূর্তি দেখবার জন্যে ঝুঁকে দাঁড়াল ওরা। পুরোহিত তুলে ধরলেন প্রদীপ। কিন্তু ভালো দেখতে পেলো না।

এরই মধ্যে বাইরে জনতার ভিড় জমে গিয়েছে। তারা দেখছে বিদেশীদের হাল চাল। নিবেদিতা ফিরে তাকাল। দু'টি সুন্দরী তরুণীও দাঁড়িয়ে। জনতা যেন তাদেরও দেখছে। ঝলমলে অঙ্গবাস। জড়োয়ার সিঁথিপাটি, মণিময় ললাট। বেশ অপরূপ রূপ ধরেছে যেন। মেয়ে দু'টি বলল—"আমরা স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে চাই, চাই তাঁর আশীর্বাদ।"

জনতা গর্জে উঠে বলল—"দূর-হ নষ্টা কোথাকার।"

কিন্তু সন্ন্যাসীরা অনুমতি দিলেন মেয়েদের ভেতরে আসতে। স্বামিজীর সামনে এসে প্রণাম করল তারা। রাখল তাঁর পায়ের কাছে কতকগুলো মোহর যেন স্বামিজীর কাজে লাগে।

স্বামীজি করলেন না তিরস্কার। হ'লেন না রুষ্ট। প্রশান্ত নয়নে ওদের পানে তাকিয়ে নীরবে আশীর্বাদ করলেন। করবেন না কেন? সতী আর অসতী, এযে তাঁরই দুই রূপের দুই প্রকাশ। মায়ের কারুণ্যপূর্ণ নির্ঝর নিয়ে আবির্ভূতা হয়েছেন সতী। তাঁর অন্তর তীর্থে সাত্তিক মন্ত্রের উৎগীত ধ্বনি মধুর হয়ে বাজছে। আর অসতী? তিনি এসেছেন মন্থিত সমুদ্রের গরল পান করে জগতের পাপ পরিতৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটাতে। নোংরা জলের নর্দমায় যে স্রোত বয়ে যায় তার উৎস ও অন্তও যেখানে লীন হয়ে মহাতরঙ্গে মিলে যাবে, পরিস্রুত জলের ফোয়ারাও সেখানে গিয়েই মহাশক্তির বুকে বিলীন হয়ে যায়। প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ হলো দর্শনে ও মননে। মনকে কর বিশ্ব প্রাঙ্গণ আর চোখকে কর চন্দ্র সূর্য—তবেই সব দ্বন্দ্বের সমাধান। মহা নির্বাণতন্ত্রে মহাদেব পার্বতীকে বলেছিলেন—"তব স্বরূপা রমণী জগত্যাচ্ছন্ন বিগ্রহা।" অর্থাৎ, জগতের নারীমাত্রেই তোমার স্বরূপ। শুধু আমরাই দেখতে পাই না তা। কারণ দৃষ্টি আমাদের স্থূল। কিন্তু মহাপুরুষদের চোখে তা ঠিকই ধরা পড়ে।

তাই আমরা অনেক সময় ভুল করি। ভুল করি মহাপুরুষদের চিনতে। তাঁদের

সান্নিধ্য কামনা করে কোন দুশ্চরিত্র বা দুশ্চরিত্রা হাজির হ'লে আমরা তখনই মুখর হয়ে উঠি অশ্লীল বাক্যে। কিন্তু কেন? একবারও বিচার ক'রে দেখি না বা দেখতে চাই না যে, এ মিলনতীর্থের পরম প্রসাদ লাভ করবার অধিকার রয়েছে সকলেরই। তাঁর কাছে তো কোলের পিঠের নেই। তিনি যে অন্তহীন অধ্যায়ের সমাপ্তিহীন পরিচ্ছেদ। তাঁর কাছে কি পাপী তাপী, সাধু-অসাধুর ভেদ থাকতে পারে? স্বামীজি যে সিদ্ধযোগী। তাঁর স্পর্শে সব মালিন্য ধুয়ে যায় যে! তাই তো কুলটার প্রণাম গ্রহণ করলেন তিনি নীরবে।

ভক্ত আর ভগবান। সত্যিই এ এক অভিনব লীলা। শত যুগ মাথা কুটে যা দুর্লভই থেকে যায়, কোথাকার তুই বারাঙ্গনা এসে তা চেয়ে নিলে সহজে, স্বাভাবিক ভাবে।

নিবেদিতার আয়ত আঁখি বিস্ময়ে স্থির। তারও অন্তর মন জুড়ে আত্মপ্রীতির ঝড় জাগল। তার মনটা যেন ঐ পতিতার মনের সঙ্গে এক হয়ে গেলে অনেক ভালো ছিল। তবেই তো সে মহামানবের মহান সান্নিধ্যে আজ নিজেকে ভরে নিতে পারত। তার 'পরেও ঝরে পড়ত করুণাময়ের কারণ্য সৃষ্টির ধারা। সেদিন কবে হবে! কবে এই বহ্নিদহন থেকে, মরুর উত্তাপ থেকে সে চির মুক্তির, চির শান্তির প্রশান্ত অঙ্কে ঘুমিয়ে পড়বে!!

বেলা শেষের রোদ পড়েছে বনের বুকে, পথের বাঁকে-বাঁকে। উত্তাপহীন একখানা পাকা সোনার টুক্‌রো যেন। চোখ জুড়ান মন ভোলান দৃশ্য। নিবেদিতা তাকিয়ে, তাকিয়ে রয়েছে সেই প্রাকৃতিক শোভা-সমারোহের পানে।

প্রসাদ-উদ্যান। স্বামিজী বক্তৃতা করছেন। মহারাজও সেখানে উপস্থিত। সমুৎসুক জনতা। প্রবল উৎকণ্ঠার মধ্যে প্রতিটি ক্ষণ, কণাকে ওরা ধরে রাখছে। কেন? এ যে মন্ত্র। মাতৃ-সাধনার তান্ত্রিক পথের ইঙ্গিতে। ষট্‌চক্র ভেদ ক'রে তবে অনুভূতির অনুরণন। চিত্তের সকল প্রবৃত্তিগুলো একমুখো না হ'লে সাধনায় সিদ্ধি নেই। প্রাণের সব সৌন্দর্য, শ্রম ও ভালোবাসা দিয়েই না আরত্রিক করতে হয় প্রিয়জনের? ঠিক 'তেমনি' ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয় মাতৃমুক্তির জন্য।

ভারতবর্ষ শৃংখলিত। তার চতুর্দিকে জ্বলছে হিংসার দাবাগ্নি। স্বামিজীর দিব্য নয়নে ভেসে উঠল তারই পূর্ণ অবয়ব। শিউরে উঠলেন তিনি। অন্তরের কেন্দ্র বিন্দুতে যেন কিসের ব্যথা বাজে। জলদমন্দ্রিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন বীর বিদ্রোহী সন্ন্যাসী—"দিন আগত। এবারে সাধন করতে হবে শক্তির। আমরা নিদারুণ আলস্যে গেছি জড় হয়ে। ঝেড়ে ফেলতে হবে সে আলস্য। আজ আমরা শক্তিহীন গোলামের জাত। আমাদের স্বাধীনতা নেই। নেই প্রাণের প্রশস্ত পরিধি। সে সব পাওয়ার ইচ্ছাও আমার নেই······"

জীবন-সংগ্রামের মুক্ত ময়দানে দাঁড়িয়ে কর্মযোগী ঘোষণা করলেন যোগ-শক্তির মন্ত্র। দু'চোখ বেয়ে নামে জলের ধারা। ক্লান্ত জীবনের ক্ষীয়মান বক্ষে এ যেন শ্রান্ত শিশুর মাতৃ-স্তনের তৃষা।

বেনীয়া শাসনের কারা বেষ্টনীতে কণ্ঠ তার স্তব্ধ। অমাবস্যার অন্ধকারের মতো চতুর্দিকে তমসার গুণ্ঠন। এই দারুণ দুর্দিনে জননী ক্রন্দসী। তাঁর পঞ্জরে পঞ্জরে মুক্তির মরুদগ্ধ হাহাকার। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অন্তর মাতৃ-লাঞ্ছনায় বিমূঢ়। কখনো বা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়। জীবনে ত্যাগ দরকার। তা ব'লে বেঁচে থাকবার পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে নয়। কর্মযোগী আত্মমুক্তির দুর্জয় তেজে তন্ময় না হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মানব মুক্তির মহাসংগ্রামে। এবং তাঁর সে সংগ্রামের হাতিয়ার আহরণ করলেন তিনি তাঁর আত্মিক শক্তি দিয়ে।

সব দেখল নিবেদিতা। সব শুনল। উঠল চমকে। কে যেন তার চেতনার মধ্যে ছুঁড়ে মারল একমুঠো ধূলি। কি আশ্চর্য! তবে কি ওর কাছে ভারতবর্ষই

সর্বস্ব? সন্ন্যাসী কেন চোখের জল ফেলছে ভারতবর্ষের দুঃখে। এ কিসের আসক্তি?

দলে দলে লোক গ্রহণ করতে লাগল স্বামিজীর শিষ্যত্ব। যুবক দল উদ্দীপ্ত হলো। তাদের মধ্য থেকে একজনে ব'লে ফেলল: "আমি সংগ্রহ ক'রে দেব টাকা, অনেক টাকা। এ দেশের ছেলেরা সেই অর্থে যাত্রা করবে ইংল্যাণ্ডে। সেখানে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে ফিরে আসবে ভারতবর্ষে।''

কিন্তু স্বামিজী বললেন: "না ভাই, এ কোনো কথা নয়। নিশ্চিত জেনো, এ সব লোক বেশীর ভাগই চিন্তায় ভাবনায় বেদেশী হয়ে যাবে। হবে দো-আঁশলা। হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ স্বার্থপর। অবশেষে নিজের দেশকেও ভুলে যেতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। কেবল ইউরোপের নকল করার সাধনায় হয়ে উঠবে তৎপর। না—আমরা চাই শক্ত সমর্থ এদেশের ধাতুতে গড়া একদল লোক। তারা জানবে ভারতের আত্মাকে। জাতীয় আদর্শকে জীবন্ত ক'রে তোলাই হবে তাদের জীবন-ব্রত।"

কথাগুলো এক একটা দাগ এঁকে দিয়ে যায় নিবেদিতার কষ্টি মনে। নানা প্রশ্নের শর বর্ষণ শুরু হয়। মনে পড়ে দাদু হ্যামিল্টনের স্মৃতি। তিনিও ঠিক এমনি ধরণের কথাই বলতেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা কইতে কইতে দাদুও কেঁদে ফেলতেন। তবে কি ভারতবর্ষ......বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা অংশ নয়?

এদিকে সময় হয়ে গেছে। স্বামিজী এবারে যাত্রা করবেন নৈনিতালের মাটি থেকে হিমগিরির কঙ্করময় দুর্গমের দিগন্তে। প্রথমে উপনীত হবেন আলমোড়ায়। কুলি এলো। এলো বাহন ও খচ্চর। ডাণ্ডিও এনেছেন মহারাজ ভাড়া করে। যাত্রা শুরু হলো। প্রথমে চলল মেয়েদের ডাণ্ডি। পেছনে টাট্টুর পীঠে সন্ন্যাসীর দল। তারপরে বোঝাবাহি কুলিদের মিছিল।

সূর্যের শেষ আভাটুকু মিলিয়ে গেল। নেমে এলো সন্ধ্যা। ওঁরা পথ চলে। কিন্তু গতি হয়েছে অনেকটা মন্থর। লাঠি আর মশাল নিয়ে একদল লোক যাচ্ছে সকলের আগে আগে। তারা মারছে বনের বুকে লাঠির আঘাত। পথ মুক্ত করছে। তাড়িয়ে দিচ্ছে বাঘ ও ভাল্লুকগুলোকে।

হিম ঝরছে। কনকনে ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বইছে। কাঁপন ধরে যাচ্ছে দেহের খিলানে খিলানে। সামনেই একটা বাংলো। ঘন দেওদার বনের প্রশান্ত বেষ্টনীর মধ্যে সেই ছবির মতো বনস্নেহের অঙ্কে ওঁরা ছাউনি ফেললেন।

রজত জ্যোছনার ঢল নেমেছে। বনের বুকে নিশীথ বিহঙ্গের কলগুঞ্জনের শেষ নেই। বড় ভালো লাগে এই বনবিহঙ্গের কণ্ঠ। তার চেয়েও ভালো লাগে তুষার-

মৌলী পর্বতচূড়া দেখতে। এ যেন ধ্যান-শান্ত হয়ে বসে আছেন জটাজুটধারী শঙ্কর। জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী থেকেও এ দৃশ্য হৃদয়গ্রাহী।

নিবেদিতা বিস্ময়ভরা চোখে একবার তাকাল। তার কবিমন খুলে দিল সেই অরণ্যাশ্রীর মধ্যে। আকণ্ঠ পান করল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। বিহ্বল হলো। গেল তন্ময় হয়ে। সহসা উঠল চমকে। ডাক পড়ল খাবার।

খাওয়া শেষ হলো। শুরু হলো কুলিদের সঙ্গীত। বাজল মাদল। বাজল করতালি। তার মধ্য থেকে জেগে ওঠে পাহাড়ী সুর। এও এক বিস্ময়ের অধ্যায় যেন নিবেদিতার কাছে। জীবনে এমন মন খোলা নৃত্য আর সঙ্গীত এই প্রথম শুনল সে। প্রাণের আনন্দে ওরা নাচে গায়। সেখানে নেই বিন্দু আভিজাতিক গাম্ভীর্য। নেই এতটুকু মান অভিমান।

নিবেদিতা নির্বাক। শুধু দেখছে আর শিখছে। দেখছে ভারত আত্মার মন্দির তোরণের এক একটি সোপান। আর শিখছে তারই বিচিত্র বৈচিত্র্যের লীলা মাহাত্ম্য। একটা আকাশ বিসারী তালগাছের সঙ্গে ও দেহটা এলিয়ে বসল। দেখতে লাগল এখানকার বনবন্ধুর আনন্দ উৎসব।

রাত ভোর হয়ে গেল। প্রভাতী পাখী ডেকে উঠল। পথটা স্বচ্ছ হ'লেও স্বর্ণালী নয়। ওদের যাত্রা আবার শুরু হলো।

দেখতে দেখতে চারটা দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। শেষ হয়ে এলো ওদের অভিযান। দিশারী হেকে বললে—আলমোড়া পর্বতশ্রেণীর দর্শন-সংবাদ। আরও একটা সন্ধ্যা নেমে এলো।

পথটা দুর্গম বটে। কিন্তু বড় সুন্দর। বিমুগ্ধ নিবেদিতা। ডাইরী নিয়ে বসল নিবেদিতা। লিখে ফেলল এক কলম, "জায়গাটা বাইরের জগৎ থেকে খুব কাছে নয়। কিন্তু গোড়া থেকেই বিরাট বাহিনীর সঙ্গে এতখানি পথ আসায় মনে হয়নি যে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। এই দুর্গের মতো পাহাড় ঘেরা ছোট্ট বসতিটি যে আসলে কতদূরে আর কতখানি নির্জন তা আমি যেন বুঝতেই পারলাম না।… এখানে আছে একরকম পাইন গাছ, দেওদার বলে তাকে। অনেকটা যেন ঠিক লার্চ আর সেভায়ের মতো দেখতে; বিরাট আর চমৎকার। ওদেশে যেমন একটা গন্ধ ওঠে কালো জামের শরৎকালে, তেমনি একটা সুগন্ধ আছে এ গাছগুলোতে।… সামনে গোলাপী রঙের নীচু পর্বতবলয়, তার'পরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দেবতাত্মা হিমালয়ের তুঙ্গ-শুভ্র ও শৃঙ্গরাজি। বিরাট মহিমা এখানে কোন মতেই ভোলবার নয়।"

আলমোড়া।

এখানে এসে দেখা হয়ে গেল সেভিয়ারের সঙ্গে। চলে এলেন সকলে মিলে তার বাড়িতে। ছোট্ট ঘর ভাড়া নেওয়া হলো। সেভিয়ারের আতিথ্যে হ'লেন সকলে মুগ্ধ। মনের খুশীতে দিনগুলো কাটতে লাগল ওখানে।

মিস ম্যাকলিয়ডকে স্বামিজী ডাকেন 'জয়া' বলে। সত্যিই সে বিজয়িনী। নামের সঙ্গে চরিত্রের সাদৃশ্য অপূর্ব। কথায় কাজে দৃঢ়। সাহসে উদ্দীপনায় প্রাণময়। তাকে না মানে হেন লোক নেই। এমন কি কুলিরাও ধরে ফেলেছে তার চরিত্র। তাই তো তাদের অন্তর মনের একটুখানি স্বতন্ত্র ঠাঁই অবশেষ রাখে তার জন্যে। তা রাখবে না কেন? যেখানে ভালোবাসা, সেখানেই ভয়। এ ভয় বিভীষিকার আতঙ্কে মৃত্যু যন্ত্রণা নিয়ে আসে না, নিয়ে আসে মাধুর্যের অব্যক্ত দিশাহারা পুলক। তাই তো কুলিদের কাজে এত উৎসাহ। প্রাণ উজার ক'রে কাজ করে তারা। ওদের পানে তাকিয়ে থাকে ম্যাকলিয়ড।

কিন্তু এই নির্জন শৈল ভূখণ্ডের তন্দ্রাহীন তুহিনে স্বামিজী ওদের নিয়ে এসেছেন কেন? কেন এই বিজন বিপিনে নিরালার আসন পেতে মুখোমুখি বসেছেন ওদের? ক্রমেই তিনি ডুবে যাচ্ছেন। বাইরের দুয়ার বন্ধ করে দিতে পারলেই যেন বেঁচে যান এমন একটা ভাব। কোন অবলম্বনই যেন আর রাখতে চান না। কিন্তু নিবেদিতার কাছে অসহ্য লাগে। তার ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা করে। এমন স্বপ্ন সবুজ পাহাড়ী পরিবেশ, এমন নীল আকাশের নৈকট্য, এমন স্নিগ্ধ মধুর মলয় অনিল সবই যেন তার চোখে মুঠা মুঠা কুয়াশা ছড়িয়ে দিয়ে যায়। সাহস হয় না তার আপন অন্তরদ্বার খুলে বসতে। পারে না তাকাতে গুরুর মুখের পানে। এক এক ক'রে চার-চারটা দিন কেটে গেল। কিন্তু বেদনার বিষকুম্ভ যেন একটুও খালি হলো না। মনের দিগন্তে একটা ঝড়ের গর্জন বারে বারেই কি যেন বলে যেতে লাগল। তবে কি গুরু তাকে ত্যাগ করলেন? এ প্রশ্ন মনে উঠতেই ভেতরের সব দুয়ার সশব্দে খুলে গেল। নিবেদিতা চোখ বুজে একবার অদৃশ্য দিগন্তের পানে অবারিত করল দৃষ্টি। মানস নেত্রে প্রতিফলন ঘটল মহামানবের হৃদ্ অধীর।

সেখানে তো ঝড় নেই! বাত্যা নেই! এ যে প্রশান্ত। যুগসঞ্চিত সাধনা

বারির পবিত্র স্পর্শে প্রস্নিগ্ধ। প্রজ্বল। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অনির্বাণ। নিবেদিতা চমকে উঠল। তার অন্তর মন্থন হয়ে গেল আর একবার। গুরু তাকে ত্যাগ করবেন কেন? এ নীরবতার অর্থ তো ত্যাগ নয়! নয় এ নিঃসঙ্গ জীবনের মানে একাকিত্বের বেদন-পাষাণ বোঝা। এ যে শান্তির কান্তির ও প্রেমের মৌন নির্ঝর। অন্তর সলিলা ফল্গুর মতো এর গতি প্রকৃতি। উপরে তপ্ত মরুর রুক্ষতা। কিন্তু ভেতরে রয়েছে প্রশান্তির বেদন হরণ শীতলতা।

তবুও বড় কঠিন ব'লে মনে হয় নিবেদিতার কাছে এ-পথ। কামনা বর্জিত কর্ম, নিরাসক্ত আত্মাহুতি, নির্বেদ ভালোবাসা, এ তো সহজসাধ্য কাজ নয়। আর এ আদর্শের পূজো করতে নিবেদিতার প্রাণান্তকর খাটুনি। কিন্তু আর তো কোন পথ খোলাও নেই তার সমনে। গুরু মাত্র এই একটি পথই তুলে ধরেছেন। বলেছেন দীনের দীন হয়ে তার পরে হ'তে হবে শরণাগত। তবেই কর্ম হবে সাত্ত্বিক। হবে পবিত্র। তখন আর মনে কণ্টক বিদ্ধ হবে না। মনে হবে না এগুলো অকাজের কাজ বলে। অজপা নামের মতো জীবন বীণার ছন্দে ছন্দে এক হয়ে যাবে এ অভ্যাসের সুর সৃষ্টি। প্রাপ্তির বাসনা ভুলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ঝড়ের বুকে। তখন সেই মাতোয়ারা আত্মভোলা ভাব থেকে বিভাসিত হবে আত্মা। অহন্তার মৃত্যু ঘটবে। স্বপ্রকাশানন্দের মহিমায় পূত শুদ্ধ হবে জীবন, মন ও যৌবন। ধ্যানের চোখ খুলে যাবে আপনিই।

আপন অন্তরের এই দ্বন্দ্বাভিঘাতের সঙ্গে নিজেই যুঝে চললো নিবেদিতা। বিবেকানন্দ এখনও তেমনি। একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টি নেই তার নিবেদিতার 'পর। বেদনায় নিবেদিতা মর্ম-মৃত্যুর যাতনা সয়ে থাকে। বেলুড়ে যেমন ক্লাস হ'ত, এখানেও তা হয়। কিন্তু নিবেদিতা সেখানে বলে মাপা কথা। স্বামিজীও তা ব'লে আগবাড়িয়ে চলেন না। তিনিও দু'একটা ছাড়া বড় বলতে চান না কিছু। বরং এই নীরবতার মধ্য থেকে মাঝে মাঝে স্বামিজী নিবেদিতাকে তিরস্কার করেন। আরক্ত নেত্রে তার ভুল ভ্রান্তির প্রতি হানেন কটাক্ষ। নিবেদিতা ব্যথা পায়। দু'চোখ ভরে আসতে চায় অবাধ্য অশ্রু। তবে হ্যাঁ, একথা নিবেদিতা জানে, গুরু চেয়ে আছেন তার অশান্ত মনের প্রশান্ত বিকাশের শুভলগ্নটির পানে। মনটা ভার হয়ে থাকে। আভাসিত হয় মেরী ও যিশুর মরমী মূর্তি। যেমন করে মেরী নীরবে নিবেদন করেছে যিশুর পায়ে তার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও প্রেম—ঠিক তেমনি ভাবে যদি নিবেদিতা উজাড় করে দেয় নিজেকে?

কত ভাব। আর কত ভাবনা। কেমন ক'রে স্বামিজীর নৈকট্যের মন্দিরে

উঠল অফুরাণ প্রেমে। আত্মার গভীর থেকে তখন কেবল ধ্বনি মধুর হয়ে উঠতে লাগল শিবস্তুতি। সে আনন্দ নিঃসীম। সে মুহূর্ত দুর্লভ।

রাত কেটে গেল। ঘুম ভাঙল নিবেদিতার। সত্যি ও নিজেও বুঝতে পারে না। কি হলো! মনের দিগন্ত ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে একটা অজানা শিহরণে। তার বুক চিরে স্বামিজীর কথাই ওর মনে জাগে। হয়ত আর দেখা হবে না।

ভাবের নভে মন চলে অভিসারে। সীমার জগৎ পেরিয়ে অনেক দূরে। অসীমের লীলাপথে। সেখানে উদাসী মনের দোসর বড় মধুর হয়ে আসেন। চোখ বুজেও তাঁকে দেখা যায়। কান না দিয়েও শোনা যায় তাঁর কথা। সে নিঃসঙ্গতার মাঝে অপূর্ণতার বেদনা নাই। সে একক সঙ্গীতে মনের সব তারগুলোই ঝঙ্কৃত হয়ে সুর ধরে। নিবেদিতার ভাষায়—'ধীরে ধীরে একটা উপশমের ভাব একটা বিরাটত্বের অনুভব এলো। এমনি করে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারলেই সত্যকার বৈরাগ্যের অধিকার মেলে। এইসব উজ্জ্বল মুহূর্তেই আমাদের জীবন দেবতা যেন কলায় কলায় পূর্ণ হয়ে ওঠেন অন্তরে। আর সেই অভ্যুদয়ের মহিমাতেই আত্মার মহিমাকে আমরা বুঝতে পারি।

এ চিঠি নিবেদিতা লিখেছিল মিসেস র‍্যাট্‌ক্লিফকে ১৯০৬-এর ২২শে এপ্রিল।

শক্তির স্ফুরণ ঘটলে দেহটার 'পরে প্রবল একটা চাপ আসে। অনেক সময় তাতে দুর্বল লাগে। নিবেদিতারও তাই লাগছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। সোজা বনের দিকে চলে গেল। বসল এক ছায়াঘেরা তরুচ্ছায়ায়। তখনও তার মনের আনন্দ একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। মুখর কণ্ঠে গীতার শ্লোক আওড়াতে লাগল। আপন শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার 'পরে আস্থা এসেছে দ্বিগুণ উৎসাহে। স্বকীয় সাধন-পথের দরজায় এতদিন যে বন্ধন বা বাধা ছিল, ত' যেন দিনের আলোয় স্পষ্ট স্বচ্ছ হয়ে উঠল। আজ আর ভ্রান্তি নেই। বেদনা নেই। আজ নিবেদিতা নতুন দুনিয়ার খোঁজ পেয়ে মুগ্ধ। আত্ম আবিষ্কারের মাদকতায় তন্ময়।

কিন্তু এ অমৃত বস্তুর আস্বাদন একাকী করলে যে তাতে শান্তি নেই। জগৎ জানুক। জানুক তার বান্ধবীরা সবাই। তাইতো নিবেদিতা কলম নিয়ে বসল। লিখল নেলকে এক চিঠি—'শিখেছি অনেক কিছু! একটা বিশেষ অবস্থা আছে মনের। তাকেই বলে অ্যাধ্যাত্মিকতা। সেটা পাওয়া দরকার। যেমন মন কাঁদে মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তেমনি ভগবানকে পাওয়ার জন্যও অন্তরাত্মা হাহাকার করে। যাকে.আমি মনে করতাম মহানুভবতা বা নিঃস্বার্থতা, প্রকৃতপক্ষে তা আজ

কিছুই নয় অহং শূন্যতার সু-তীব্র জ্যোতির কাছে। মনে হয় নিতান্ত ঠুনকো, নিতান্ত খেলো। সত্যের এই প্রথম পাঠগুলো আয়ত্ত করতে আমার যে এত সময় লাগল এ বড় আশ্চর্য, না? আপাততঃ এর বেশী কিছু বুঝতে পারছি না। অতীতে মানুষের জীবন ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে, আমার যে সব ধারণা ছিল, সেগুলো এখনো পারিনি নস্যাৎ করে দিতে। অথচ সাধু মহাত্মাদের ওগুলো অপসৃত করবার জন্যই চেষ্টা। তা আমি বুঝি। তাঁরা কি নিতান্তই ভুল করেন? এখনও যেন আমি পথ হাতড়াচ্ছি সন্ধ্যার আবছা আঁধারে। একে-ওকে শুধাচ্ছি; খুঁজছি প্রাণ। কিন্তু এ প্রত্যয় আমার দৃঢ় যে, কোন-না-কোনদিন সত্যকে প্রত্যক্ষ করব। নিশ্চিত বিশ্বাসে সে সত্য সেদিন দান করব আর পাঁচজনকেও।'

ব্যক্তিত্বের গণ্ডি ভেঙেছে। জীবন দেবতার আশীর্বাদে খুলে গিয়েছে হৃদয়ের দরজা। নিবেদিতা আর সে নিবেদিতা নেই। বিপুল বিশ্বের সঙ্গে তার আত্মীয়তা হয়েছে। এবারে সে পূর্ণের অনুধ্যানের যোগ্য অধিকারী।

স্বামিজী ফিরে এলেন। আর বিরোধ নেই দুজনার মাঝে। অমৃত জ্যোতির ঝর্ণাধারায় নিবেদিতার দেহ মন পরিশুদ্ধ। এবারে গুরু হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবরণ উন্মোচন হল অন্তরের।

আলমোড়ার দিনগুলোর পেছনে লুকানো ছিল একটা গভীর উদ্দেশ্য। সকলের মাঝে নিবেদিতাকে রেখে তার ভেতরকার সংস্কারকেই মুক্ত করতে চেয়েছিলেন স্বামিজী।

দীক্ষান্তে বেলুড়ে বসে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন স্বামিজী, জিজ্ঞেস করেছিলেন নিবেদিতাকে, 'নিবেদিতা, এখন কোন পূণ্যভূমি তোমার স্বদেশ?'

অজ্ঞের মতো জবাবটা হয়েছিল সেদিন, 'আমি তো বৃটিশ স্বামিজী।'

স্বামিজী ব্যথা পেলেন। রইলেন চুপ করে। অবিশ্যি পরে খেয়াল হলো নিবেদিতার। এ ভুলের সংশোধন করতে জীবনের অনেক মূল্য দিতে হলো তাকে। ধর্মের মধ্যে ভেদজ্ঞান অজ্ঞানের লক্ষণ। কিন্তু গুরুগত প্রাণ না হলে তো গুরুর কিছুকেই ভালোবাসা যায় না। আর গুরুকে কেন্দ্র করেই না গোবিন্দের মন্দির অভিমুখে যাত্রা? তবে কি বলল নিবেদিতা! সে যেন নিজেই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেল।

কিন্তু যোগীপুরুষ বিবেকানন্দ আর মুখোমুখী কিছু বললেন না নিবেদিতাকে। এবারে ওর ভেতরটা সম্পূর্ণ পালটে দেওয়ার কাজে করলেন আত্মনিয়োগ। বীজ বুনলেন দুহাতে, মুঠা মুঠা। স্বাধীনভাবে দাঁড়াবার সুযোগ দিলেন নিবেদিতাকে।

আত্মজাগৃতির সু-স্বপ্নে ও নিজেই জেগে উঠুক। নিজেই এগিয়ে যাক ঘাত প্রতিঘাত দ্বন্দ্ব দুঃখের মধ্য দিয়ে। পদে পদে ভ্রান্তি দর্শিয়ে খাঁটি করবার চেয়ে আত্মজিজ্ঞাসার সামনে দাঁড়িয়ে কুড়িয়ে নিক নিবেদিতা সমাধানের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

প্রথমটা ওকে বেশ কষ্ট পেতে হলো। হিন্দুর আচার নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সে কি কম কষ্ট! মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়েছে। বিচলিত হয়েছে। আবার ঠিক ভেঙে পড়বার আগে পেয়ে গেছে সত্যিকারের পথ—সে পথে নেই গুরুর আরক্ত কটাক্ষ, নেই বিরক্তির ভ্রূকুটি।

ভারতবর্ষের পথে প্রান্তে নিবেদিতা কত আর্ত, পীড়িত, ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখ দেখেছে। দেখেছে দৈন্য দুঃখের চরম আঘাতে মানুষকে অসহায় ক্রন্দন করে মৃত্যু বরণ করতে। মনটা এসে এখানে থমকে দাঁড়িয়েছে বারে বারে। কখনও চোখ ভরে জল আসতে চেয়েছে। কখনও আত্মার আর্শিতে জ্বলে উঠেছে ওদের অন্তর দহনের আগুন। নিবেদিতা বিদ্রোহিণীর মত ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে দাতব্য প্রতিষ্ঠান খুলতে। চেয়েছে চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে হাজিরা দিতে। কিন্তু এ সেবার মাঝে হয়ত কোথাও লুকান থাকত নিবেদিতার আত্ম প্রচারের প্রচ্ছন্ন বাসনা। তা সে নিজেও বুঝতে পারত না। কিন্তু দ্রষ্টার চোখে তা এড়াবে কেন? তাই তো আমরা শুনতে পাই স্বামিজীর মুখে—'আমি শুধু চাই, এইটা তুমি বোঝ যে বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে দান করা অহং পরিতৃপ্তির একটা অছিলা মাত্র, ওটা তাদের স্বার্থের পরিচয়।'

আর কোন কথা বলতে পারল না নিবেদিতা। তার আয়ত আঁখি দুটো শুধু রইল অপলক হয়ে। প্রবৃত্তির প্রগাঢ় মনটা নিবৃত্তির স্পর্শে নিরাশক্ত হয়ে উঠল।

এমনি কঠোরে কোমলে, ধৈবতে, গান্ধারে স্বামিজী তৈরী করে নিয়েছেন নিবেদিতাকে। শুনিয়েছেন আগামী দিনের কর্ম ছন্দের সহজ সুর। যে সুর কোনদিন ভাঙবে না, যার ছন্দ হবে না কোনকালেও গতিহারা এমন একটি সুরে তুলে নিলেন স্বামিজী, তুলে নিলেন নিবেদিতাকে।

বহু বৎসর পরে নিবেদিতা আজকে দিনের কথা বলতে গিয়ে লিখেছিল—'মনে হত যেন সভ্য স্কুলে ঢুকেছি।"

সত্যি তাই। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে তাকে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছে। জীবনকেই জীবনের বাণী-রূপে প্রতিভাসিত করবার আগে প্রাপ্তির দিগন্ত শূন্যই থেকে যাবে। নিবেদিতা একথা জানত।

আলমোড়াতে স্বামিজীর পেছনে লাগান হলো গোয়েন্দা। এ ব্যাপারটা জানতে পারলেন এক সন্ন্যাসী। ভারত আত্মার সুমহান বাণী প্রচার করবার অধিকারও নেই ভারতবাসীর। সরকার-রূপ অপদেবতার দাপটে তাও যেন স্তিমিত হয়ে এলো। মানুষের এই পবিত্রতম অধিকারের 'পর হানাদারী সত্যি অসহ্য। শাসক থাকবে শাসনের দণ্ড নিয়ে হাতে। তার গণ্ডি অন্তর-গহনে নয়, বাইরের রাজ্যে। কিন্তু ইংরেজ সরকার চাইল ভারতীর মর্মমূলে শিবির নির্মাণ করতে। ফলে দেখা দিল অসন্তোষ। এবং নিবেদিতা দাঁড়াল এসে তার পুরোধায়। এ সংবাদটা শুনে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আত্মার গভীরে কে যেন জ্বালিয়ে দিল প্রতিবাদের হোমবহ্নি। চিঠি লিখল নিবেদিতা, চিঠি লিখল নেল হ্যামণ্ডকে— 'স্বামিজীর কাজে যদি বাধা দেয়, তাহলে এখানকার গভর্ণমেণ্টকে বলব পাগল।··· সমস্ত দেশে এতে আগুন ধরে যাবে। আমি যে এতখানি রাজভক্ত, এখানে আসবার আগে তা সন্দেহও করিনি। কিন্তু এদেশের সবচেয়ে রাজানুরক্ত ইংরেজ মহিলা হয়েও ওরা এমন করলে আগুন জ্বালব সবার আগে আমিই। জাতি বিদ্বেষ যে কি, ইংল্যাণ্ডে থেকে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এখানে এসে তা দেখলাম।'

এমনি এক প্রচণ্ড আত্মবিভ্রমের মধ্য দিয়ে কেটে গেল চারটা মাস। নিবেদিতার মনটা ধীরে ধীরে সরে আসতে লাগল। স্বজাতির 'পর শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সম্ভ্রমের অটুট প্রত্যয় যেন একটা অন্ধকারের কুণ্ডলী পাকিয়ে মনকে বিষাক্ত করে তুলল। নিবেদিতা বুঝতে শিখল পরাধীনতার জ্বালা কত দুঃসহ।

ঠিক এমনি দিনে কাশ্মীরের মহারাজা একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামিজীর হাতে দিতে চাইলেন কিছু সম্পত্তি। কিন্তু প্রমাদ ঘটল। হুকুম পাওয়া গেল না দানপত্র করবার। একটা বিরাট আশাভঙ্গের বেদনায় স্বামিজী যেন মুসড়ে পড়লেন। প্রতি পদে পদে এই বন্ধন শৃঙ্খলের জ্বালায় তাঁর অন্তর মন আরো আত্মস্থ হয়ে পড়ল। শুধু বললেন তিনি—'মায়ের ইচ্ছা অন্য রকম······তিনি বেছে নিয়েছেন দুর্গমের পথ।'

তবুও নিরাশ হলেন না স্বামিজী। তাঁর মনের মধ্যাহ্ন গগনে একটি প্রস্নিগ্ধ শশী উঁকি দিয়ে গেল। যোগীর যোগনেত্রে আর এক পথ প্রভাস্বর হয়ে উঠল।

বললেন আবার—'কলকাতা সমস্ত দেশের সংস্কৃতি-কেন্দ্র, সেখানেই আমাদের কাজ শুরু হবে এই বুঝি তাঁর ইচ্ছা।'

নিবেদিতা পারল না তাতে আশ্বস্ত হতে। তার চিন্তায় ঘনিয়ে এলো ঘোর। বিস্ময়াবিষ্টের মত প্রশ্ন করল—'একি ? জাত ভাইকে একজন ভারতীয় রাজা পারবে না তাঁর নিজের সম্পত্তি দান করতে ? আর এটাই বা কি রকম কথা, যে একজন হিন্দু তার দেশের কল্যাণপ্রদ কাজ করতে পারবে না স্বাধীনভাবে ?'

নিবেদিতা নিজের মধ্যে নিজে পালিয়ে থাকে। দিনরাত খুঁজে ফেরে এই অন্যায়ের হীন হানার প্রতিকার। কেন এমন হয় ? কি ক্ষতি ছিল একটি শিক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে! আশ্চর্য! ক্রমে সব জানতে পারল নিবেদিতা। সরকারী দপ্তর থেকে শোনা গেল, কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট সার অ্যাডালবার্ট ট্যালবট্ প্রস্তাবটা তুলতে দেয়নি শাসন-পরিষদে। কেন ? ধর্মের ধ্বজাধারী একদল বেইমান পাদ্রীর নিষেধাজ্ঞারই প্রত্যক্ষ ফল এটা।

না, নিবেদিতা আর নীরবে সহ্য করতে পারবে না এই জাতভাইদের ব্যভিচার। তার সমস্ত চেতনার মধ্যে একটা প্রবল সংঘর্ষের প্রবৃত্তি গুমরে উঠল। এমন শঙ্কট মুহূর্তে উদাসীন থাকা মানে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছে গেল নিবেদিতা। চিঠি লিখল আর একটি নেল্ হ্যামণ্ডকে, "স্বামিজীর অগোচরে যদি একবার রেসিডেণ্টের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করতে পারি, তা হলে বোধ হয় সুরাহা একটা হয়। পাদ্রীদের যেমন স্বামিজীর বিরুদ্ধে কথা বলবার অধিকার আছে, তেমনি রাজপ্রতিনিধির কাছে গুরুর হয়ে বলবার অধিকার রয়েছে আমারও। ইংরেজ মেয়ে আমি, কেমন করে ইংল্যাণ্ডকে এমন হীন কাজ করতে দেব ?"

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর এ চিঠিটা লিখল নিবেদিতা। তার মনোবহ্নির জ্বালা প্রশমিত করবার এমন নিশ্চিত নিরাপদ ঠাঁই আর নেই যেন। নেল্ হ্যামণ্ডকে সব কথাই লিখে জানায় নিবেদিতা। কেমন করে এদেশের কণ্ঠ রোধ করে রাখছে সরকার। কিভাবে শ্বেতাঙ্গদের দাপট চালাচ্ছে নীরব ভারতবাসীর 'পর। সবই লিখে চলল নিবেদিতা।

কিন্তু প্রতিকারের পথ যে রুদ্ধ হয়ে গেল। স্বামিজীর প্রভাবে নিবেদিতার মনের বিকার যেন নির্গলিত হলো ঝর্ণাধারার মত। আঘাতের বদলে ভারতবাসী শিখেছে প্রেম নিবেদন করতে। জীবনের চরম দিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তারা কারো উপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি পশু প্রবৃত্তি নিয়ে। এ তাদের জীবন দর্শনের প্রথম

পাঠ। অন্যায়ের প্রতিকার আঘাতে নয়, আলিঙ্গনে। এ সত্য নিবেদিতার অন্তরকেও স্পর্শ করল। কিন্তু পঞ্চভৌতিক দেহ নিয়ে জনারণ্যের মাঝে বাঁচতে গেলে এ আদর্শ শক্ত করে ধরে থাকাও তো দায়। নেল্ হ্যামণ্ডকে এখনও নিবেদিতা পত্র লেখে। কিন্তু তার সুর গিয়েছে পাল্টে। আগুনের শিখা দিব্য স্পর্শে হয়ে উঠেছে স্নিগ্ধ এবং শান্ত,—"ভারতের সেবা করছে ইংল্যাণ্ডের সন্তানেরা নানা ভাবেই। এ কথা বলতে কার্পণ্য করলে অবিচার করা হয়। কিন্তু যে ভাবে করলে বিনিময়ে ভারত থেকে পাওয়া যেত প্রীতি, সে ভাবে হচ্ছে না। ভেবে দেখ, প্রত্যেক দেশই স্বাধীনতার দাবি করছে। ইটালি চাইছে অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে, গ্রীস চাইছে তুরস্কের কাছ থেকে স্বাধীনতা। ভারতও ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকে মুক্তিই চায়। কালে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে শিখবেও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে এবং ভারতবর্ষের সামাজিক উন্নতির পক্ষে রাজনীতিক সুশাসন একান্ত অপরিহার্য।"

অনেক হিন্দুদের সঙ্গে এ বিষয় নিবেদিতা আলাপ আলোচনা করতে লাগল। আলমোড়ায় তখন অনেক লোক গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেছে। মিসেস্ অ্যানি বেসাণ্টও ছিলেন ওখানে। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আর একটা পত্র লিখল নিবেদিতা নেল্ হ্যামণ্ডকে। সে চিঠির সারাটা স্থান জুড়েই যেন একটি ছত্র প্রভাস্বর হয়ে ওঠে। "ভারতবর্ষ আর ইংল্যাণ্ড পরস্পরকে ভালবাসবে এই আমার সারা জীবনের স্বপ্ন।"

নিবেদিতার এ নিরাবিল মনকে স্বামিজী ভেঙ্গে দিলেন না। তিনিও তার এ প্রচেষ্টাকে জানালেন অভিনন্দন। বললেন—"কাজে লেগে যাও। চেষ্টা করে দেখ। হয়ত একটা পথ খুঁজে তুমি পাবে।"

এ উক্তির মধ্যে স্বামিজীর কিছুটা হতাশার ভাব থাকলেও নিবেদিতা তা ধরল না। সে সমান উৎসাহ নিয়েই লিখল হ্যামণ্ডকে, "উনি যত শিগ্‌গির আমার দেশের আশা ছেড়ে দিয়েছেন, আমি অত তাড়াতাড়ি ওঁর দেশ সম্বন্ধে নিরাশ হব না বলেই মন বলে।"

দিনের পর দিন ভারতবর্ষের নির্যাতন দেখে নিবেদিতার মন আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে নেই কোন অহং প্রকাশের অবকাশ। দাম্ভিক, অহঙ্কারী নিবেদিতা এখন দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিখারীর মত স্বামিজীর আদেশ পেলে বলতে পারে—"টাকা দাও, বই দাও, কাপড়-চোপড়, চাল, ওষুধ সব দাও আমায়। হিসেব করো না, তোমাদের দেওয়া জিনিস কোন কাজে লাগবে জিজ্ঞেস করো না। শুধু দাও।"

এ যেন আত্মাহুতির পূর্ণ নিবেদন।

বাইরের দরজায় খিল পড়ল।

খুলে গেল অন্তর দ্বার। ক্লান্ত দিনের আবিল ধুয়ে গেল। জীবনে একটা বড় রকমের ইঙ্গিত এলো। এ যেন প্রলয়ের তিমির-বৃন্তে প্রশান্তির শুভাশিস্। আত্ম সমর্পণে এত আনন্দ! নিজেকে উজাড় করে দিয়ে এত তৃপ্তি! কই, এর আগে তো মনে হয়নি তা। জীবন-বিচ্ছিন্ন সত্য লয়ে এতদিন চলে ছিল শুধু অভিনয়। দুটো মন তাল দিয়ে চলেছে দুটো পৃথিবীর। মন বলেছে এক, মুখ বলেছে অন্য। ভেতরের ঝড় ভাষা পায় নি বাইরে। মনের মধ্যাহ্ন গগনে যে সঘন দোলা জেগেছে তা আমিত্বের মাদকতায় ছুটে পালিয়েছে মৃত্যু মোহনায়। তাই ছিল তিমির গুণ্ঠনে আবৃত তার ভুবন। কিন্তু আজ! আজ সে যে কি হয়ে গেছে তা নিজেই বোঝে না। আশ্চর্য! স্বামিজীও যেন কাঠিন্যের শীলাসন থেকে নেমে এলেন অমনি। নেমে এলেন নির্গলিত সুধা সাগরের পারে।

নিবেদিতার মন ভক্তিতে ভরপুর। গুরুর দায়িত্বটা বেড়ে গেল। আর অন্তরালে থেকে নয়। একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালেন। তুলে ধরলেন আলোর আকাশ প্রিয় শিষ্যার চোখের সামনে। এ যেন উন্মোচন। একটা নবতর উদ্ঘাটন।

আলমোড়া ছেড়ে এলেন। কাশ্মীরের উপল বন্ধুর পথ অতিক্রান্ত হলো। জুনের প্রথমে তাঁরা যাত্রা করলেন কাঠগোদামের পথে! প্রকৃতির রুদ্রমূর্তি। দেহের চামড়া খসে যেতে চায়। ওঃ, সে কি দুঃসহ গরম।

নিবেদিতার খেয়াল নেই। দেহ-বোধের মমতাও যেন সমতার স্পর্শে মুছে গিয়েছে। ক্লান্তির কোলে মাথা রেখেও ওর তৃপ্তির অন্ত নেই। 'আমিটির' মৃত্যুতে যে অন্তরের দেখা সে পেয়েছে সেখানে কষ্টকে কষ্ট কেউ বলে না। দুঃখকে মনে করে প্রত্যক্ষ ভগবান। যেন সবচাইতে বড় কুটুম তার। দেহ-বোধ ততক্ষণই মাতামাতি করে, যতক্ষণ না হৃদ্-মনের দেখা মেলে। তা পেলে কে আর পড়ে থাকে কাঞ্চন ছেড়ে কাচ নিয়ে? সে কনককান্তি সব ভ্রান্তির সমাধান করে দেয়। নিবেদিতা সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করে দিল নিজেকে। ঘুঁড়ি ভোকাটা হয়ে গেল আর কেউ পিছু টানবে না। এবারে অনন্তের অভিসার। অফুরন্তের আনন্দ।

পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে ওদের চোখে পড়ে হনুমানের দল। কখন বা আক্রমণ করে বসে। বিপদের মধ্যে শুধু এই। তা না হলে আর কি! শ্যাম সবুজ বনানীর সৌম্য মূর্তি। যেন স্নেহের অঙ্ক বিছিয়ে দিয়েছে মায়ের মত। তারই মধ্য

দিয়ে পথ। ওরা এগিয়ে চলে। দু' চোখ ভরে দেখে প্রকৃতির শোভা। মনটা ভারি খুশী লাগে। 'জয় হনুমানজী কি জয়' বলে কুলিরা হেঁকে চলে। মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম করে। অবশেষে তাঁবু ফেললেন তাঁরা ভীমতাল হ্রদের প্রান্তে। পুরো দিনটাই রইলেন সেখানে। স্বামিজী গল্প বললেন, গল্প বললেন ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম জগৎ সম্বন্ধে—নানা কথা।

সত্য, এ-এক বিচিত্র দেশ। বিচিত্র এখানকার প্রকৃতির লীলা। নগাধিরাজ হিমালয়ের পানে তাকিয়ে স্বামিজীর মন আবছে আবেশে ভরে ওঠে। ভক্তি বিনম্র চিত্তে ওদের কাছে বলতে থাকেন এই হিমগিরির মাহাত্ম্য। এর প্রতিটি বালুকণা ধরিত্রীকে দিয়েছে পবিত্রতার পূত মন্ত্র। শিখিয়েছে জীবন-সত্যকে সন্ধান করতে। হিমালয়, দিগন্ত বিসারী হিমালয়। তাঁর কোটরে কোটরে আজও কত যোগী যোগ যুক্ত হয়ে আছেন। কত সাধু-মহাপুরুষ প্রাণশক্তির পাথেয় আহরণ করতে এসে মজে আছেন তৎপুরুষের তনুশোভায়। তাদের হিসেব কেউ রাখে না। তাদের বয়স কেউ জানে না। নাম, ধাম, গোত্র বলতে কেউই কিছু পারেনি সন্ধান করতে। তাঁরা ঈশ্বর দর্শনে বিভোর। অমৃত আস্বাদনে তন্ময়।

সকলে শুনছিল বসে। স্বামিজীও কথা বলতে বলতে একরকম আত্মস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ পীঠস্থানে এসে মন যে আপনি যোগযুক্ত হয়ে যায়। হৃদ-মাধুরীর স্পর্শে জীবন্ত হয়ে ওঠে প্রসুপ্ত চেতনা। তখন কি আর ঘর বার দুই থাকে? থাকে কি আর তুমি, আমিতে প্রভেদ?

কাঠগোদাম থেকে ট্রেন ছাড়ল। এলো লাহোর—লুধিয়ানা ছেড়ে রাওলপিণ্ডি। এখানে এসে স্বামিজীর সঙ্গে মেয়েরা তিনজন বৈ আর কেউ রইলেন না। মুরীতে চললেন টাঙ্গায় করে। বেশ লাগে। ওপরে নীল আকাশ। দৃষ্টির দিগন্তে পাহাড়ী পথ। সবুজ বন। আর নিম্নে ঝিলামের খাড়া খাদ। টাঙ্গা এতক্ষণ বেশ বেগে চলছিল। কিন্তু ঝিলামের পারে এসে মন্থর হলো তার গতি। পথ পিচ্ছিল। বর্ষণ হয়ে গিয়েছে প্রচণ্ড। আর পথ চলতে না পেরে আটকা পড়লেন ডুয়ালিতে। উচ্ছল নদী। দ্রুত বেগে চলেছে বন্যার গতিতে। ওখান থেকে বারামুল্লা এলেন। শুরু হলো নদীপথ। নিঝুম দেশ। যেন সমাহিত হয়ে বসে আছে কার আশায়। নৌকা পারে লাগল। স্বামিজী মেয়েদের বললেন—গায়ে হেঁটে দেখবার জন্যে। স্বামিজীও অতলায়িত হয়ে যান ধ্যানের গভীরে।

শ্রীনগর এসে আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন স্বামিজী—আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। কাশ্মীরের মহারাজা ডাকলেন স্বামিজীকে তাঁর গ্রীষ্মাবাসে।

লোকের ভীড় ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে। নির্জন অভিলাষী স্বামিজী তাদের সঙ্গে কথা বার্তা বলেন বটে। কিন্তু নিবেদিতার মনটা সর্বদার জন্যেই কাঁপে থর থর করে। এ যেন স্বামিজীর বহিরঙ্গ বিকাশ। অন্তরের যোগাযোগ হয়ে গিয়েছে অমরনাথের ত্রিগুণাতীত শঙ্করের সঙ্গে। যেন তিনি ডাকছেন, ও রে আয়, আয়! —বলে। ব্রহ্মজ্ঞ বিবেকানন্দ এতদিন প্রচার করেছেন অদ্বৈতের বাণী। কিন্তু আজ তিনি প্রেমপিপাসুর মত দেব-দেবীর সান্নিধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে পারলে যেন অনেক খুশী হতে পারেন। আজ তিনি সর্ব রূপের সর্ব বিভূতির উপাসক।

আমেরিকান মহিলাদের নিয়ে গুলমার্গে এলেন স্বামিজী। এখানে এসে স্বামিজীর মধ্যে প্রকাশ পেল ধ্যানের রূপ। বাহ্যিক বিকাশ যেন আর তেমন নেই। অন্তর গহনের গভীরে আত্ম সাক্ষাতের মধুর মাদকতায় চোখে মুখে নেশার ঘোর। সেখান থেকে অমরনাথের পথে রওনা হলেন। পাহাড়ী পথ। তারপরে বরফের সমতল। হিমের রাজ্যে যেন আগুন লেগেছে। ধোঁয়ায় আদিগন্ত অবলীন। তারই মধ্যে যোগীরাজ অমরনাথের অভিসারে বিরহীর মত ছুটছেন। কিন্তু পথের দুর্গম বাধা দিল। আসতে হলো ফিরে। ফিরে আসতে হলো সে অভিযান থেকে। তবুও তন্দ্রা কাটে না। চোখের তারায় সেই রূপাতীত পুরুষ যেন প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছেন। অন্তরে জাগিয়েছে অতৃপ্তির ক্লিষ্টকান্না।

দিন কয়েক পরের কথা। জুলাই মাসের অর্ধেকটা কেটে গেছে। ওঁরা চলে এলেন ইসলামাবাদ—নৌকায় করে। থামল নৌকা, থামল পন্ধরনামে। এখানে ভাঙ্গা মন্দির দেখবেন স্বামিজী। দেখবেন সন্তান ও জননীর পাষাণ মূর্তি। একদিকে বুদ্ধ, আরেক দিকে জননী মায়াদেবী। নিবেদিতাও প্রবেশ করল মন্দিরে। গুরুর পিছু পিছু চলল এগিয়ে। স্বামিজী তখন ভাবের দাস। ধীরে ধীরে সেই মূর্তিতে হাত বুলাতে লাগলেন। সাধকের স্পর্শে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে মূর্তি। ঠিকরে বের হয় দেহ-দ্যুতি। দেবতা ও মানুষে এখানে কত অন্তরঙ্গতা। যেন একে মিলে দুই। দুইএ মিলে এক। অপরূপ তনুবিলাসের এ এক অতনু প্রকাশ। সে আনন্দস্পর্শে যোগী, গুরু ও সাধক অতলায়িত হয়ে যান। তাঁদের অন্তরাসনে যেন এই সব শিলা-মূর্তি একটু বসবার জন্যে ব্যস্ত। যেমন সাধকের আকুতি, তেমনি ঈশ্বরের প্রকাশ। যেমন আধার, তেমন বসতি-প্রীতি।

একটি ফুল ছিঁড়লেন স্বামিজী। অর্ঘ্য দিলেন বুদ্ধের চরণে। বললেন, "হে মৃত্যুঞ্জয়ী জিন, তুমি আমার সহায় হয়ো।"

পলক পড়েনা চোখের! তাকিয়ে আছেন বুদ্ধ-মূর্তির পানে। কি ভাবছেন স্বামিজী? কিই বা দেখছেন এমন নিবিষ্ট চিত্তে?

ভাবছেন বুদ্ধ-যুগের কথা। আর দেখছেন, মানব রূপী দেবতার দয়ার্দ্র অন্তর। ভাবের আবেশে স্বামিজী অনেকগুলো কথা বলে ফেললেন, বলে ফেললেন নিবেদিতার কাছে—"মনে রেখো, অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম যা চেয়েছিল দিতে, তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না পৃথিবী। কিন্তু এবার সে তৈরী। যত মানুষ এসেছে পৃথিবীতে, বুদ্ধ তাদের সবার চেয়ে বড়। তাঁর একটি নিঃশ্বাসও নিজের জন্যে পড়ত না। প্রতিষ্ঠার মোহ ছিল না। চান নি কোন পূজা। এইটাই তো সবচাইতে বড় কথা। গ্রহণ করেছেন গণিকা অম্বপালীর আমন্ত্রণ। পরিণামে মৃত্যু জেনেও খেয়েছেন তিনি পারিয়ার সঙ্গে। এমন বুদ্ধি আর হৃদয়ের সমন্বয় আর চোখে পড়ে না।"

শেষ হলো পদ্মরনামের মন্দির দর্শন। এবারে যাত্রা করলেন অবন্তীপুরের দিকে। সেখানেও মন্দির দর্শনের স্পৃহাই তাদের অন্তরকে ডাকল। অবন্তীপুর থেকে বিজবেনার ও মার্তণ্ড-মন্দির হয়ে আবার যাত্রা করলেন সেই হিমময়-হিমশুভ্র অমরনাথের অধিপতির উদ্দেশ্যে।

ডাক এসেছে।

জীবনের সায়াহ্ন থেকে এবারে লাভ হবে সাযুজ্যের সকাল। অন্তরবন্দী আক্ষেপের মৌন কণ্ঠ পাবে অভিব্যক্তির ভাষা। স্বর্ণালী গোধূলীর কুঞ্জ থেকে আহরণ করবে প্রভাতের কুসুম। আর কি সবুর সয়?

স্বামিজীর মাথায় যেন প্রবল চাপ। চিন্তাচ্ছন্ন ভাব। কিন্তু তার মধ্যেই একটা দুর্বোধ্য রহস্যের লুকোচুরি খেলা। এমন চিত্ত সমাহিতির দিনে নির্জন পরিবেশ, কে না চায়? কিন্তু তা আর হয়ে উঠল কৈ? জনতার অবিচ্ছিন্ন মিছিল। এ যেন সত্যি স্বামিজীর কাছে অসহ্য বলে মনে হয়। মন চায় দণ্ডী হয়ে পথে নামতে। নিবেদিতাকে বললেন তাই, "ডাক শুনতে পাচ্ছ না? তৈরী হয়ে নাও। যাবার সময় হয়েছে।"

পাহাড়ী পথ। দুর্গম। বন্ধুর। কিন্তু যাত্রীদের তা বলে ক্লান্তি নেই। তাদের কণ্ঠে কারুণ্য প্রার্থনার সঙ্গীত। অন্তর দেবতার স্তুতিপাঠ।

একাদশীর পরের দিন। নিবেদিতা যাত্রা করল, যাত্রা করল স্বামিজীর সঙ্গে। অন্যান্য যাত্রীরা আগেই চলে গেছে। এবারে ওঁরা দুজন অমরনাথের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালেন।

দূরে দূরে যাত্রীদের মিছিল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা। নিবেদিতা সবই দেখছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে তাদের কণ্ঠ নিঃসৃত শিবধ্বনি। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে নিবেদিতা—"জয় শঙ্করকী জয়! জয় শিবকী জয়।"

ওর মনটা একটু সাহস পায় যেন। তাকায় ফিরে স্বামিজীর পানে। তাঁর কি আর বাহ্যিক খেয়াল আছে? পাল্কিতে বসে বসে নিবেদিতা দেখতে পায়—দেখতে পায় স্বামিজীর ভাবে হারা অবস্থা।

হাতে জপের মালা। যেন তার মধ্যে ডুবে গিয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর সে তদ্‌গত ভাবকে ভেঙ্গে দিল যাত্রীদের ঘন গুঞ্জন। প্রতিবাদের আরজি পেশ হলো স্বামিজী সমীপে। বলল যাত্রীদের কেউ কেউ, বলল বিদেশী মেয়েদের কটাক্ষ করে,—"মহারাজ, এদের যাত্রীদলে স্থান দেওয়ার ক্ষমতা আপনার থাকলেও তা কি দেওয়া ঠিক হবে?"

এ প্রতিবাদকে প্রত্যাহার করতে হবে কৌশলে। তাই করলেন স্বামিজী।

তাঁবুতে ঘুরে ঘুরে নিবেদিতা ভিক্ষা দিল সবাইকে। যারা ভিক্ষা গ্রহণ করল, তাদের কাছ থেকে নিবেদিতা কুড়িয়ে আনল আশীর্বাদ। ক্রমে প্রতিবাদকারীদের কণ্ঠও নীরব হয়ে এলো।—হোক না বিদেশী। ওরা যে সকলের বোন। যাচ্ছে তো শিবাশিস আনতে তাঁদেরই মত!

পহলগামে এসে যাত্রীরা থামল। সেখান থেকে চন্দনওয়ারিতে।

এবারে পথ দুর্গম। আর পাল্কি নয়—এবারে পায়ে চলার পথকে পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করবে নিবেদিতা এই যেন স্বামিজীর ইচ্ছা। অথচ পাহাড়ী পথ! তুষার জমে হিম হয়ে আছে। পিচ্ছিল। এ পথে একজন বিদেশী যে কেমন করে হাঁটবে তা বুঝেই পায় না নিবেদিতা। কিন্তু তা বলে চেষ্টার বিরাম নেই। ওদিকে যাত্রীদের কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শ্বাসকষ্টে অবশ হয়ে যাচ্ছে দেহ। তা' বলে বিশ্রাম নেই। দুরন্ত আবেগে মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে তারা। নিবেদিতার চোখে যেন ঘোর ঘনিয়ে আসে। পথ চলছে সে-ও। কন্‌কনে ঠাণ্ডা। দু'কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ হচ্ছে। চোখ দুটো যেন চাইছে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে। লাল—রক্তজবার মত আরক্তিম।

শ্রান্তির কোলে দেহ এলিয়ে দেবার অবকাশ নেই। নেই সে ইচ্ছাও নিবেদিতার। এ ক্লান্তির শেষে যে পুরস্কারই মিলুক না কেন, নিবেদিতা গ্রহণ করতে পারবে তা সাদরে।

যদি মৃত্যু আসে?

হাসিমুখে পরাবে তার কণ্ঠে পাহাড়ী ফুলের মালা। তবুও পথ চলবে সে। যাবে এগিয়ে। এগিয়ে যাবে অমরনাথের তীর্থাধিপতির কাছে।

যদি তন্‌হা অন্তরে জাগে, তবে দেহ ক্লান্তির বোধ থেকে মানুষ যায় নির্বোধ হয়ে। আবেশে অবশ তনু তখন কেবল ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধানেই মন্ময় হয়ে পড়ে। নিবেদিতারও তাই হলো। একটা কথা, একটা প্রশ্ন তার সারাটা মনকে জুড়ে বসল।—কি দেখব গিয়ে অমরনাথে?

সত্যি-ই তো।

কি পাবার প্রত্যাশায় এই দুর্গমের অভিযাত্রা? কিজন্যে নিবেদিতা এ ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের অধ্যায়কে আপন করে নিতে ভালোবাসল? এর অন্তর গূঢ় রহস্যের কিছু অধিগত হয়েছিল নিবেদিতার। একথা সে নিশ্চিতই বুঝতে পেরেছিল —যা কিছু এখনও অবশেষ আছে, অমরনাথে গিয়ে সেটুকুনও করতে হবে উৎসর্গ। মানে আমিত্বের পূর্ণ নির্বাসন হবে শিব সান্নিধ্যে।

পথে চলতে চলতে নিবেদিতা শুনতে পেল গুরুর কণ্ঠ—"শিব, শিব! তোমার নিত্যদাস আমি। জন্মের পরে তোমার মন্দিরেই মা আমাকে শুইয়ে এসেছিলেন। নাম রেখেছিলেন বীরেশ্বর। আমি শুধু তোমার ডাকেই পথ চলি। সারা বিশ্বে যেন দেখতে পাই তোমারই প্রকাশ—এই বর দাও।"

এ অন্তরার্তির প্রতিটি ধ্বনি নিবেদিতাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। তার মনটা তৃপ্তির সুধায় ভরে যায়। পা টেনে টেনে এগিয়ে চলে সে। যাত্রীরা যেন মত্ত হস্তীর মত হয়ে গিয়েছে। আর তেমন দূরে নয়। মাত্র কয়েকটা মাইল।

কিন্তু স্বামিজী ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। সবাই তাঁকে ফেলে গেল এগিয়ে। শরীর যেন অচল। তবু মন দূর নভে ধায়। সুর হয়। কান্না জাগে। নব শক্তির উত্তম গতিবেগে শ্লথ পদসঞ্চার ত্রস্ত হয়। আবার পথ চলেন স্বামিজী। আর কয়েকটা ঘন্টা তার পরেই সেই পরমজনের দর্শন মিলবে।

২রা আগষ্ট। রাত।

হাঁটছেন স্বামিজী হিমগিরির দুর্গম পথে। আপন মনে কথা বলছেন যেন তামসী রাত্রির সঙ্গে—হে রাত্রি, তুমি সমাহিত হয়ে আছ অফুরন্তে। আমার যাত্রাও তাঁকেই উদ্দেশ্য করে। সীমার মাঝে যিনি অসীম, খণ্ডে যিনি ব্রহ্মাণ্ড—আমি চলেছি সেই শিব-সন্ধানে।

উপলাকীর্ণ পথ। রাত্রির শেষ যাম। আকাশের পূর্বভালে আরক্তিম ছটা। পড়েছে আলোর আলপনা। দু-একটা পাখী ডেকে যায়। অরুণোদয়ের আভাতি ঘটে। কেটে যায় তুষার তন্দ্রা। পথ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

যাত্রিদল চিৎকার করে উঠল।

লাগল চমক। ফিরে তাকায় সবাই। তাকায় ঐ দূরে বহু দূরে অমরনাথের তীর্থ গুহার পানে।

স্বচ্ছ ঝর্ণার ধারা বইছে অবিরল। স্বামিজী নামলেন। বললেন নিবেদিতাকে—"স্নান করতে যাচ্ছি।"

নিবেদিতা এলো তাঁর পিছু পিছু। স্নান সমাপন হলো। এবারে দর্শন-শান্তির পরিতৃপ্তি। ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি।

শ্রীশ্রীঅমর নাথ।

সমস্ত শরীর কাঁপছে স্বামিজীর। নাড়াতে এসেছে অবাধ্য চাঞ্চল্য। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে চায়। আবেগ বিহ্বল স্বামিজী। অর্ধনগ্ন শরীর। ভাবের পাগল

প্রবেশ করলেন গুহার মধ্যে। প্রণাম করলেন ভক্তি বিনম্র চিত্তে। বসলেন ধ্যানে। নিবেদিতা তাঁরই পার্শ্বে স্তব্ধ শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে।

ধ্যান স্তিমিত নেত্র। অশ্রুর ধারা নামে অঝোরে। এ কিসের কান্না? কান্না নয়—কানাকানি। অগম্যকে পেয়েছেন ধ্যানে। দেখছেন প্রকাশাতীতের তনু শ্রী। বিশ্বনাথ এসে ধরা দিয়েছেন ভক্ত-কণ্ঠের আকুল আর্তিতে। তাইতো চোখে আনন্দের ঢল নেমেছে স্বামিজীর।

বিলুপ্ত চেতনা। কিন্তু মুখে মাখা প্রশান্ত স্নিগ্ধতা। মুদিত নয়ন—তবুও যেন মনে হয় এদুটি ফুটন্ত উৎপল। নিবাত নিষ্কম্প দীপ শিখার মত প্রশান্ত। এক অনির্বচনীয় আনন্দের লহরে আত্মলীন।

এমন তো হবেই !

আধারে আরাধ্য এলে আবেশ হয়। মানুষের দেহকে আশ্রয় করে যখন ঘটে দেবতার আবির্ভাব—তখন লাখো কোটি বিদ্যুৎ তরঙ্গে দেহ বোধ আর থাকে না। তখন সে ভাবের পাগল। তন্ময়তার তীর্থে তপোধনের সঙ্গে তীর্থঙ্কর হয়ে যায়।

স্বামিজীরও হয়েছে তাই।

শিব ভাবতে গিয়ে নিজেই শিব হয়ে গেছেন।

ধ্যানীর ধ্যানের মূর্তি বিভাসিত হ'লে—
ধ্যানী ধ্যেয়ে ভেদ ঘুচে যায়—
চৈতন্যের পূর্ণচন্দ্র হৃদয়ে উদিলে
ভক্তে এসে ভগবান আপনি মিলায়।
তখন থাকে না ভেদ
থাকে না বেদন খেদ
ভাব মুখে থাকে ভক্ত হয়ে ব্রহ্মময়
ধ্যানী ধ্যেয়ে ভেদ ঘুচে যায়।

অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হলো। ধ্যান ভাঙ্গল স্বামিজীর। কিন্তু নিবেদিতার অন্তর দহনের পরিসমাপ্তি নেই। এ জ্বালা যে অসহ্য। কি পেল সে। যাকে অন্তর-মন সবকিছু উৎসর্গ করে দিয়ে নিবেদিতা আজ ফকীর হলো—তিনি যে একাকিই ভোগ করলেন উপলব্ধির আনন্দ। প্রাপ্তির স্পর্শ। ঝলসে উঠল নিবেদিতা। গুরুর কাছে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ল। তিক্ত কণ্ঠে এ একক আনন্দকে বিকৃত করল সে। কিন্তু স্বামিজী তাতে এতটুকু রুষ্ট হলেন না। সস্নেহে হাতখানা ধরলেন তিনি নিবেদিতার। শ্রান্ত বালক যেন। প্রশান্ত নয়নে অবুঝের মত তাকিয়ে রইলেন

নিবেদিতার মুখের পানে। নিবেদিতার ভেতরটা কেঁদে উঠল। চাপা কণ্ঠে বলল সে—"কেন···কেন? আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

একটা হোম-বহ্নির তীব্র দহন জ্বলছিল তখন স্বামিজীর বুকেও। এবারে নিবেদিতার কাছে কাছেই আছেন স্বামিজী। কোন কথা বলতে পারছেন না। পথ চলছেন দুজনে নীরবে। নিবেদিতার চোখের জল তখনও থামেনি। নির্বাপিত হয়নি প্রশ্নের অগ্নিশর, কেন? কেন আমি কিছুই পেলাম না?'

স্বামিজী আর কথা না বলে পারলেন না। কি যে হয়েছিল, কোথায় যে গিয়েছিলেন তিনি অতলায়িত হয়ে তা কি তিনিই জানেন? এবারে প্রিয় শিষ্যার ব্যাকুল মনের কাছে ধরা না দিয়ে সাধ্য কি তিনি থাকেন? তাইতো বলতে হলো নিবেদিতার পানে তাকিয়ে—"মার্গট, তুমি যা চাইছ তা দেবার শক্তি আমার নাই। এখন কিছুই বুঝতে পারছ না। কিন্তু তীর্থকৃত্য শেষ করেছ তুমি, এর কাজ ভেতরে ভেতরে হবেই। কারণ ঘটলেই দেখা দেবে কার্য সব বুঝতে পারবে তখন। এর ফল ফলবেই······"

যোগী যখন যোগ যুক্ত হয়ে যান, তখন তিনি নিষ্ক্রিয়। আপন সত্তা থেকে বিযুক্ত। কি করে দান করবেন। কি করে তিনি অদ্বয় সত্যের স্ফুরণ ঘটাবেন অন্যের হৃদয়ে। তা হয় না। তখন নিতে হয়। করতে হয় আহরণ। তা যে সাধন লব্ধ ধন। শক্তি সাপেক্ষ বস্তু। ব্রহ্মজ্ঞ যতক্ষণ জীবসত্তা থেকে বিমুক্ত—ততক্ষণ তিনি তন্ময়। সমাহিত। সমাধিমগ্ন। যেই জীবসত্তায় ফিরে এলেন, অমনি মহাবোধের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। ব্রহ্মাণ্ড এসে আশ্রয় নিল খণ্ডে। অসীম এল সীমায়। অরূপ এল রূপে। তখন ঘটে শক্তির সগুণ প্রকাশ। দেওয়া নেওয়ার পালা চলে।

জীবন-যুক্ত সত্যের সঙ্গে মিলন হলো মহামনের।

একটু প্রশান্ত হলো নিবেদিতার বিক্ষুব্ধ চিত্ত। ক্ষণ-মৃত্যুর মধুর স্পর্শে কোথায় যে তলিয়ে যায় সে তা নিজেও জানে না। কিন্তু সে আবেশ তো ক্ষণিকের। তাই ফিরে এসে আবার ব্যক্তিব্যূহে প'ড়ে মনটা যেন কেমন করে। তবুও চেষ্টার বিরাম নেই। এলোমেলো চিন্তাগুলোকে সংযমের অবরোধে ফেলে মনমুখী হ'তে চেষ্টা করে নিবেদিতা। কিছুদিন পরে নেল হ্যামণ্ডকে লিখে জানায় নিবেদিতা—লিখে জানায় তার অন্তরের দীন আর্তির সংবাদ—"এখনও সে সময়ের কথা ভাবতে পারি না। মনটা যেন আশাভঙ্গের যাতনায় যেতে চায় তলিয়ে। কিন্তু এ সবই আমার ভুল। তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার অপরাধ মার্জনা করেছেন আমার 'রাজা'। এই তীর্থযাত্রার মধ্য দিয়ে আমি যেন তাঁর এবং দেবতার ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছি আরও। কিন্তু তা রাখতে পারলেম কৈ? সুযোগ হাতে এসেও হারিয়ে গেল। হয়ত তা কখনও আর ফিরবে না। এ ব্যথা বিস্মৃত হওয়া যায় না। রুষ্ট হয়েছিলাম গুরুর উপরে। যা তিনি বলতে যাচ্ছিলেন তা অবজ্ঞায় করেছি অবহেলা। যদি এমন করে বেসুরা না বাজাতাম সেখানে! একটু মমতা, একটু ধৈর্য নিয়ে যদি তার ভাবের ভাগ নিতাম! যা করেছি তা সুদূরে নেবার উপায় আর নেই। সান্ত্বনার বলতে শুধু এই, এতে কেবল আমারই ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সে যে অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁকে খোঁটা দিয়েছি। আঘাত করে এমন কথাও বলেছি যে, তাঁকে আমি 'আচার্য' বলে ডেকেছি। এই ডাককে যদি না পারেন তিনি সত্য ও সার্থক করে তুলতে, তাহলে আমাদের মধ্যে সাধারণ দুটি নরনারীর সম্বন্ধ বৈ আর কোন সম্বন্ধই থাকতে পারে না। পরের দিন যথাস্থানে পৌছলাম। রাজা বললেন, "মার্গট, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস নই।" আত্মবিস্মৃত দীনভক্ত বলেই তিনি মানব। পূর্ণ মানব। এমন আর কোথাও দেখব না।" (৭ই আগষ্ট ১৮৯৮)।

মনটা এখনো কাঁদে। ভুলের মরুতে অতীত দিনগুলো জোনাকির মত জ্বলে। নিবেদিতা সইতে পারে না তা। প্রাণ পঞ্জরের মধ্যে একটা তীব্র বেদনাবোধের জ্বালায় মাঝে মাঝেই একাকী বসে চোখের জল মোছে।

শ্রীনগর থেকে বোট এলো নির্জন খাড়িতে। দুদিনের বিশ্রাম, শিব সোহাগে স্বামিজী এখন শিবময়। নিয়তই সেই ধ্যান সেই মনন। ভাবের ঘরে বসে প্রত্যক্ষ

করেন সুন্দরের তনুশ্রী। জীবন মন জুড়ে শিব-শক্তির দিব্য প্রকাশ। সাধন সমুদ্রের এই অতল গহ্বনে যেতে পারলে সাধক আর মুখ ফেরাতে চায় না। তাঁর সমস্ত সত্তায় তখন প্রশান্তির হিমস্পর্শ লাগে। তিনি তন্ময়ের মত তন্মনস্ক হয়ে পড়েন। নিত্য মৃত্যুর ধ্যানে আপনাকে লয় করে দিতে চান।

কিন্তু স্বামিজীকে আবার ফিরে আসতে হলো—ফিরে আসতে হলো মায়াময় ছায়া বিশ্বের অঙ্গনে। মানুষের কান্নাকে পারলেন না করতে উপেক্ষা। রিক্ত মন সিক্ত হলো। অশ্রু ঝরল দুনয়নে। হাহাকার করে উঠল অন্তর। অমরনাথের স্মৃতি তবুও মনকে নিয়ে যায় মধ্যাহ্নের মরুদহন থেকে প্রশান্তির ছায়ালোকে। সে মনটাকে সজোরে চেপে ধরেন স্বামিজী। বলেন—"অমরনাথের শিব আমায় ইচ্ছা মৃত্যুবর দান করেছেন।" আবার বলেন—"মা, মা, আমায় কোলে নে গো, তোর হাসিমুখ একবার দেখি……" এবারে অসীম থেকে নেমে এলেন সীমায়। ধরলেন আঁকড়ে মাতৃঅঙ্ক। এ যেন শিশুর ক্রন্দন। আবদারের কণ্ঠ। কখনও বা গুমরে ওঠে মন। বলেন, "মা, তোর ছেলেকে দেখ!"

আবার বলেন—"শিব যেন অষ্টপ্রহর মাথায় চেপে বসে আছেন। নামতে চাইছেন না।"

এই অতনু রূপের সমারোহ তাঁকে যেন পাগল করে দিল। শাক্ত শক্তির বিকাশ ঘটল অন্তরে। বিদ্রোহীর আত্মায় ধরে গেল আগুন। মায়া-বিশ্বের প্রতিটি জীবকে দর্শন করতে লাগলেন বিচিত্ররূপে। নারীর মাঝে দেখলেন মায়ের অরূপ প্রকাশ। মুসলমান মাঝির ছোট্ট মেয়েকে করলেন প্রণাম। দেখলেন তার মধ্যে উমাকে। চাকর, বাকর, শিষ্যদের ভেতরকার রূপ দেখে হলেন বিমুগ্ধ। এযে জীবাধারে 'শিব স্বয়ং সমাহিত। বিস্ময় বিমুগ্ধ আত্মায় বিবেকানন্দ সর্বজীবের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন, বিলিয়ে দিলেন সেবক বেশে। আচ্ছন্ন উন্মত্তের মত পথ চলেন স্বামিজী। মনটা যেন সমুদ্রসম্ভবা। প্রলয়ের লগ্ন সঞ্চারী। নিজের ভারে নিজেই অস্থির। অবশেষে ভাব এসে সংহত হলো ভাষায়। বিবেকানন্দ লিখলেন—'কালী দি মাদার'।—

"লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর, দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে মৃত্যুরূপা মা আমার আয়।
করালি! করাল নাম তোর মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে—
তোর ভীম্ চরণ নিক্ষেপে প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী তুই প্রলয়-রূপিণী, আয় মাগো আয় মোর পাশে।"

নিবেদিতাকে কাছে ডাকালেন স্বামিজী। বললেন স্নেহবিগলিত কণ্ঠে—"মাকে "আপনা থেকে যেমন অমঙ্গলের মধ্যে, আতঙ্কের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, ধ্বংসের মধ্যে, তেমনি যা কিছু আনন্দ ও মাধুর্য দেয়, তার মধ্যেও চিনতে শেখ।……মৃত্যুর ধ্যান করো। ভয়ঙ্করের পূজা করো। কেবল ভয়ঙ্করের পূজার মধ্য দিয়েই ভয়ঙ্করকে জয় করতে পারো, অমরত্ব লাভ করতে পারো।……যন্ত্রণার মধ্যেই আনন্দ থাকতে পারে। মা-ই স্বয়ং ব্রহ্ম, তাঁর অভিশাপও আশীর্বাদ। হৃদয়ে চিতা জ্বালাও, সেখানে সকল গর্ব, স্বার্থ ও কামনাকে পুড়ে ছাই করো। তখনই, কেবল তখনই মা আসবেন।"

আসবেন সন্তানকে কোলে নিতে। তার গায়ের ধূলো ঝেড়ে দিয়ে আবদ্ধ আলিঙ্গন করতে। তাই করল নিবেদিতা। তার দিবসের চিন্তা রজনীর নিদ্রা মাতৃ আরাধনায় জেগে রইল। মা মা বলে আদিগন্তে ছড়িয়ে দিতে লাগল অন্তরের অজস্র আকুলি।

এদিকে কাশ্মীরে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। সরকার হুকুম দিল না। নিবেদিতার ব্যক্তি চেতনায় ঝড় জাগল। বারে বারে দেখা করতে লাগল রেসিডেণ্টের সঙ্গে। আলাপ করল আমেরিকান মহিলাদের কন্‌সালের কাছে গিয়ে। কিন্তু ফল হলো না কিছু। নৈষ্ফল্যের অন্ধকারে প্রলীন হয়ে গেল আশার অর্ণব। স্বামিজী একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। মনটা আবার উদাস হয়ে গেল। স্থির করলেন সিদ্ধান্ত। এবারে একটু দূরে চলে যাবেন। জগদ্ধাত্রী জগজ্জননীর পূজায় আত্মনিবেদন করবেন ক্ষীরভবানীর মন্দিরে।

৩০শে সেপ্টেম্বর। যাত্রা করলেন স্বামিজী। নিষেধ করে গেলেন কেউ যেন তাঁর সঙ্গে না যায়। পূজা সমাপনান্তে ফিরে এলেন তিনি। ফিরে এলেন ওদের মাঝে। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে এবারে নিয়তই রণিত ধ্বনিত হতে লাগল মাতৃমন্ত্র। নিবেদিতা তাকিয়ে থাকে, তাকিয়ে থাকে উন্মাদ সাধকের সাধন সিদ্ধির প্রকাশ মহিমার পানে। কান্ পেতে শোনে—"মা···মা···মাকে ডাক। তুমি তাঁরই, তুমি ডাকলে তিনি আসবেন। কিন্তু তিনি তোমায় গ্রহণ করবার আগে নিজেকে প্রস্তুত কর তাঁকে সহ্য করবার জন্য।"

ছন্দহীন মন, ছন্দহীন চিত্ত।

বাইরের জগতের সঙ্গে তার এতটুকু মিল মেলে না। বহির্বিশ্ব চলছে যে ধারা নিয়ে—নিবেদিতার অন্তর-স্রোত ঠিক তার বিপরীতগামী। শ্রীনগর থেকেই এ ভাবের রসবন্যা নিবেদিতাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে। ক্ষীরভবানী থেকে স্বামিজী ফিরে এসে বলেছিলেন—"সৌর-পুরাণ কথা বা প্রকৃতিবাদ, এ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না দেবপ্রতিমার। শুধু অকৃত্রিম ভক্তিতেই এ ধারণা সম্ভব।"

এ সত্য শুধু শ্রবণ-বিহ্বলতাই নিবেদিতার কাছে বয়ে আনেনি। আজ সে অন্তর দিয়ে সত্য যে স্বপ্রকাশ তা বুঝতে শিখেছে। যুক্তিবাদ বা প্রকৃতিবাদ নিয়ে একদিন নিবেদিতাও সত্যকে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই ঘটেছে অনর্থ পরাজয়। অবশেষে নিবেদন করতে হয়েছে হৃদয়ের সঞ্চয়কে। চোখের জলের বিনিময়ে লাভ করেছে দুর্লভ ধন। ইষ্ট বিসর্জিত হলো ভিতরকার ভক্তি-গঙ্গায়।

মনটা যেন আর ফিরতে চায় না। যে নতুন জগতের সাড়া এসেছে নিবেদিতার জীবনে—সেখানেই এবারে মজে থাকতে চায় যেন।

কিন্তু না, তা কেমন করে সম্ভব? শিবজ্ঞানে জীবসেবা, জীবপ্রেম এইতো গুরুর একান্ত অভীপ্সা। তাকে এড়িয়ে নয়—আত্মমুক্তি—সেও তো আত্মগত হবারই একক প্রচেষ্টা। মুক্তি কারো একক কিছু নয়। ও বিশ্বজনীন।

জাহাঙ্গীর প্রাসাদের সোপানে দাঁড়িয়ে এ সত্যটা স্বামিজী নিবেদিতাকে যেন নতুন করে বাত্‌লে দিলেন—"তুমি তো তোমার স্কুলের কথা আর তুলছ না"

নিবেদিতার আত্মমন্থনের এ এক নব পর্যায়। ভক্তিযোগে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কর্ম-সমুদ্রে। বিশ্ব-বিভাবিত হয়েছে তাঁরই রূপের ছটায়। জন-প্রাণী, কীট পতঙ্গ সবই যে তাঁর অংশীদার। তাদের সেবা বৈ মুক্তি কি করে সম্ভব? নরকে যদি না নারায়ণ জ্ঞানে পূজো করবার অধিকার অর্জিত হলো তবে যে সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আবার বললেন স্বামিজী—"অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের সম্প্রদায়-প্রবর্তককে দেবাবিষ্ট বলে বিশ্বাস করে, আমরাও তাই করি। কিন্তু আদিগুরু যেমন দেবাবিষ্ট, আমিও তাই, আর তুমিও আমার মত। কাজেই তুমি যা ভাল মনে করবে, আমি তাতে তোমাকে করব সাহায্য এইমাত্র।"

এ কেমন কথা? গুরুবাক্য পালন করাই শিষ্যার ধর্ম। কিন্তু এ যে উল্টো।

অপলক তাকিয়ে থাকে নিবেদিতা। তাকিয়ে থাকে গুরুর মুখের পানে। ঠিক তখনই আবার বললেন বিবেকানন্দ—"তোমার মাঝে শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যে জলন্ত উদ্দীপনা তোমার মাঝে থাকা দরকার ছিল তা নেই। তাকে জাগ্রত কর, শিব! শিব!"

আত্মসাক্ষাৎকার ঘটলে তখন আমি কে, তার প্রমাণ মেলে। তা না হলে দ্রষ্টা যিনি তিনিই কেবল পারেন উদ্‌ঘাটন করতে শক্তিধরের আবৃত বস্তুকে। নিবেদিতার চেয়ে স্বামিজী তার শিষ্যাকে চিনতে পেরেছেন অধিক। দেখেছেন তার মাঝে ব্রহ্মানুভূতির আলো। তাই তো নিবেদিতার কর্মছন্দে গুরুর কোন খবরদারী নেই। আছে কেবল অন্তর ভরা আশীর্বাদ। আর আছে প্রেরণার দুরন্ত তাড়া। ধরাবাঁধা উপাসনার দায় থেকেও স্বামিজী চেয়েছিলেন নিবেদিতাকে মুক্তি দিতে। জমিন এতই উর্বর ছিল যে, তাকে আবাদ করবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। প্রতীকহীন প্রাণ আর প্রতীকহীন শক্তি, এ দুই যে একই তার একটা জ্যান্ত স্বাক্ষর নিবেদিতার অন্তরতীর্থে দৃঢ়মূল হলে আর ভাবনা নেই। তখনই নিবেদিতা বলতে পারবে—

'তুমিও মধু, আমিও মধু
যা দেখি তাই সকলি মধু।'

পৃথিবীটা তখন হয়ে উঠবে মধুময়। সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ সবকিছু একইভাবে অনুভূত হবে ভক্তচিত্তের কাছে। তখনই উপাধিহীন মানুষ নামহীন কর্মী হওয়া যায়।

নিবেদিতাকে নিয়ে স্বামিজী ঘুরে এলেন অমরনাথ থেকে। দুদিন যেতেই আবার মনের দিগন্তে ছায়া পড়ে কর্মময় জগতের। সেখানকার হাসি কান্না, অশ্রু, বেদনা স্বামিজীকে বড় পীড়া দিতে থাকে। নিবেদিতার পানে তাকিয়ে বলেন— "তাঁর নাম জপতে-জপতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কাজে। কিন্তু একটি সত্যকে ধরে রেখ। তা হচ্ছে সবরকম সঙ্কীর্ণতার গণ্ডিকে ভাঙ্‌তে পারলেই প্রচার করা সম্ভব হবে সার্বভৌম শান্তির বাণী। আমার নিজের জীবন চালিত হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রেরণায়। আমার দিশারী তিনি। আর সবাইকে বুঝে নিতে হবে নিজের গরজে, বুঝে নিতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ তাদের পক্ষে কতখানি সত্য ও প্রয়োজ্য। একজন মানুষের কাছ থেকেই প্রেরণা পাবে সমস্তটা জগৎ, এতো আর হতে পারে না।"

কেবল নিবেদিতার বেলাই এ আত্মজাগরণের বাণী বিঘোষণ নয়। নৈনিতালে এক মুসলমান শিষ্যকে লিখলেন—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাস্তবধর্মী ইস্‌লামের সাহায্য ছাড়া বেদান্ত-মত বিরাট মানব-গোষ্ঠীর অধিকাংশেরই কোনও কাজে লাগবে না, বলতে শুনতে সে মত যত চমৎকারই হোক না কেন। মানুষকে আমরা এমন ভূমির

সন্ধান দিতে চাই, যেখানে বেদ, বাইবেল বা কোরান কিছুই নাই, অথচ বেদ, বাইবেল এবং কোরানের সমন্বয় দ্বারাই যেখানে পৌছান সম্ভব। মানুষকে দিতে হবে একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর মন্ত্র। সমস্ত ধর্মই তার বিচিত্র প্রকাশ মাত্র, সুতরাং যে-পথ যার উপযোগী সে তা বেছে নিক। আমাদের দেশেও চাই হিন্দু ও ইসলাম এই 'দুই' প্রস্থানের সন্ধি। ইসলামের ধড়ে বেদান্তের মাথা না জুড়লে এদেশের আশা নাই।"

কিন্তু ক্ষীরভবানী থেকে ফিরে এসে স্বামিজী যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। তাঁর আশায় দৃপ্ত বুক, তাঁর ওজোময়ী ভাষা, তাঁর ভবিষ্যভারতের স্বপ্ন সব যেন কোন অতলে লীন হয়ে গেল। সেখানে আর খুঁজে পাওয়া যায় না জনগণমন অধিনায়ককে। খুঁজে পাওয়া যায় না আচার্য, পরিব্রাজক ভারতভাগ্য বিধাতা বিবেকানন্দকে। তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি অপসারিত হয়েছেন।

এ কিসের ইঙ্গিত?

বহুদিনের সাধনালব্ধ ধনলাভের বহিঃপ্রকাশ এ যে। এমন তো হবেই। গ্রন্থিভেদ হলে সাধক তখন পূর্ণানন্দের অধিকারী। বাহ্যিক জগতের হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ সবই তখন একভাবে বিভাবিত হতে থাকে। নিবেদিতা লিখল—"ইতি হয়েছে স্বামিজীর। চলে গেছেন তিনি চিরতরে। এখন তাঁর মধ্যে শুধু স্নেহ ভালবাসা। অন্যায়কারী বা অত্যাচারীকেও তিনি অসহিষ্ণু হয়ে একটা কথা বলেন না। শুধুই শান্তি; নিজেকে উজার করে দেও, আনন্দে আত্মভোলা। এখন যদি তিনি মৌনী হয়ে চিরদিনের জন্য লোকালয় ছেড়ে যান, আমি এতটুকু আশ্চর্য হব না। তবে এমন করলে সেটা ওঁর আত্মবিলাসেরই নামান্তর হবে, শক্তির পরিচয় নয়। কাজেই আমার মনে হয় এ ভাব উনি কাটিয়ে উঠবেন। কেবল তাঁর বেপরোয়া চলন, তাঁর যুযুৎসা আর আমোদ আহ্লাদ করবার খেয়াল চিরদিনের মতই চলে গেছে, তাঁর জীবনে আর ও-সব ফিরবে না......"

ধ্যানের মন সর্বদার জন্যে তন্ময় হয়ে থাকে স্বামিজীর। নিবেদিতা সতর্ক প্রহরীর মত জেগে থাকে গুরুর শিয়রে। এমনি করে কেটে গেল একটা সপ্তাহ। তার পরে জীবন-যুক্ত সত্যের ঘটল প্রতিফলন। নিবেদিতার জীবনে তার কিছু না দিতে পারলে ওর পূর্ণত্ব প্রাপ্তির পথটা একটু ঝাপসা থেকে যায়। তাই স্বামিজী বললেন একদিন—"তুমি আর আমি, আমরা একই ছন্দের অংশ,—যদিও সে বিরাট ছন্দের সবখানি আমরা জানি না। আমরা যেখানকার উপযুক্ত, ভগবান সেখানকার করেই গড়েছেন আমাদের।"

এবারে দল ভাঙ্গার পালা। নিবেদিতা কলকাতা চলো এলো।

৩৫

জীবন-ছন্দের সুরে এবারে রাগিণীর সমারোহ।

কোলকাতায় এলো নিবেদিতা। উঠল বাগবাজারে শ্রীরাম বাড়িতে। একা। কেউ নেই তার সঙ্গে। কর্ম সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে উত্তোরণের আশ্বাস চাই তো! আশীর্বাদ না মিললে জীবন-জয়ের আশা যে সুদূর পরাহত। এ আলো কেবল তাঁরই জন্যে। আশ্রয় নিতে হলে বড় গাছের তলাতেই। ছায়া-শান্তির প্রশান্তি খুঁজে নেওয়া ভালো।

নিবেদিতা এলো মায়ের কাছে। এ যেন সন্তান খুঁজে পেয়েছে তার মাকে। এই তো ভরসা। এর সাথে তুলনা বা কিসের চলে আর। অন্তরের যোগাযোগ মৌন হলেও বড় মধুর। নিবেদিতার সম্বল বলতে আর কি থাকতে পারে? বিদেশী মেয়ে নিবেদিতা। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ। কায়দা, কানুন এবং আচার বিচার কোনটার সঙ্গেই বা আছে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ? অবিশ্যি আসবার আগে একথা নিবেদিতা একবারের জন্যেও ভেবে দেখিনি। কিন্তু বিপদ হলো শ্রীশ্রীমায়ের। তাঁর ওখানে যে আরও ব্রাহ্মণের বিধবা থাকেন। তাদের মধ্যে নিবেদিতা অপাংক্তেয়। মহা বিপদে পড়লেন শ্রীমা।

গোপলের মা সাত্ত্বিক স্ত্রীলোক। বিধবা, বয়স হয়েছে আশীর মত। সবচেয়ে বেঁকে বসলেন তিনি। নিবেদিতাকে তিনি কিছুতেই চাইলেন না তাঁদের মধ্যে ঢুকতে দিতে। কাছে নেই স্বামিজীও। তিনি বলরাম বাবুর বাড়িতে তখন। নিবেদিতাকে আলাদা ভাবে থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা ভাবা হলো। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য হয়েও গোপালের মা একটি ভীন্ দেশী মেয়েকে সহজ ভাবে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না। এখানে গোপালের মার পরবর্তী জীবনের পরিবর্তিত রূপের কোনই আঁচ পাওয়া গেল না। নিছক একটা বহিরাবরণের খুঁত খুঁতি নিয়ে ঠাকুরের মহান আদর্শকে তিনি অবহেলাই করলেন। যাঁর কাছে ডোবার জলে আর সমুদ্রের জলে কোন প্রভেদ ছিল না, তাঁরই আশ্রিত প্রিয়জনদের মধ্যে ডোবা আর সমুদ্রের জলে প্রভেদ রয়েই গেল।

নিবেদিতা মুখে কিছু না বললেও নিজেকে যেন গুটিয়ে রাখতে সচেষ্ট। মায়ের কাছে সে ভাব গোপন রইল না। যিনি সর্বদর্শী তিনি তো দেখতে পাবেনই। ব্যথা লাগল শ্রীমার অন্তরে। মানুষের জন্মগত অধিকার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাকে অমর্যাদা দেওয়া যায় না। এটা মানুষের কাছে নিতান্তই ছোট মনের পরিচয়। এবং

ঈশ্বরের দরবারেও তা গ্রহণ যোগ্য নয়। কাজেই আদর করে নিবেদিতাকে কাছে টানলেন। সবার মাঝে তার একখানা আসনও পড়ল। অন্য মেয়েদের সঙ্গে তাকেও শুতে দেওয়া হলো। এই পাওয়ার তন্ময়তায়ই নিবেদিতার দিনটা কাট ছিল। তার দাবী নয়—প্রার্থনা ছিল—সবার মত আমাকেও ঠাঁই দিও তোমার চরণ প্রান্তে'।

মায়ের কানে সে কণ্ঠ পৌছল নিবেদিতার। বৈধমার্গের কাঠিন্য নেই মায়ের ভালোবাসার মধ্যে। বাঙলার শ্যাম-শান্ত-ছায়া-প্রচ্ছায়ের মতই শ্রীমার স্নেহের অঙ্ক-পাতা। সেখানে সন্তানের সমান আসন। সমান আব্দার। নিবেদিতাও তা থেকে হলো না বঞ্চিত।

মা—গুমট বাধা পরিবেশটাকে হালকা করে নিলেন—

হালকা করে নিলেন হাসি-স্নিগ্ধ রসাল আলাপনের মধ্য দিয়ে। বললেন একদিন —"অল্প বয়সে আমার একজন শাশুড়ী ছিলেন, এখন নজরবন্দী হয়েছি জন দুই-তিন শাশুড়ীর।" সঙ্গিনীদের মেঘ-জমাট মন ক্রমে হালকা হয়ে গেল। তারাও সহজ ভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করল নিবেদিতাকে।

নিবেদিতাও নিবেদনের আনন্দ থেকে এতটুকু বঞ্চিত করল না নিজেকে। সকলের মত সেও পরল সাদা কাপড়। মাথায় টেনে দিল গুণ্ঠন। সবার হয়ে সেও যে থাকতে চায়। কিন্তু অপরিচিত পরিবেশে নিবেদিতার অন্তর মন জুড়ে থাকে একটা প্রশ্ন। সবকিছুর মধ্যেই সে কি এবং কেন ? এই জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়। একদিন একটি মেয়ে তাকে বললও—"মাকে সাক্ষাৎ দেখেও তোমার সংশয় মেটে না ?"

কত দূর দূর থেকে মাকে দেখতে আসে মেয়েরা। সহজ সরল মা বসেন একটি মাদুর পেতে। সমাগত মেয়েদের কাছে ডাকেন। করেন আশীর্বাদ। আবার কোন তরুণী বধূকে হয়ত করেন তিরস্কার। দেন উপদেশ। ভাবে ভাষায়, চিন্তায় ছন্দে সমস্ত ঘরখানা রূপান্তরিত হয় তীর্থ লোকে।

সপ্তাহে দুদিন ছেলেরা আসে দেখা করতে। যে যার কথা বলেন। মা যেন জীবন্ত সমাধান। প্রত্যেকেই খুঁজে পান যে যার অন্তরের গোপন কথার জবাব। সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার। কেমন করে যেন মা বুঝতে পারেন অপরের মনের কথা। নিবেদিতা নেল হ্যামণ্ডকে একটা চিঠি লিখে মায়ের যথার্থ পরিচয় জানাল, "এ সবকথা শুনে তোমার কেমন লাগবে হয়ত। কিন্তু সকলে বলে এই মেয়েটি ব্যবহারিক জ্ঞান আর সাধারণ বুদ্ধিতে হার মানাতে পারে সবাইকে। যারা তাঁকে সামান্য চেনে তারাও সত্যি তাঁর মাঝে এ সব নিদর্শন পেয়েছে। কোন-ও-কিছু করতে হলেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পরামর্শ নিতেন, এখন শিষ্যেরাও সর্বদার জন্যই মেনে চলেন তাঁর উপদেশ।"

দিনের রেখা মুছে যায় পশ্চিমের রাগরক্তিম আভায়। ধীরে ধীরে নেমে আসে সন্ধ্যা। অভ্যাগতরা চলে যায়। একান্ত ঘরোয়া পরিবেশ ফিরে আসে। মেয়েদের মধ্যে যোগীন-মা সবার চেয়ে শিক্ষিতা মহিলা। তিনি নানা গল্প করেন। পুরাণের কাহিনী টেনে আনেন। কখন বা তা নিয়ে ওদের মধ্যে বেশ একটা রসঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অভিনয়ের ঢং-এ ছোট্ট লক্ষ্মীদি সবাইকে করেন রস পরিবেশন। তার পরে সবাই নীরব হয়ে যায়। নিবেদিতা যাকে বলে—'শান্তির লগ্ন'।

যে যার মত ধ্যানে বসে যায়। আত্ম জনের সন্ধানে তন্ময় হয়ে থাকে। দেব দেবীর পটের কাছে জ্বলে ওঠে প্রদীপ মালা। সারাটা বাড়ি ধ্যান গম্ভীর মাধুর্যে ভরে ওঠে। কেউ বা ছাদের 'পর বসে মুদিত নয়নে প্রাণ-তীর্থের তীর্থাধিপতিকে ডেকে জাগায়। এমনি ধারা দিন কাটতে থাকে।

নিবেদিতাকে শ্রীমা রাখেন নিজের কাছে কাছে। একটা দিব্য স্পর্শে তার মনের মেঘ মুছলেন মা। ধ্যানের মনকে ছুঁয়ে থাকেন। শক্তির সঞ্চার হয় নিবেদিতার অন্তরে। নিবেদিতার সমস্ত দ্বন্দ্ব ডুবে যায়। প্রশ্নের প্রক্ষিপ্ত মনটায় অজস্র দীপাবলির আলো দেখতে পায় যেন সে। চোখ দুটো আবছে স্থির হয়ে যায় ভ্রূ যুগলের মধ্যে। সমস্ত শরীর যেন বিরাটের ছোঁয়া পায়। আপনহারা ভাব। আত্মরতির সুখ সায়রে আত্মমগন ভাব। তাইতো নিবেদিতা পরবর্তি জীবনে বলল —"মা যখন সম্পূর্ণ আত্মসমাহিত হয়ে থাকতেন, তখন একটা অমেয় শক্তি-স্পন্দন তাঁর সর্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত হত। প্রাণের গভীরে যেন তিনি সাড়া জাগিয়ে দিতেন।"

তখন কি হয়? নয়নে নামে নীর নির্ঝর। প্রাণ হয় একটা অব্যক্ত পুলকে হারা। জীবন মন একমুখো চিন্তায় যেন কোন অসীমে অতলায়িত হতে থাকে। 'অন্তর বলে ওঠে আমার, তিনি মহতো মহীয়ান। তাকে উপভোগ করি আমার সর্বানুভূতি দিয়ে। আমার হৃদয়ের স্পর্শে।'

এমনি করে জীবন-দ্বন্দ্বে এলো স্বাচ্ছন্দ্যের আনন্দ। ধ্যানযোগে মন হলো মুক্ত। মুক্ত আত্মার সন্ধানী নিবেদিতা। কেটে গেল একপক্ষকাল। মা সন্তানের গায়ের সব ধূলো ঝেড়ে দিয়ে টেনে নিলেন কোলে। আঁধারের যবনিকা উত্তোলিত করে দিলেন তার অন্তরাধারের ক্ষীণতম সন্ধান জানিয়ে। তারপরে একদিন বললেন —বললেন মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠে—"কাজে নামবার সময় হয়েছে তোমার।"

নিবেদিতা কান পেতে মাথাটি এলিয়ে দেন মায়ের বুকে। আহা কত শান্তি! কত তৃপ্তি!

মায়ের আশিস পেয়ে নিবেদিতার মনের দিগন্তে নতুন জোয়ার এলো যেন। সত্যি তার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় হয়েছে। এবারে কর্ম সমুদ্রের আহ্বানে তাকেও সাড়া দিতে হবে, সাড়া দিতে হবে একজন দরদী ভারতবাসীর মতই।

মায়ের বাড়ী থেকে নিবেদিতা চলে এলো নতুন বাড়িতে। তেমন ভালো বাড়ী নয়। ঠাণ্ডা। তা হোক, দৈহিক সুখ ভোগের বালাই নিবেদিতার প্রায় চুকেই গিয়েছে। অন্তরে জ্বলে উঠেছে আলোর দীপালী। তাই লিখল সে। লিখল বন্ধুদের কাছে—"আমার বাসাটি আমার চোখে চমৎকার! সেকেলে ধাচের হিন্দু বাড়ী যেমন হয়, এ বাড়িটি তারই একটা বেয়াড়া নমুনা। বাড়ীর মধ্যে মস্ত উঠান —দিনে ঠাণ্ডা, রাত্রে দিব্যি হাওয়া খেলে।......সন্ধ্যায় সকালে জ্যোছনা রাত্রে মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে আমি একেবারে একা।......"

কবি প্রাণ নিবেদিতার। এখানে সব কিছুই তার অন্তর্সৌন্দর্যের ছোঁয়ায় অপূর্ব হয়ে উঠেছে। সত্যি এ এক একাকিত্বের মন্দির। যখন ছিল নিবেদিতা মায়ের কাছে, তখন মাঝে মাঝে দেখা মিলত স্বামিজীর। কিন্তু এখানে এসে তাও আর তেমন ঘটছে না। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, অন্তর ভুবনে যখনই সাড়া জেগেছে বিপুলভাবে, তখনই তিনি এসে হাজির হতেন নিবেদিতার কাছে। অবিশ্যি কোন একটা কাজ নিয়েই বটে।

নতুন বাড়ীতে আসার পরে এলেন একদিন স্বামিজী। দূর থেকেই দেখলেন নিবেদিতাকে। অনেক বদলে গেছে। কাঠিন্যের অবরোধে আবৃছে নিবেদিতা ছেড়ে দিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে তার অহংবোধের অস্তিত্ব। ব্রহ্মচারিণীর পূর্ণ প্রকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার দেহের লাবণ্যে। ঘরের বৈধব্যতায় খাঁ খাঁ করছে যেন আসবাবপত্র। বলতে নেই কিছুই। ধ্যানের ঘরে একখানা ছবিও টাঙ্গায় নি নিবেদিতা। হৃদয়ের দরজা খুললে যেখানে দিব্য আভাতি, তাকে বাইরে এনে নিবেদিতা সাজাবে কোন সাজে?

এত সব কৃচ্ছ্র তার মধ্যে স্বামিজীর আদেশের বিরাম নেই। 'বাড়ীতে সকলের অবাধ যাওয়া আসা না চলাই বাঞ্ছনীয়। এ কথাটা মেনে নেওয়া উচিৎ।'

অন্তঃপুরবাসিনী নিবেদিতা। কান পেতে কথাটি শুনল। অবিশ্যি মুক্তির

তুফানে মনটা যে মোটে টলেনি তা নয়—তবুও সে তেমনভাবে একথা নিয়ে আর বলল না কিছু। আদেশ মেনে নিল।

বাড়িটার নীচে বসে স্কুল। সেখানে কোলাহল। তা ওখানেই সীমিত থাক। সদর দরজার পরেই বৈঠকখানা। তার চৌকাঠ পেরোবার বিধান নেই কোন পুরুষ বা কোন বিদেশিনীর। ভেতরের স্তব্ধতার সঙ্গে হৃদয়ের একতানতাই সাধনার প্রশস্ত পথ করে দেবে। তা না হলে সুর হারিয়ে যায়। ছন্দপতন ঘটে।

জীবনের নীরব নিঃসঙ্গতার মধ্য থেকে একজন জেগে বসেন। তিনি কে? তিনি হলেন একান্ত আপন জন। যার অভিসারে জীবনের সর্বস্ব ইন্ধন দেয়া যায় অকাতরে। কিন্তু তাকে পাবার আগে বড় দুর্জয় সংগ্রাম করতে হয়। নিষ্ঠার কাঠিন্যে নিয়মের শৃংখলে মনকে সর্বদার জন্যেই রাখতে হয় একমুখো। যতক্ষণ পর্যন্ত আপন অস্তিত্বের বড়াই, ততক্ষণ তার দেখা পাওয়া ভার। অন্তর প্রদীপের রোঁসনাইয়ে দেখতে হবে তার পথ। কিন্তু তা কেমন ভাবে? সে ভাব বড় মধুর। জীবন দেউলের দ্বার ভেঙ্গে ফেলে তবে তার অভিষেক। তাইতো যোগী নিঃসঙ্গতার মধ্যে প্রলীন হয়ে যান। বাইরের সবকিছু থেকে বসেন মুখ ফিরিয়ে। পরাবৃত্তি চাই। চাই উল্টো সাধন। এবং একদিন চলতে চলতে এমন এক মহাসমুদ্রের কল্লোলধ্বনি ভেসে আসবে তার কনে, যখন সে অধীর হয়ে শুধু চলবে। আর চলবে। সে স্থান বড় সুন্দর। বড় প্রাণ মজান। তাইতো স্বামিজী নিবেদিতাকে টেনে নিয়ে চলেছেন নিঃসঙ্গতার অঙ্গনে। যেখানে নেই বাইরের কলমুখরতা, নেই নিত্যকার জীবনের হাহাকার। তারপর? তারপর বিশুদ্ধির আগুনে পুড়িয়ে তাকে করে নেবেন নিকষিত হেম। ছেড়ে দেবেন কর্মযজ্ঞের হোমহুতাসনের মাঝে।

নিবেদিতা প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেনি গুরুকে। তাই আঘাত যে মোটে বাজেনি মনে তা নয়। এমন কি একাকী বসে সে অনেক ভেবেছে। ভেবেছে এই কঠোর নির্দেশের কারণ সম্বন্ধে। স্বামিজীই তাকে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন একদিন। সুযোগ দিয়েছিলেন এক ভিন্‌দেশী মেয়েকে সকলের সঙ্গে মিশবার জন্যে। কিন্তু তার মুখে-এ কি কথা শুনছে নিবেদিতা। একদিন এসে বললেন স্বামিজী, বললেন নিবেদিতাকে—"এখন তুমি সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ছেড়ে দিয়ে একেবারে অবরোধ বাসিনী হও।"

মনটা চন্‌মন্‌ করে উঠল নিবেদিতার। প্রাণ-সমুদ্রের সংক্ষুব্ধ গর্জনে একবার মুখর হতে যাচ্ছিল নিবেদিতা। কিন্তু না, চলছল দুটি মায়া-ভীরু চোখে তাকিয়ে রইল, তাকিয়ে রইল গুরুর পানে।

বিচারহীন মন না হলে বিচারাতীতকে ধরা যায় না। ঈশ্বরের কৃপা, করুণা ও আশীর্বাদ লাভ করতে হলে মনকে করতে হয় মন্দির। কি রকম? ঘরের দরজা রুদ্ধ হয়ে যায়। বাইরের কোলাহল স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু মন্দিরের দুয়ার তখন খুলে যায়। কেন? কেন এই নৈশ জাগরণ? মন বলে, জানি না। তবে অজানার সুর সাধনার জন্যে এত কৃচ্ছ্রতা কি জন্যে? মন আবার বললে—ভালো লাগে।

এই ভালো লাগার যাদুস্পর্শে ভালোবাসার অঙ্কুর উদ্‌গম হয়। তারপরে জীবনে প্রিয়জনের খোঁজে ঠিক এমনি করে মনের মন্দির-দ্বার খুলে বসতে হয়।

নিবেদিতা যেদিন স্বামিজীর মুখ থেকে শুনল—এবারে "অবরোধবাসিনী হও।"

সে দিন তার মনটায় একটু বিচারের ভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আত্মগত না হলে আত্মসত্যকে যে মোটেই জানবার উপায় নেই। তাকে বিচার দিয়ে ধরতে গেলে বিকার এসে পড়বে যে। এ সত্যটা নিবেদিতার অন্তরে পৌছতেও বিলম্ব হয়েছিল।

কিন্তু গুরুর কৃপায় তার সে ভ্রম ভাঙ্গল। অপসৃত হলো তমসার গুণ্ঠন। ধীরে ধীরে নিবেদিতা মগ্ন হয়ে পড়ল। অন্তরাঙ্গনে যে বিপুল সমারোহ তা নীরব না হলে শ্রবণ করা যায় না। মৌন না হলে তাকে ধরা দুঃসাধ্য। অবিশ্যি এ সত্য নিবেদিতা যেদিন বুঝল তার অন্তর দিয়ে, সেদিন তারই কণ্ঠে আমরা শুনতে পেয়েছিলাম—"নিজেকে নিয়ে নির্জনে মৌনী থাকা যায় যদি, আত্মার অপৌরুষেয় মহিমার উপলব্ধি গভীর হয়। ব্যক্তিগত যতকিছু সঙ্কীর্ণতা আর বক্রতা, সবই যেন আপনা-আপনি সরল হয়ে মিলিয়ে যায়।"

এবারে আর দ্বিধা নেই। মুখর মন নীরব হলো। জীবনে টেনে নিয়ে এলো নির্বিকার একটি মুগ্ধ লগ্ন। আশ্রমের বাঁধা-ধরা ছকে গতি-মন্ত্র মনকে ছায়ামন্থর করে তুলল। বেলুড়ের মঠকেই জানল তার ঘর-বাড়ী বলে। এই যে সমর্পণ এই সমর্পণের মধ্য দিয়েই প্রভাস্বর হয়ে উঠল তার অন্তরের দেবতা।

স্বামী সদানন্দের 'পর ভার পড়ল নিবেদিতার দেখাশোনার। সঙ্গীহীন জীবনে

এ যেন ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ। সদানন্দের সঙ্গে নিবেদিতা ধ্যান সম্বন্ধে আলোচনা করে। প্রতিটি কাজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারা যায় ঈশ্বরকে কিভাবে, তা জানতে চায়। সদানন্দ নিখুঁতভাবে সব খুলে ধরেন নিবেদিতার কাছে। জীবনের বিচিত্র পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে করুণাময়ের কারুণ্য প্রাপ্তির নানা পথ ও নানা মতের সঙ্গে একটা সমন্বয়ের সূত্র বের করেন সদানন্দ।

কোনদিন বা রামায়ণ মহাভারতের পুণ্য-গাথা গল্পচ্ছলে নিবেদিতার কাছে পরিবেশন করেন। কোন দিন বা কাজের ফাঁকে গুনগুন করে গান গায়। নিবেদিতা উৎকর্ণ হয়ে শোনে।' মনটা যেন কোন এক অজানা দেশে ধেয়ে চলে।

আবার কখনও নিবেদিতা একান্ত শিশুর মত প্রশ্ন করে। সদানন্দ যথাযোগ্য জবাব দিয়ে নিবেদিতার মনের প্রভঞ্জন ভঞ্জন করে। এমনি করে নিবেদিতার নৈকট্যের মন্দিরের দরজাটা খুলে গেল। পাড়ায় পাড়ায় তার হৃদ্যতার আসন পাতা হলো। সে হয়ে উঠল সকলের পরম আত্মীয়।

সে একসন্ধ্যার মদির লগন। সবে নেমেছে আঁধার। নিবেদিতা বসে আছে তার বাগবাজারের বাড়িতে। সহসা একটি মেয়ে ছুটে এলো। ছুটে এলো নিবেদিতার কাছে। বলল, "শিগ্‌গির এসো। আমার কোলের মেয়েটি মারা যাচ্ছে।"

নিবেদিতা ত্রস্ত হয়ে ছুটে গেল। কিন্তু এতক্ষণে মৃত্যুর হিমশান্ত অঙ্কে ঘুমিছে বাছা। উন্মাদিনী মা মৃত সন্তানকে বুকে ধরে ভেঙ্গে পড়ল। কান্নায় তার অন্তর মন ডুকরে উঠল। দেহটি আছড়ে পড়ল মাটিতে। নিবেদিতা মায়ের মাথাটি টেনে কোলে তুলল। স্নেহসিঞ্চিত অন্তরে এ দুঃখময় পরিবেশকে যেন অনেকখানি হালকা করে দিল। বলল মা, "বলো, বাছা আমার কোথায় আছে গা!"

নিবেদিতা ভাবগম্ভীর অন্তরে বলল—"শান্ত হও, তোমার মেয়ে এখন মায়ের কোলে। যিনি আমাদের সবার মা, সেই মা—কালীর বুকে সে। স্থির হও, নইলে তার আরামের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। তোমার মেয়ে মায়ের কোলে ঘুমুচ্ছে—তাকে দোল দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও।"

অন্তরে নিবেদিতার অরুন্তুদ আর্তি। কিন্তু বহিরঙ্গে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে এক স্নেহ করুণ ভাব। নিবেদিতা আহত জননীর মুখে হাত বুলাতে লাগল। মনে মনে জপ করে চলল শ্রীরাম কৃষ্ণের নাম। মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে বলল—জয়, জয়, মা-কালী। এমনি ধারা কাটল দীর্ঘ সময়। সন্তান হারা জননীর অন্তর শান্ত হলো। নিবেদিতা অপলক তাকিয়ে থেকে এক সময় বিদায় নিল।

মরণ, মরণ তো চুপি চুপি আসে। আসে নব জীবনের বার্তা বহন করে। আসে

আর একটা জীবন সংগ্রামের সূচীপত্র নিয়ে। এ উদ্ঘাটন বৈ আর কি ? এ জীবনের সব আবরণ ক্ষয়ে যায়। সব মালিন্য মুছে যায়। আর একটা জীবন-প্রভাতের শঙ্খ বেজে ওঠে। মানুষ লাভ করে নব জন্ম। কিন্তু এই জন্মান্তর মানুষ মনে মনে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না বলে কাঁদে। মায়ার আবারণে আবৃত মন স্বজন হারানোর শোক থেকে নিজেকে পারে না শান্ত করতে।

মরণের সঙ্গে নিবেদিতার চাক্ষুস পরিচয় এই প্রথম। সত্যি তারও যেন কেমন একটা উদাস ভাব হয়েছিল তখন। সব কথা গুরুকে বলবার জন্য পরের দিন ভোরেই নিবেদিতা রওনা হয়ে গেল, রওনা হয়ে গেল বেলুড়ে।

অনাদিকালের একটি সহজ সত্য চিরদিন মানুষের অন্তরে ঘুমিয়ে থাকে। ঘুমিয়ে থাকে কতগুলো চাওয়া পাওয়ার ক্রন্দন নীরবে। কিন্তু যখন সুরে সুর মিলে যায়—তখনই সে নীরব মনটা মুখর হয়ে উঠে।

নিবেদিতার সহৃদয়তার স্পর্শে সন্তানহারা জননীর সে মন ডুকরে উঠল। চিরটা কাল মরণকে ওরা সয়েছে নীরবে। চোখের জলের মূল্য যে কিছু আছে, একথাও ওরা কোনদিন জানত না। দুঃখ বেদনার ভুবন বিসারী রূপের পসরা যেন শুধু ওদেরই জন্যে ঈশ্বর সাজিয়ে দিয়েছেন। এই তো ছিল আত্ম বিশ্বাস। কিন্তু সহসা সে মন জেগে উঠল। বুঝল, এ কান্নার অন্তে যে প্রশান্তির সান্ত্বনা তা পাবার অধিকার তাদের আছে। এ নিরাশার মাঝে যে আশ্বাসের অমৃতবাণী তা শুনবার অযোগ্য পাত্র তারা নয়।

স্বামিজীর কাছে এসে নিবেদিতা বলল, বলল সব কথা খুলে—"আমরা যে আশ্বাস চাই, এই দীন-দরিদ্ররাও সেই আশ্বাসটুকুর কাঙাল। তারা শুধু এইটুকুই জানতে চায়, তাদের সন্তান সোয়াস্তিতে আছে কিনা। আছে কিনা মায়ের স্নেহ দৃষ্টির তলে। দুঃখ যে ক্ষণিকের আর আনন্দই যে নিত্য সম্পদ এইটুকুই তারা বুঝবার জন্য ব্যগ্র। সবাই এক সঙ্গে একই দুঃখ ভোগ করছি, তাই একই আশ্বাসে একই নির্ভরতায় আমরা সোয়াস্তি পাই। তবে তো আমাদের মধ্যে কোনও তফাত নাই, আদর্শ বা আকাঙ্ক্ষারও কোন ভেদ নাই। ভোরের দিকে বেরিয়ে যখন আসি, মেয়েটি আমায় কিছু খাবার দিল·········'

তন্ময়ের মত কথাগুলো শুনলেন স্বামিজী। বললেন এক সময়—"এইজন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে এসেছিলেন। তিনি জোরগলায় বলে গেছেন, সকলের সঙ্গে অন্তরের ভাষায় কথা কইতে হবে।······সব আধারেই তার কেন্দ্র, কিন্তু পরিধি কোথাও নাই। মৃত্যু আর কিছুই নয়, কেন্দ্র হতে কেন্দ্রান্তরে স্থিতি মাত্র।"

মরণকে বরণ করতে হয় জীবনের আর এক শুভ পদক্ষেপ বলেই। একথা নিবেদিতা বুঝলেও একটা ঝাপসা কুয়াশার আবরণে ছিল আবৃত। স্বামিজীর কথাগুলো শুনে তার সে দ্বিধান্বিত অন্তরটা যেন একটু হালকা হলো।

কয়েকদিন পরের কথা। শ্রীমা'য়ের বাড়ির সামনে দিয়ে চলেছে জনতার মিছিল। তার মধ্যে থেকে শোনা যাচ্ছে কীর্তনের সুর ঝঙ্কার। নিবেদিতা উৎকর্ণ হলো।

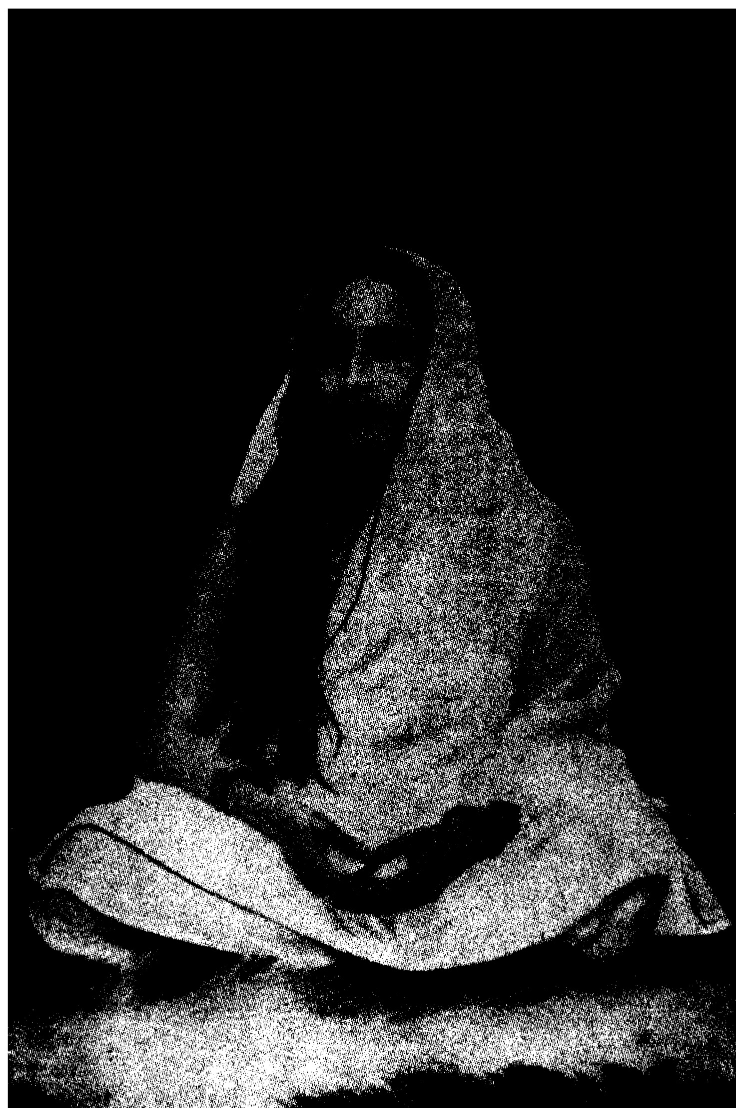
মনটা যেন তার কেমন করে উঠল। রুগ্ন যোগানন্দ তবে কি চলে গেল? বাইরে এলো নিবেদিতা। 'বুঝিবা তাই।' কয়েকদিন পূর্বে নিবেদিতা এক সাহেব ডাক্তার দেখিয়েছিল। ডাক্তার তো সেদিনই জবাব দিয়ে গেছেন। কিন্তু সে মরণ অভিসার যোগানন্দের এতটুকু বিভ্রম আনতে পারিনি।

মৃত্যুর পূর্বেও যোগানন্দ উপস্থিত সন্ন্যাসীদের পানে তাকিয়ে বলেছেন—"তোমাদের কথা শুনতে পাচ্ছি। আর কোনও যন্ত্রণা নাই। সব মিলিয়ে যাচ্ছে। নির্গুণের আভাস পাচ্ছি। ওঁ, ওঁ, রামকৃষ্ণ ওঁ।" বলে যোগানন্দ মৌনের ধ্যানে মগ্ন হয়েছে।

শব যাত্রার পিছু পিছু নিবেদিতাও গিয়েছিল। দেখেছে চিতা বহ্নিমান হয়ে উঠেছে। অন্তরটা গুমরে উঠেছে। দুচোখ ছে'পে নেমেছে জলের ধারা। সে যেন কিছুতেই জীবনের এ রূপান্তরকে মেনে নিতে পারেনি। পারেনি স্বাগত জানাতে মরণকে। গুরুর কথা মনে হয়েছে। তবুও পারেনি অন্তর মন্থনকে রুখতে। সারাদিন তার কেটেছে। সন্ধ্যার মদির মায়া-লগন বিসারী তার চিন্তার ধারা সমানেই বয়ে চলেছে।

নিবেদিতা ভাবছে—"না, সব রকমেই হেরে যাচ্ছি, আদর্শচ্যুত হচ্ছি। মুক্তি দিয়ে কি হবে? কিন্তু আমি কে, যে আমার ইচ্ছামত সব ঘটবে? যদি একটা ঘটনাতেও 'স্বামিজীর কাছে আমার আনুগত্যের প্রমাণ দিতে পারি, তাহলেই আর কিছু চাইব না। আমি তাঁর ছায়ায় চলতে চাই, দূরে থাকতে চাই না।"

নিবেদিতার অন্তরটা শিশুর মত ডুকরে ওঠে। সে যেন এই মনটাকে হারিয়ে ফেলতে পারলে অনেক শান্তি পেত।



অশান্ত মন। মরুর দহনে যেন পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কিছু ভালো লাগে না। সর্বদার জন্যেই অনাসক্ত মনটা শূন্যের ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতে চায়।

কিন্তু এই নির্জীব জীবনটা লয়ে নিবেদিতা যেন আর চলতে পারছে না। কিসের যেন একটা সান্ত্বনা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাচ্ছে নিবেদিতা। তাই এক পরম প্রশান্তির আশ্রয়ে চলে এলো সে। চলে এলো সারদাদেবীর কাছে।

এখানেও কান্না। মা কাঁদছেন। যোগিনের ব্যথায় তাঁর বুকেও আগুন জলছে। নিবেদিতাকে কাছে পেয়ে মা টেনে নিলেন তার হাত দুটো কোলের মধ্যে। যেন মন বলছে শ্রীমার—বলছে কান্নার সঙ্গে—ওরে আমি যে ওকে প্রাণ দিয়ে স্নেহ করেছিলাম।

জীবনের অতীত এলো স্মৃতির পথ ধরে। অনেক কথা মনে পড়ে গেল শ্রীমার। মনে পড়ে গেল তাঁর জীবনের শৈশব দিনগুলো। শৈশব কি, তখন তো যৌবনের পাদপীঠে উত্তরণের পালা। বলতে লাগলেন সারদাদেবী—

"ঠাকুর একবার গাঁয়ে এলেন। কাটালেন ছ'মাস। শরীর অসুস্থ তখন। আমি চৌদ্দ বছরের মেয়ে তখন। সেবা করতাম প্রাণ ঢেলে। অভাবের মধ্যেও তাঁর স্বভাবের দ্যুতি ঠিকরে পড়ত। কি সুন্দর ব্যবহারই না করতেন আমার সঙ্গে! বিকেলে বসতেন আমতলায়। শেখাতেন আমাকে লেখা পড়া। শুধু লেখা পড়া কেন? সংসারের সব কাজই তিনি আমায় শিখিয়েছিলেন। তাঁর মুখ চেয়েই বেঁচে রয়েছি। কিন্তু যখন ডাক এলো, বললেন আমায়—"এখন দাঁড়াতে হবে তোমায় নিজের পায়ে ভর দিয়ে।" কথাগুলো শুনতে শুনতে নিবেদিতা তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। যখন মা থামলেন, তখন নিবেদিতার বুকটা শূন্য হয়ে গেল একটা দীর্ঘশ্বাসে। মায়ের কোলে মাথাটি এলিয়ে দিল নিবেদিতা। বললেন মা—গুরুকে ভালবাস।...... সাধুপুরুষকে ভালবাসলে আত্মার নবজন্ম হয়। এই তো ভক্ত ভগবানের ভালবাসা। শুদ্ধ ভালবাসাই আত্মার আলো।......আমি যেমন আমার গুরুকে ভালবাসতাম, তুমিও স্বামিজীকে তেমনি ভালবাস।"

অনেকটা শান্ত হতে পেরেছে নিবেদিতা। মনের অস্থির ভাবটা কেটেছে। বিশ্বাস বিবেক, মন ও চিন্তা ঠিক এক সুরে চলতে থাকল আবার। ফিরে এলো প্রাণের বিশ্বাস। দিনগুলো কেটে যাচ্ছে ধ্যান ও মননে।

অক্টোবর মাস। স্বামিজী ফিরে এসেছেন কাশ্মীর থেকে বেলুড়ে। সমাগত দুর্গোৎসব। কিন্তু শরীরটা যেন আগের চেয়েও অনেক ভেঙেছে স্বামিজীর। গঙ্গার বুকে নৌকায় থাকেন স্বামিজী। যদি নদীর হাওয়ায় একটু সুস্থ হওয়া যায়।

এদিকে তখন মঠের দানপত্র লেখা হয়ে গিয়েছে। হয়ে গিয়েছে সন্ন্যাসীদের জন্য স্থায়ী একটা নিয়মাবলী। তাতে রইল সব-কিছুই। শুধু সাধন মননই নয়—মানুষের মর্মমানসের সঙ্গে কর্মভূমির একটি নিখুঁত মিল সাধন করলেন স্বামিজী। সংঘের ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে তুলে ধরলেন ঠাকুরের অমৃতময় বাণী "যত মত তত পথ"।

কিন্তু এ কাজগুলো করবার আগে স্বামিজীকে অনেক ভাবতে হয়েছে। অনেক সময় নিজেই ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি, কি দিয়ে কি করবেন; কিন্তু কাজে হাত দিয়ে তাঁর একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। মার্গারেটের পানে তাকিয়ে বললেন একদিন—"মার্গট, একসময় ভেবেছি—দিনের পর দিন ভেবেছি কাজে নেমে কিভাবে এগিয়ে যাব সহজে। কত বাধা আসবে। কিন্তু এটা নিতান্ত ভুল ধারণা। আমি অন্ততঃ এ নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। বিশ্বের ইতিহাসে আসলে জনকয়েক উদ্যোগী পুরুষের ইতিহাস, তারাই সভ্যতার ধারক। একজন যদি সত্যকে আশ্রয় করে কাজে হাত দেয়, দুনিয়া তার পদানত হতে বাধ্য। আমার আদর্শকে খাটো করতে পারি না। ঠিক করেছি, আমার শর্তগুলো যাতে বলবৎ থাকে সেই রকম ব্যবস্থা করব।"

"যত্র জীব, তত্র শিব।"

শিব-জ্ঞানে জীব সেবা। জীব স্তুতি। 'বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়' অর্পণ কর নিজেকে। ঝাঁপিয়ে পড় কর্মের ফেনিলে। মন্দিরকে মিলিয়ে দে বিরাটের বিশ্বে। 'যাও, বেরিয়ে পড়। জগতের কোনো কাজই ছোট নয়। কিছুই জাননা বলছ, ঐ কথাই লোককে বল গে যাও। এও একটা বলার মত কথা। নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ কর নিজের অভিজ্ঞতাকে। ঘৃণা করো না মহাপাপীকে। তার বাইরের দিকটা দেখো না। ভেতরে যে পরমাত্মা রয়েছেন, সেদিকে দৃষ্টিপাত কর—সারাটা জগৎকে বল, তোমাতে পাপ নেই, তাপ নেই, তুমি মহাশক্তির আধার।'

'কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।'

স্বামিজীর আদেশ শিরোধার্য করে ওরা বেরিয়ে পড়ল। গুজরাটে গেল তুরীয়ানন্দ ও সারদানন্দ। নিজের কাছে রাখলেন স্বামিজী কয়েকজন তরুণ সন্ন্যাসীকে। তাদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করলেন ব্রহ্মানন্দের 'পর। স্বামিজী সম্পূর্ণ-ভাবে নিজেকে ঢেলে দিলেন মঠের কাজে। একটা বিরাট সম্ভাবনাকে রূপ দেওয়ার সাধনায় যোগী তন্ময় হয়ে গেলেন।

'এদিকে নিবেদিতার বিন্দু বিশ্রাম নেই। তার পানে স্বামিজীর কড়া নজর। সপ্তাহে সন্ন্যাসীদের দুদিন পাঠ দেয় নিবেদিতা। আলোচনা করে শারীর-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ-বিদ্যা সম্বন্ধে। সবাই শোনে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে। পাঁচটা বাজে। নিবেদিতা চলে আসে ছাদে। স্বামিজী থাকেন এখানেই। ছাদের 'পর ছোট্ট একটি ঘরে তাঁর আসন। বিরামহীন কর্মের মধ্যে দিন-রাত্রির প্রায় সারাটা সময়ই ডুবে থাকেন তিনি। সন্ন্যাসীরা এসে বসে। স্বামিজী তাদের পাঠ দেন। দেন নানা-ধরনের উপদেশ।

নিবেদিতা তাকিয়ে থাকে পথের পানে। কেন? পিওন কখন আসবে। কখন নিয়ে যাবে ইউরোপের চিঠি। নিবেদিতা তা পড়ে শোনাবে স্বামিজীকে। লিখবে উত্তর। শোনাবে স্বামিজীকে। কত চিন্তা। কত ভাবনা। সব কাজের শেষে স্বামিজী বলেন নিবেদিতাকে,—'শুচিতা আর পরিপূর্ণ আত্ম-বিসর্জন, এই তোমার মাঝে প্রস্ফুটিত হোক। নিজেকে এমনি করে গড়ে তুলতে যদি পারো, তবেই তোমার

অন্তরে ধর্ম ফুটবে ফুল হয়ে। প্রতিষ্ঠিত হও বৈরাগ্যে। তোমার শক্তি অসীম। তাকে প্রকাশ কর। আমার সঙ্গে তাল রেখে পথ চলো।......শ্রীরামকৃষ্ণ বা বেদান্ত প্রচার করা আমার দায় নয়—আমার দায় শুধু এদেশের লোককে মানুষ করে তোলা।'

স্বামিজীর কথাগুলো শুনতে শুনতে নিবেদিতার অন্তরে আগুন ধরে যায়। এ যে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের বাণী। কেন যে এই মুহূর্তটায় নিবেদিতার মনে পড়ছে তার দাদুর কথা। ঠিক এই ধরনের কথা বলতেন তিনিও। মানুষের বেদনায়, দেশের দুর্দিনে নিবেদিতা তার দাদুর চোখেও দেখেছে জল। দেখেছে আগুন। স্বামিজীর আয়ত দীপ্ত আঁখিতেও সেই করুণা। যা নিবেদিতার অন্তরকে দিয়েছে পাগল করে। স্বামিজীর উক্তি,—"মার্গট, আমার দেশবাসীকে আর সবার চেয়ে তুমিই বোধ হয় ভালো বুঝবে। আইরিশ আর বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের ধাঁচটা যে একই রকম। এদের কেবল 'বাক্‌চাতুরী'।......এ দুটো জাতির বাক্‌পটুতা সবাইকে হার মানায়, কিন্তু আসল কাজের বেলায় পারে না কিছুই করতে।......জনসাধারণের আদর্শের মান উন্নয়নের জন্য তাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে হবে আমাদের। শুধু এই করেই এক একটা জাতিকে গড়ে তোলা যায় মার্গট। কিন্তু লোকের মাথায় এই চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার। আমাদের নিজেদের খাটতে হবে। চাই বল, বীর্য ও সাহস। মুষ্টিমেয় শক্তিমান পারে সারাটা দুনিয়াকে তোলপাড় করে দিতে।"

* * *

'মেয়েদের মধ্যে তুমি যে কাজ করবে সেও একটা কাজের মত কাজ। তাদের জাগাতে হবে। ইউরোপীয় মেয়েরা কাপুরুষকে ঘৃণা করে। তারাই জাগিয়ে রাখে ওদের পৌরুষকে। কবে বাঙালী মেয়েরা পুরুষের দুর্বলতাকে নির্মমভাবে বিদ্রূপ করবে?'

কঠোর শ্রম ও সাধন ভজনে দিন কাটতে থাকে নিবেদিতার। স্বামিজীর বিন্দু বিশ্রাম মেলে না। একটা বিরাট কাজ করে যেতে হবে তাঁকে। ঝড়ের বেগে চলেছেন এগিয়ে। যেন আর সময় নেই। শরীর কত আর সইবে? অসুস্থ হয়ে পড়লেন স্বামিজী। ডাক্তার এসে বললে বাইরে কোথাও যেতে। নিবেদিতাও কাতর অনুরোধ জানাল। বাধ্য হয়ে যেতে হলো স্বামিজীকে—

যেতে হলো দার্জিলিং-এ।

শরীর একটু ফিরল পাহাড়ী পরিবেশে। কিন্তু যিনি এসেছেন সারাটা বিশ্বকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দিতে, তাঁর কি বিশ্রামের সময় আছে!

কলকাতা থেকে এক পত্র গেল।

—কলকাতায় প্লেগ।

শুধু কি তাই? তার ওপরে আবার রেগুলেশান এ্যাক্টে নগরবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। সরকার তার আইনকে যথাযথ চালু করবার জন্যে ফৌজ মোতায়েন করেছে। একদিকে মৃত্যুভীতি, অন্যদিকে সরকার-রূপ অপদেবতার রক্তনেত্র।

এমন একটি সংবাদ পেয়ে স্বামিজী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কলকাতায় ফিরে আসবার জন্যে। এর চেয়ে যদি বিবেকানন্দের বুকের একখানা পাঁজর খসে যেত, তাও বুঝি ভালো ছিল।

অধীর স্বামিজী। ফিরে এলেন কলকাতায়। ছড়ালেন অজস্র প্রচারপত্র। সতর্ক করলেন শহরবাসীদের। ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্লেগের তাণ্ডবলীলায় সন্ন্যাসীরা। ঝড়ের মত আত্মপ্রকাশ করল তারা দেশের বিপদ মুহূর্তে। দেশকে বাঁচাতেই হবে।

কিন্তু একটু ভাবনায় পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণ।

টাকা আসবে কোথা থেকে?

বললেন স্বামিজী, 'কেন? দরকার হলে মঠের জন্যে কেনা জমিটা বিক্রি করে দেব। হাজার হাজার মানুষ আমাদের চোখের সামনে ভোগ করবে অসহ্য যন্ত্রণা, আর আমরা বাস করব মঠে? না হয় গিয়ে দাঁড়াব গাছতলায়। উদর পূরণ করব ভিক্ষার অন্নে। তবুও যদি হাজার হাজার প্রাণ বাঁচাতে পারা যায়, তবে কিসের জায়গা আর কিসের জমি?'

ডাকলেন স্বামিজী নিবেদিতাকে। বললেন চিন্তাক্লিষ্ট কণ্ঠে, 'শোন, পাড়াটা আমরা বাঁচাবই। সে ভার রইল তোমার ওপরে। অনেক ঝাড়ুদার দরকার। সেজন্যে লোক চাই তো।'...আমি চাই কলকাতার ছাত্রেরা জোট বেঁধে নিজের হাতে বাগবাজার অঞ্চল পরিষ্কার করুক।'

বিধাতার রোষবহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। পাড়ায় পাড়ায় আতঙ্ক। বিভীষিকার মধ্যে পড়ে নগরবাসী মৃত্যুভয়ে থরথর করে কাঁপছে। সন্তানের পানে অপলকনেত্রে তাকিয়ে থাকে জনক-জননী। নীরব অশ্রুতে মনের বেদনা ঝরে পড়ে। প্রেয়সীর কোল শূন্য হয়ে যায়। হাহাকারে ভেঙে পড়ে। মুছে ফেলে ললাট-ফলক থেকে এয়োতির শেষ চিহ্নটুকু। মারী-মড়কের কবলে কলকাতা। বিশেষ করে বাগবাজার অঞ্চলটা। টিকা নেই। ওষুধ নেই। নেই শুশ্রূষাকারী। আছে শুধু শ্রীগুরুর পাদপদ্ম। তাই সম্বল। তুমিই একমাত্র ভরসা। হে বিপত্তারণ, তুমি সহায় হও।

জীবন মৃত্যু, পায়ের ভৃত্য

চিত্ত ভাবনাহীন—করে নিবেদিতা ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃত্যুভয়াল তাণ্ডবের মধ্যে। চলল জীবন-মৃত্যুর লড়াই। শক্তিময়ী দাঁড়াল উন্নতশিরে। ঘুরতে লাগল পাড়ায় পাড়ায়। স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে গড়ে ওঠল স্বেচ্ছাসেবক দল। খোলা হলো অস্থায়ী চিকিৎসা-কেন্দ্র সামান্য একটি চালা-ঘরে।

এলো গভর্নমেন্টের হেল্‌থ অফিসার। দেখা করল নিবেদিতার সঙ্গে। বলল তাকে নিবেদিতা, 'বাগবাজারকে আমরা বাঁচাব ঠিকই। এখানে সাধারণ খাটছে সাধারণের জন্যে। প্রথম দফায়ই এ রাস্তা থেকে দু'শ পঁয়ত্রিশ টাকা চাঁদা আদায় হয়েছে। আমার সন্ন্যাসী সহকারীরা পরিষ্কার করছেন রাস্তার জঞ্জাল। খাটছে মেথর। দিনে আঠারো ঘণ্টা তাঁদের কাজ। কাজকে মনে করেন তাঁরা দেব-সেবা।'

বাগবাজারের বোসপাড়ার দায়টা নিবেদিতার। বিরামহীন কাজ। মেয়েদের হাতে তুলে দেয় ঝুড়ি। বলে তার মধ্যে আবর্জনা ফেলতে। নর্দমা পরিষ্কার আছে কি নেই। নেন তার খোঁজ। একটা নিয়মের মধ্যে আনবার জন্যে সে কি কম প্রয়াস নিবেদিতার! রোগ সম্বন্ধে মেয়েদের বুঝিয়ে হয়রান হয়ে পড়েছে নিবেদিতা। ওরা কথা শোনে আর হাসে। কিন্তু কাজে নামে না। অবশেষে নিবেদিতা নিজেই ঝাড়ু হাতে নেমে যায় রাস্তায়। ঝাঁট দেয়। নর্দমা পরিষ্কার করে।

সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ে পাড়ায় পাড়ায়। যুবশক্তির টনক নড়ে। তারা দল বেঁধে আসে এগিয়ে। বলে—দাও সিস্টার, ঝাড়ুটা আমাদের হাতে।

পরস্পর তারা বলাবলি করে, 'যদি আমরা না রাস্তা ঝাঁটপাট দিই, তবে সিস্টার নিজেই দেবেন।'

ছাত্রদের পেয়ে নিবেদিতার বক্ষ ফুলে ওঠে। দেশের জাগ্রত শক্তি দাঁড়িয়েছে। আর ভয় নেই। মরণ এবারে পালিয়ে যাবে দূরে। দেশ মৃত্যুর করালগ্রাস থেকে পাবে মুক্তি।

নিবেদিতা ছাত্রদের সামনে তুলে ধরে এক নতুন আদর্শ। বলে মমতা-মাখা কণ্ঠে, 'ঝাড়ুদারও যদি একটা আদর্শের প্রেরণায় কাজ করে, তাহলেই বৃহত্তর আদর্শের জন্যে তার প্রস্তুতি হয়ে গেল। সে আদর্শ কি? সেটা ঠিক করে নেওয়া তোমাদের দায়। বাগবাজারকে রক্ষা করে আমরা নতুন প্রাণ দিয়ে ভারতের ইতিহাস রচনা করলাম। এ-ইতিহাস আগে কখনও লেখা হয়নি। এই আমাদের রামায়ণ।'

মূর্তিমতী সেবারূপিণী নিবেদিতা জীবনপণ করে ভারত আত্মার মর্মমূলে আর একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত করল।

লিখলেন এ ঘটনার উল্লেখ করে পরবর্তীকালে স্যার যদুনাথ সরকার—'১৮৯৮ সালের প্লেগের সময় কলিকাতায় সে কী আতঙ্ক। এই মহামারীর সহিত শহরবাসীর কোনো পরিচয় ছিল না। কলিকাতার রাস্তাঘাটের আবর্জনা সাফ্ করিবার জন্য ঝাড়ুদার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখিলাম ঝাড়ু ও কোদালি হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা স্বয়ং রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করিতে নামিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে লজ্জাবোধ করিয়া বাগবাজার পল্লীর যুবকেরাও অবশেষে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নামিল। পরে শুনিলাম এই বিদেশিনী ভগিনী নিবেদিতা; স্বামী বিবেকানন্দ ইহাকে লণ্ডন হইতে আনিয়াছেন। নাগরিক জীবনে স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রথম পাঠ আমরা ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতেই পাইয়াছিলাম। এই প্লেগ উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়।'

একটি মাসের অক্লান্ত শ্রম ও সেবা দিয়ে আইরিশ দুহিতা ভারতীয় সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বুকে টেনে নিল। অতন্দ্র প্রহরীর মত নিবেদিতা এদেশের পায়ে নিবেদন করল তার সেবা। রণশ্রান্ত সৈনিকের মত তার পরে লুটিয়ে পড়ল, লুটিয়ে পড়ল শ্রীগুরুর চরণতীর্থে।

মায়াস্নিগ্ধ নয়নে তাকালেন বিবেকানন্দ নিবেদিতার পানে। তাঁর কি তৃপ্তির শেষ আছে? কি আনন্দ আজ বিবেকানন্দের। বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন। খাওয়া-দাওয়ার তদারক করলেন নিজেই। বেলুড়ে তিনটা দিনের মত শুয়ে কাটিয়ে দিল নিবেদিতা।

এতদিন ভাববার সময় ছিল না। অবসর ছিল না পিছু ফিরে তাকাবার। একটা প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেছে ঝড়ের মত দিনগুলো।

কিন্তু আজ? আজ নিবেদিতার মনের ক্লান্তিবৃন্তে এসে ছায়ার মত দাঁড়ায় মরণের দৃশ্যগুলো। পলকহারা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নিবেদিতা। জল ঝরে চোখে। বেদনায় টনটন করে ওঠে অন্তর। মনটা মন্থর হয়ে আসে। শুনতে পায় আট বছরের ছেলেটির মরণ-যন্ত্রণার কান্না। 'মা, মা···মাতাজী···মাগো!' বলতে বলতে নিবেদিতার আঁচলখানি করমুঠিতে দৃঢ় করে ধরেছিল ছেলেটি। চেয়েছিল বাঁচতে। নিবেদিতা তাকে মরণের হাত থেকে ছিনিয়ে রাখতে পারেনি। থর থর করে কাঁপছিল তখন তার সর্বাঙ্গ। বুকের মধ্যে মৃত্যুর বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল

একটা অবাধ্য বিদ্রোহ। স্বামী সদানন্দ নিবেদিতাকে সেখান থেকে ছিনিয়ে এনেছিল দূরে।

কেন নিবেদিতা তাকে বাঁচাতে পারল না? কেন? কেন?

স্বামিজী নিবেদিতার আহত অন্তরে শান্তিবারি-বর্ষণ করলেন—'ভালবাসাকে ছাপিয়ে ওঠে যে কর্ম তাকে চিনে নাও। সৃষ্টির আনন্দে বর্ষিত স্রষ্টার যে প্রেম, তাই তাঁর কর্ম।'

সন্ধ্যা নামে ধীরে।

গুরুর পাদমূলে এসে বসে শিষ্যবৃন্দ। সহসা নীরবতার মধ্য থেকে একটি প্রার্থনার কণ্ঠ জেগে ওঠে—'স্বামিজী, আমাকে শেষের ব্রতে দীক্ষা দিন।'

সকলের চোখ স্থির হলো নিবেদিতার 'পর। স্বামিজী গম্ভীরকণ্ঠে বলেন, 'তোমার প্রতীক্ষায় আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।'

তাই হোক। আমাকে গৈরিক পথে নিয়ে চলো। নিয়ে চলো সর্বত্যাগের তন্নাহীন তীর্থে। 'চিরদিনের মত সংঘের একজন' করে নাও।

সময় হলেই তিনি ডেকে নেবেন। ভাবনা কি? হৃদয়ের অতল গভীরে তাঁর চিরপ্রত্যক্ষ সান্নিধ্য তুমি পাবে। শুনবে তাঁর পায়ের শব্দ। হাতছানি দিয়ে তিনি ডাকবেন। নেবেন টেনে কাছে।

রাত্রে ঠিক ঘুম চোখে এলো না। অনেকটা রাত জেগে রইল। দীক্ষার একটা বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এরই মধ্যে নিবেদিতাব অন্তরায়তনে প্রভাস্বর হয়ে উঠেছে অন্তহীন অনন্তের দিগন্ত। প্রত্যক্ষভাবেই স্বামিজীর কাছে চাইল সে পথের সন্ধান। এবারে নৈষ্টিক ব্রহ্মচারিণীর অধিকার অর্জনের পালা।

আটটায় এসে পৌছল নিবেদিতা মঠে। বসে রইল মেঝেতে। অপেক্ষা করছে নিবেদিতা, অপেক্ষা করছে অর্চনার অঞ্জলি সাজাবার জন্তে। এখনো ফুল আসেনি। স্বামিজী কথা বলছেন ওর সঙ্গে। নানা কথা। বললেন বুদ্ধের কথা। বললেন মুক্তির মোহনা থেকে যাত্রা করে ত্যাগের তপে তন্ময় হ'তে। শুধু কি তাই? আরও বললেন স্বামিজী—আত্মাকে জানো। আত্মাকে বোঝ। তারপরে বিসর্জনের পালা।

ফুল এলো।

আঁচলভরে ফুল নিল নিবেদিতা। স্বামিজী শিখিয়ে দিলেন তাকে শিব পূজা করতে। বললেন নিবেদিতাকে, 'এবার আমার বুদ্ধকে কিছু ফুল দাও, আমি ছাড়া এখানে কেউ তাঁকে পছন্দ করে না।'

শেষ হলো পুজা। নেমে এলো নিবেদিতা নিচে। এবারে হোমাগ্নিতে জীবনের অন্তরাহুতি।

১৮৯৯-এর ২৫শে মার্চ।

ধ্যান-শান্ত নিবেদিতা। দাঁড়াল সন্ন্যাসী সংঘের সম্মুখে। তাঁরা মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। নিবেদিতা আগুনে আহুতি দিল জীবনের সর্ববস্ত অকাতরে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম রাখল গুরুর শ্রীচরণে। পরিয়ে দিলেন স্বামিজী তার ললাট-ফলকে ভস্মতিলক।

সবাই চলে গেল। নিবেদিতা সেদিন রয়ে গেল মঠেই। মধ্যাহ্নে খাওয়া শেষ হয়েছে। স্বামিজী ডেকে পাঠালেন নিবেদিতাকে। কাছে রাখলেন তাকে। এবারে নিবেদিতার অন্য রূপ। অন্য পোশাক।

শ্বেতশুভ্র পোশাক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। অন্তরে অনন্ত শান্তি। নয়নে স্নিগ্ধদৃষ্টি। নিবেদিতা নির্বেদের পারে এসে দাঁড়াল। নিজেকে তৈরি করবার জন্যে সম্মুখে তুলে ধরল সে খ্রীষ্টান মঠের সন্ন্যাস দীক্ষার সংযম। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ, গভীর নিশীথে ধ্যানে বসা, একবার আহার, নিয়মিত উপবাস ও ব্রতপালন। ছোট ছোট ভাবনার বীজগুলো মহৎ ও শাশ্বত চিন্তার তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে ও পটু হয়ে উঠল। মানস-তপস্যার মন্দির-দ্বার খুলে বসতে যে নিগ্রহ, তা সে স্বেচ্ছায় বরণ করল হাসিমুখে। অন্তর-জগতের জন্যে তার ভাবনা কম। সেখানে আঁধার থাকলেও অন্তরের আলোয় পথ আপনি স্বচ্ছ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। কিন্তু বাইরের জগৎটায় মেপে মেপে পা রাখতে হয়। তাহলেও নিবেদিতার বিন্দু ভাবনা নেই। তার অন্তর আনন্দে আত্মহারা। সে জানে গুরুর মহিমাই প্রকাশিত হবে তার মাঝে। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়ে উঠবে।

ফেলে-আসা দিনের কাহিনীরা যেন কথা কয়।

উৎকর্ণ হয়ে থাকে নিবেদিতা।

মনের নেপথ্যে এসে উঁকি মারে অতীতের স্মৃতি-মধুর দিন।

আজ হ'তে চার বছর আগে—

ঠিক এমনি একটি দিনে নিবেদিতা স্কুলের দুয়ার খুলেছিল।

১৮৯৮-এর ১২ই নভেম্বর।

সে দিনটিও ছিল আজকের মতন দীপান্বিতার রাত।

একটি একটি দীপ জ্বালবার সাধনায় দীর্ঘদিন তন্ময় ছিল নিবেদিতা। তারপরে এসে পৌঁছে গেছে সার্থকতার তীর্থে। সেদিন তার অন্তর-আয়তনও হয়েছিল দীপান্বিতা। লাখো কোটি দীপ জ্বলেছিল সেখানে।

বড় ভালো লাগে ভাবতে। ভাবতে ভালো লাগে সেদিনটির কথা নিবেদিতার। তার চোখের সামনে যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে অতীতের সেই মিষ্টিমধুর ক্ষণগুলো। মনে পড়বে না?

এ যে নিবেদিতার জীবন-সাধনার শুভ উদ্বোধন।

১৭নং বোস পাড়া লেন বাগবাজারে নিবেদিতা স্কুলের প্রতিষ্ঠা হলো। বেলুড় থেকে এলেন স্বামিজী। সঙ্গে নিয়ে এলেন শ্রীমাকে। এলো স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দ। মা সবাইকে করলেন আশীর্বাদ।

প্রথমে পূজা হলো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের। সেই সঙ্গে হোমের মন্ত্রও ধ্বনিত হয়ে ওঠল। সকলে মিলে নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করলেন। স্বামিজী স্কুলটির নাম রাখলেন "নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।"

বোস পাড়া লেনে সেদিন প্রজ্বলিত হয়ে উঠল ভারতীর হাতের দীপান্বিতার আলো।

ছোট ছোট তিনটি মেয়ে। এই নিয়ে শুরু নিবেদিতার প্রচেষ্টা। তারা লাজুক। মুখ তুলে কথা কয় না। কিছু বলবারও সাধ্য নেই। অমনি মুখ ভার হয়ে যায়। দু'চোখে নামে জলের ধারা। কিন্তু সিস্টারকে তারা ভালবাসে। তাকে কাছে পেলে খুশী থাকে।

স্কুলটির পরিচালনা সম্বন্ধে নিবেদিতা গভীরভাবে চিন্তা করে। হিন্দুর মনের মত হয়ে উঠতে পারলে নিবেদিতার কাজ করতে বিন্দু কষ্ট পেতে হবে না। মাত্র আটশ

টাকা মূলধন। তাও দিয়েছেন কাশ্মীরের মহারাজা। নিবেদিতা বলত, 'যদি স্কুলটি দাঁড়িয়ে যায়, আর এর যথার্থ উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়, তবে আমি রিপোর্ট লিখে লণ্ডন ও ভারতের সর্বত্র প্রচার করব। ভালোভাবে গড়ে উঠলে পর পৃষ্ঠপোষকেরা যে সাহায্য দেবেন, তার জোরেই স্কুলটি চলবে।' '……বালিকাগণের অভাব কি, তা আমাকে প্রথমে জানতে হবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের মধ্যে আমার নিজের স্থান কোথায়, তা ঠিক করে নিতে হবে এবং যে সমাজের উন্নতি-কল্পে আমার সমুদয় চেষ্টা প্রয়োগ করব, তাকেও তন্ন তন্ন করে দেখতে হবে। একটিমাত্র জিনিস আমার ঠিক করা ছিল—তা হচ্ছে এই যে, শিক্ষা বিষয়ক এমন একটি উপায় আবিষ্কার করতে হবে, যা ভারতীয় নারীকুলের আধুনিক শিক্ষার পক্ষে যথার্থ উপযোগী হয় এবং সকল অবস্থায় খাটে।'

স্কুলের মেয়েদের পানে তাকিয়ে নিবেদিতার বিস্ময় লাগে। ওরা কোনো নিয়মের মধ্যে বাঁধা পড়তে চায় না। পূজা অর্চনার সঙ্গে যেন ওদের জীবনের একটা নিগূঢ় যোগ। মাটি দিয়ে পুতুল গড়ে। দেয় তার চরণে ফুলের অর্ঘ্য। খেলা শেষে আবার তা ভেঙ্গে ফেলে। এই ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে ওদের অন্তর-জীবনের দুয়ার খোলে। জীবনটা নিয়ে তাদের তেমন ভাবনা নেই। ওটা তো একটা যন্ত্র। বিয়ের আগে এক ঘর, বিয়ে হয়ে গেলে আর একটা সংসার। সঙ্গে কি আছে ওদেব মূলধন? শুধু শুচি শুভ্র এক টুকরো চরিত্র। নিষ্কলঙ্ক কুমারী জীবনের শুচিতা।

শৈশবের লীলালীন প্রত্যূষে মায়েব মুখে শোনে ওরা রামায়ণ মহাভারতের গল্প। শেখে পূজা-পার্বণের নিয়মনিষ্ঠা।

নিবেদিতা অবাক। তার দেশে আর এদেশে কত ব্যবধান। ওখানকার মেয়েরা আপন সম্পত্তি ও স্বকীয় প্রতিষ্ঠার মোহে আবিষ্ট। আর এখানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ধারা। এরা জীবন সম্বন্ধে উদাসীন। ত্যাগ আর তিতিক্ষা একমাত্র সম্বল বলে জানতে শিখেছে।

নিবেদিতার অন্তরে নতুন রেখাসম্পাৎ হলো। ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে নিল সে। এ দুই দেশের মধ্যে একটা যোগ-বন্ধন গড়ে তুলতে পারলে উভয় দেশেরই তাতে লাভ।

কিন্তু কি ভাবে, কোন্ পথে এগিয়ে যাবে নিবেদিতা। তার মনে পড়ে গুরুর কথা—

'পিতৃপূজাকে রূপান্তরিত কর বীরপূজায়। তারপর মেয়েদের ভগবান সম্বন্ধে যার যেমন কল্পনা সেইমত মূর্তি গড়তে বা ছবি আঁকতে বল, ওদের পূজার্চনা করবার

জন্যে একটা-না-একটা কল্পমূর্তি তো তোমায় বাংলাতেই হবে। শিক্ষার আদর্শ হবে উদার। সকলের শাস্ত্রই শ্রদ্ধেয়,—শুধু হিন্দুর নয়, খ্রীষ্টান মুসলমান সবারই। কিন্তু পূজানুষ্ঠানে বৈদিক আচারই মানতে হবে—বেদীর নীচে থাকবে পূর্ণকুম্ভ আর ধূপ-দীপের উপচার। গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, পাখি সবরকম জন্তু-জানোয়ার যোগাড় কর, ওদের পরিচর্যা করতে শেখাও। পুরাতন কলা বা সূচী শিল্প ফিরিয়ে আনতে হবে,—ছুঁচে ফুল তোলা বা জরির কাজ এইসব। সব-কিছুর উদ্দেশ্য হল এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা; মানুষের সেবা কর, ভিখারী, রুগ্ন বা নিরন্নের পরিচর্যা কর, তাদের খেতে দাও, রোগে শুশ্রূষা কর। হৃদয় আর কর্মক্ষমতা একসঙ্গে উৎকর্ষিত হবে এমনি করে হাতে-কলমে সব ধরনের শিক্ষা পেলে।'

শ্রীগুরুর চরণ ভরসা করেই পথ চলতে লাগল নিবেদিতা। তার অক্লান্ত শ্রমে কি ফসল ফলবে না? নিশ্চয়ই ফলবে। এ আত্ম-প্রত্যয় নিবেদিতার আছে। তাছাড়া মায়ের আশীর্বাদ গুরুর শুভ ইচ্ছা এর তো একটা শক্তি আছে।

পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে লেডি অবলা বসুকে রাখতে চেয়েছিল নিবেদিতা। এ চাওয়াটা তার আন্তরিক নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু স্বামিজী মত দিলেন না। তিনি সম্পূর্ণ একক চিন্তার রূপায়ণ দেখতে চেয়েছিলেন এই বিদেশী মহিলার। তাই একাই পথ চল্‌তে বললেন। বললেন স্বামিজী, 'গোড়ায়ই ভুল করে বসার চেয়ে কারো সাহায্য না নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই আমি শতগুণে নিরাপদ মনে করি।'

বেলুড় ছেড়ে নিবেদিতা চলে এলো কলকাতায়। তাঁর ইচ্ছা মায়ের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতে। বাগবাজারের সেই ক্ষুদ্র পল্লীর উৎসঙ্গেই মা, মেয়ে নিরালায় বাস করবে। এবং সে অনুমতিও নিবেদিতা পেল। কিন্তু সমাজ তাকে অন্তর দিয়ে তখনও গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের সংস্কার-যুক্ত মন এই ভিন্‌দেশী শ্বেতাঙ্গ মহিলার একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিতে করল কার্পণ্য। তা বলে মায়ের কিন্তু বিন্দু ভাবনা নেই সেজন্যে। লোকে কত বলে। তা ব'লে কি এমন সোনার টুকরোকে দূরে ঠেলতে আছে?

নিবেদিতার মন ব্যথা পেল। ও বাড়ি ছেড়ে আঙিনার এক কোণে একটু ঠাঁই খুঁজে নিল নিবেদিতা। গুরুকে সব কথা বলল একদিন। স্বামিজী কয়েক দিনের মধ্যেই একটি বাড়ি বের করলেন খুঁজে। নিবেদিতা চলে এলো আট নম্বর বোস পাড়া লেনে।

কষ্টে ক্লিষ্টে দিন বয়ে চলল নিবেদিতার। সেজন্যে তার কোনো অভিযোগ নেই।

ব্রহ্মচারিণীর আর দেহসুখ কি! যে-কোনো পরিবেশেই তারা মানিয়ে চলতে পারে। তাহলেও গ্রীষ্মের দগ্ধ রুক্ষ হাওয়া বড় ক্লেশ দেয়। রাত্রে একটু ঘুমাতে পারে না নিবেদিতা। সংবাদটি এসে পৌছল শ্রীমায়ের কানে। স্নেহান্ধ মাতৃ-অন্তর হাহাকার করে উঠল। তিনি নিবেদিতাকে বললেন—রাত্রে তুমি আমার এখানেই শোবে। নিবেদিতার ভাষায়—"অপেক্ষাকৃত ভাল বন্দোবস্ত ছিল। তখন আর আমার জন্ম কোনো পৃথক ঘর নির্দিষ্ট ছিল না; অপর সকলে যে ঠাণ্ডা সাদা ঘরটিতে শয়ন করতেন, আমিও সেখানে শয়ন করতাম। লাল সুরকির পালিশ-করা মেঝের উপর সারি সারি মাদুর বিছানো, তার উপর এক একটি বালিশ ও মশারি, এই ছিল শয়নের আসবাব।"

কর্মজীবনে সঙ্গী জুটে যায়। নিবেদিতা তার স্কুল জীবনের বিরতিহীন অক্লান্তির মাঝে খুঁজে পেল সন্তোষিণীকে। বড় মিষ্টি মেয়ে। আপন ব্যক্তিত্বে অটল। স্বাধীনচেতা মেয়ে। স্বামী সারদানন্দ বলে—এ মেয়ে কি যে-সে?

আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে দিয়ে কাজ করানো শক্ত। বাবা দেখছে সম্বন্ধ। বিয়ে দিয়ে দেবে মেয়ের। ভারী গোঁড়াপ্রকৃতির লোক। মেয়ে বড় করে ঘরে রাখা নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু সন্তোষিণীর সন্তোষ হলো এতে বিঘ্নিত। তীব্রভাবে প্রতিবাদ করল সে। ডুকরে উঠল তার অন্তর। বলল সন্তোষিণী, 'আমায় তোমার কাছে রাখো, কিছুতেই আমি বিয়ে করব না। তার চেয়ে আমাকে মেরে ফেল।'

কিন্তু কেন? কেন সন্তোষিণী পরতে চাইছে না ললাটে সিঁদুর বিন্দু?

সন্তোষিণীর মন বলে—আমি থাকব চিরকুমারী। থাকব চিরদিন সিস্টারের কাছে কাছে। ওঁকে ছেড়ে থাকতে আমি পারব না।

স্বামী সারদানন্দ বললে, 'বেশ তো, ওকে আমাদের একজন করে নেই না কেন?'

কিন্তু সন্তোষিণী বললে অন্য কথা, 'বামুন ছাড়া আমি কারো সঙ্গে থাকতে পারব না।'

এ ভাব বেশি দিন রইল না তার। মনের অঙ্গন থেকে সংস্কারের আবিল ধুয়ে গেল। সন্তোষিণী তার নিজের ঠাঁই খুঁজে নিল। ছোট ছোট মেয়েদের ভার পড়ল তার 'পর। সকলের সঙ্গে মধুরকণ্ঠে কথা বলে সে। খোঁজ খবর নেয় সকলের।

বেশ ছন্দ সুরে বাঁধা বীণার মত বেজে ওঠল নিবেদিতা স্কুলের ঐকতান। মা খোঁজ নেন। পর্ব দিনে আসেন স্কুলে। ছোট মেয়েদের হাতভরে মিষ্টি বিলান। নিবেদিতাকে কাছে ডেকে বসান। দেন নানা ধরনের উপদেশ।

ছাত্রী-সংখ্যা হয়েছে এখন চল্লিশটি। কিন্তু খরচা চলে না। নিবেদিতার মন মাঝে মাঝেই ভেঙে পড়তে চায়। মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবে নিবেদিতা। কত কৃচ্ছ্র তার মধ্য দিয়ে দিন চলেছে, কোনও স্বাচ্ছন্দ্যের আশা দেখার উপায় নেই। ব্যক্তি জীবনকে নিয়ে এ দুঃসহ অনটনে পথ চলা গেলেও সমষ্টির বেলায় তা কি সম্ভব? একটা স্কুল পরিচালনা, সে তো আর সহজসাধ্য কাজ নয়। তাই নিবেদিতার বিন্দু বিশ্রান্তি নেই। দিবস রজনী ভাবে। ভাবনার আপ্লবে তার অন্তর মন তোলপাড় হয়ে যায়। স্বামী সদানন্দের কথা মনে পড়ে নিবেদিতার—'ভয় পাবেন না। সত্যকার দারিদ্র্য যাকে বলে তা তো এখনো এখানে উঁকিই দেয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদেহী হওয়ার পর বরানগরের পুরানো মঠবাড়িতে দারিদ্র্যের পীড়ন সহ্য করেছি বটে। গায়ে দেবার এক টুকরা কাপড় ছিল না, ভিক্ষা করে পেট ভরাতে হ'ত। বিকাল-বেলা স্বামিজী অল্পবয়সী ব্রহ্মচারীদের চেতিয়ে রাখবার জন্য মন্দিরা বাজিয়ে গান করতেন। তাঁর ভজন শুনতে শুনতে আমরা গানের আনন্দে ধ্যানের গভীরে ডুবে ভুলে যেতাম পেটের খিদে।'

এ যেন মরুর বুকে বারির বিন্দু।

সদানন্দের কথাগুলো নিবেদিতার চেতনাকে জাগ্রত করে রাখে। তার স্নায়ুর মধ্যে ধরিয়ে দেয় আগুন। মনোভঙ্গের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা প্রত্যয়ে দৃঢ় করে তার ঝিমানো অন্তরকে। নিজেকে বিলিয়ে দেয় দুঃখ, দৈন্য, অভাব, হাহাকারের মাঝে। পথ চলতে যে বিঘ্ন তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে বিন্দু দ্বিধা থাকে না। স্রোতের উজানে নৌকা বাইতে গেলে কষ্ট তো হবেই।

হেনরিয়েটার কাছ থেকে খুব বড় একটা কিছু সাহায্য সে আশা করেছিল। কিন্তু আদর্শের সংঘাত দেখা দিল। খ্রীষ্টানের আদর্শে ও সেবায় হেনরিয়েটা দৃঢ় মন। কিন্তু স্বামিজীর পরিকল্পনার ধরনটা অন্যরকম। নিবেদিতা তা থেকে বিন্দু বিচ্যুতি পছন্দ করে না। তাই বাধ্য হলো নিবেদিতা হেনরিয়েটাকে বলতে, 'তোমার কাছ থেকে আমি কিছু নিতে পারি না। তুমি কিছু মনে করো না। আমি একাই খেটে যাব। মা আছেন।'

আর ভয় নেই। নিবেদিতা বুঝতে শিখেছে, জানতে শিখেছে—তার এ প্রচেষ্টার পশ্চাতে রয়েছে জগন্মাতার অশেষ আশিস্। তাঁরা যে একই পরিবারভুক্ত।

দিনে দিনে স্কুলের মেয়েরা সিস্টারকে মনের মন বলে গ্রহণ করে নিল।

ওদিকে আবার অভিভাবকদের অত্যাচারও তাকে সহ্য করতে হয়। সে কি কম জ্বালা? যদি বা স্কুল খোলা হলো, ছাত্রীদের আসতে দিতে চায় না তাদের

বাবা, মা। বলে কিনা—হিন্দু মেয়ে হ'য়ে যাবে পড়াশোনা করতে বাইরে। এও কি সম্ভব!

অন্দরের আগল ঠেলে তাদের আলোর তীর্থে আসবার অধিকারটুকু পর্যন্ত সেদিনের রক্ষণশীল সমাজ ধরে রেখেছিল। সংস্কারের কুক্ষিতে আবদ্ধ করে দিনের পর দিন এগিয়ে দিয়েছে মূক নারীকে ক্ষয়িত জীবনের মৃত্যু-মোহনায়। অন্তরে তাদের অজস্র কান্নার ঢেউ জেগেছে। কিন্তু বাইরে প্রকাশ করবার অধিকার থেকে তারা চিরবঞ্চিত।

এমনি একটি পটভূমিকায় নিবেদিতার আত্ম-প্রকাশ একটি জাগ্রত প্রতিবাদের মত। সে নিয়ে এসেছে ক্রান্তির সংবাদ। এনেছে জীবন-বিপ্লবের অভী মন্ত্র। কে রুখতে পারে বিপ্লবের সূর্য-সকালকে প্রদোষের অন্ধকারে? কে পারে স্রোধবতীর প্লাবনকে বন্ধন শৃংখলে আবদ্ধ করতে?

নিবেদিতা মুঠা মুঠা ছড়িয়ে দিতে লাগল আলো। মানুষের মনের রুদ্ধ দরজায় আঘাত হানল সজোরে। ধীরে ধীরে আলোর পথে এগিয়ে আসতে লাগল ভ্রান্ত পথযাত্রী। নিবেদিতার স্কুলের ঘরগুলো রূপান্তরিত হলো ফুলের জলসায়। এলো কুমারী। এলো বয়ঃপ্রাপ্তা। এলো বধূ, গৃহিণী ও বিধবা।

এমনি দিনে নিবেদিতার পাশে এসে দাঁড়াল ক্রিস্টিন ও সুধীরা। ১৮৯৪ সালে ক্রিস্টিন লাভ করেছে স্বামিজীর প্রত্যক্ষ কৃপা। উৎসর্গ করেছে জীবন। ভারতীর পূজায় আমেরিকান ফুল এসে লুটিয়ে পড়েছে অর্পণের আনন্দে।

নিবেদিতা অনেকগুলো কাজের দায়িত্ব তুলে দিলে ক্রিস্টিনার'পর। হলো অনেকটা নিশ্চিন্ত।

আর সুধীরা?

সুধীরা যুববাংলার কাছ থেকে আহরণ করেছে প্রাণ। বিপ্লবের অগ্নি সাক্ষী করে নেমেছে কাজে। ও কি যে-সে? স্বামী প্রজ্ঞানন্দের বোন সুধীরা। বিপ্লবী ভাইয়ের প্রভাব তার জীবনে একটা নতুন দৃষ্টি এনে দিয়েছে। সুধীরা মানুষের সেবা করবে না তো কে—। সুধীরা এসেও দাঁড়াল নিবেদিতার পাশে। ১৭ নম্বর বোস পাড়া লেনের এ ক্ষুদ্র গণ্ডিটুকু কেবল শিক্ষা ও সেবা কেন্দ্রেই সীমিত রয়নি, বিস্তৃত হয়েছে বৃহত্তর ক্ষেত্রে। মানুষের কানে শুনিয়েছে তাদের পবিত্র অধিকার অর্জনের মন্ত্র। দিয়েছে শৃংখল ছিঁড়বার দুর্জয় শক্তি। বিপ্লবী বাংলা তথা ভারতের হৃদ্‌স্পন্দনের মতই ১৭ নম্বর বোস পাড়া লেন সেদিন যুবভারতের বুকে অগ্নিবন্যার মাতন জাগিয়ে দিয়েছিল।

মিস্ ম্যাকলয়েড জানে নিবেদিতা এখন ব্রহ্মচারিণী। ধারণ করেছে ব্রত। হয়েছে শাক্ত যোগিনী। গুরুর চরণকমলে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করেছে নিজেকে। আপন সত্তা বলতে কিছু নেই আর নিবেদিতার। সন্ন্যস্ত-চিত্ত। বাইরের বিত্ত, যশ, নাম কিছুতে নেই তার আসক্তি। সন্মার্গের পথ পরিক্রম করতে হলে ঠিক এমন করেই সন্নত হতে হয়। নিতে হয় প্রণতির দীক্ষা।

কিন্তু ওর পানে মিস্ ম্যাকলয়েড তাকাতে পারে না যেন। তার অন্তরটা হাহাকার করে ওঠে। একদিন স্বামিজীকে বলেই ফেলল ম্যাকলয়েড, বললে রুষ্টকণ্ঠে, —'এ কি করছেন নিবেদিতার ?'

স্বামিজী প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ওর জন্য দুঃখ করো না। ও এখন সব-কিছুর ঊর্ধ্বে, ভারতবর্ষের কাজে ও নিবেদিতা। দোহাই তোমাদের, ওকে মাটি করে দিও না। সবার চেয়ে ওর পেছনে আমাকে অনেক শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছে।'

স্কুলের কাজ শেষ হয়ে গেলে নিবেদিতা বসে বাইরের কাজ করতে। লেখে প্রবন্ধ। ছাপা হয় ভারতের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে। 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে' ম্যাক্‌স্‌মুলারের শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীর ওপর নিবেদিতা একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখল। চতুর্দিকে নাম পড়ল তার ছড়িয়ে। পশ্চিমেব চোখ পড়ল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 'পর। শ্রদ্ধায় নত করল তারা শির। ভারতের আত্মসত্যকে তুলে ধরল নিবেদিতা, তুলে ধরল তার অজেয় লেখনীমুখে।

বিরামহীন গতি। নিবেদিতার বিন্দু বিশ্রাম নেই। একদিন অখণ্ড বিশ্রামের জ্বালা তার দুঃসহ মনে হয়েছিল। আর আজ সে একটু সময় পাচ্ছে না। দিন দিন নানা কাজের চাপে ও এখন একটা মুহূর্তকেও ছেড়ে দিতে পারে না। এমনি দিনে 'এক্সপ্রেস' পত্রিকা থেকে প্রবন্ধ চেয়ে বসল নিবেদিতার কাছে। নিবেদিতা ধারা-বাহিক প্রবন্ধ লিখে চলল। সে লেখার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল মহাভারতের আত্মার স্বাক্ষর। ধ্বনিত হলো অনাদিকালের জীবন-সঙ্গীত।

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের চোখের রং বদলাতে লাগল। একটা দল বেশ প্রীতির ছায়ায় নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা জানাল। প্রগতিপন্থী হিন্দু সমাজ এই সুযোগে মুখপাত্র করল ব্রাহ্ম সমাজকে। প্রকাশ্যে ঘোষণা করে চলল নিবেদিতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ। তারা দ্বিধাহীনের মত লিখল, 'আপনার লেখাগুলোতে



ব্রাউনিঙের রস আছে, ভাবালুতায় ছড়াছড়ি যথেষ্ট। কিন্তু যে ত্যাগ-বৈরাগ্যের বুলি আপনি কপচাচ্ছেন—ও থেকে জন্মেছে মেরুদণ্ডহীনতা আর কাপুরুষতা। তাতেই তো আমাদের এই হাল। রামকৃষ্ণের শিক্ষার মূলে যে অন্ধ বিশ্বাস, এ সবের উৎপত্তি হচ্ছে তাই থেকে......'

লেখাটা নিবেদিতার সামনে তুলে ধরল তারই এক বন্ধু। পড়ল মার্গট নিবিষ্ট মনে ওদের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু নিবেদিতা বলবে, তার কথা সে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবে সবাইকে। যে পথে আলো আছে, আনন্দ আছে, আছে জীবন-সৌন্দর্যের মহিমময় প্রকাশ—সে পথ নিবেদিতা সকলের সামনে তুলে ধরবে। আনন্দের ভোজে আমন্ত্রণ করবে তৃষ্ণাক্লিষ্ট হৃদয়গুলোকে।

মিস্ ম্যাকলয়েড তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিল নিবেদিতার। ব্যবস্থা করা হলো একটা সংবর্ধনা সভার। শাক্ত যোগিনী নিবেদিতা মন্দ্র কণ্ঠে তার কথা বলে গেল। বলে গেল শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন-দর্শনের বার্তা। যে অদ্বয়তত্ত্বে বিশ্বাস করেন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানেরা, সেই একই বিশ্বাসের পথে চলছে নাকি ব্রাহ্ম সমাজীরা? যদি তাই হয়, তবে কি সেই এক এবং অদ্বিতীয় আদি মন্ত্র 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' কি ধ্বনিত হয় না সকলের হৃদয়ে?

পৌত্তলিকতা এবং হিন্দুর দেবদেবী সম্বন্ধে নিবেদিতা গুরুর মতবাদকেই হৃদয়গত করে নিয়েছে।

স্বামীজী বলতেন, "একটা জাতিকে বুঝতে হ'লে তার সব-কিছু গ্রহণ করতে হবে। ভারতবর্ষ পৌত্তলিক? সে যা তা-ই থাক, আমাদের কাজ শুধু তাকে সাহায্য করা।"

নিবেদিতাও মাথা রাখে ভারতবর্ষের দেবদেবীর পায়ে। অন্তরের অজস্র আর্তি-নিবেদন করে চোখের জলে, "হে দেবতা, তুমি দুর্জ্ঞেয়। তোমার যতটুকু বুঝি, যা পেয়েছি হাতের মুঠোয়, তারই অর্চনা করি। অপূর্ণ মানুষ আমি, এর বেশী আর কী-ই বা করতে পারি?......এ পর্যন্ত এমন কিছু তো চোখে পড়ল না, যাকে নিছক জড়োপাসনার কোঠায় ফেলতে পারি। অথচ ব্রাহ্ম সমাজের বন্ধুরা বলেন, 'ভারত নাকি পৌত্তলিক'।"

মূর্তি থেকেই পৌঁছে যেতে হবে মর্মে। সান্ত থেকে যাত্রা করতে হবে অনন্তে। রূপের ধ্যানের শেষ প্রান্তে এসেই না দেখা মিলবে অখণ্ড অরূপের! যদি তাই হয়, তবে আর ভাবনা কি? সাকারের সকাল থেকে ওরে মন চলে আয় নিরাকারের নিস্তরঙ্গ আলোক-তীর্থে।

যুক্তি আর জিজ্ঞাসা। এ নিয়েই নিবেদিতা এতটা কাল পথ চলেছে। কিন্তু আজ তার অদ্বৈত ভাবনার মধ্যে কেন দ্বৈতের দ্বার খুলে গেল? এ মন্দিরে তার কি প্রত্যাশা!

প্রত্যাশা একটা আছে। আছে এর পেছনে লুকানো একটা নিগূঢ় রহস্য। সংশয়ের সন্ধ্যায় অবুঝের মতো পথ চলতে নিবেদিতা শেখেনি। প্রত্যয়দৃঢ় মন তার প্রমাণ ও সত্যকেই বরণ করেছে। প্রতীকের সামনে উপাসিকার গৈরিক বাস পরে নিবেদিতা বসেছে। বসেছে একটা মস্ত রূপান্তরের অভিলাষে। সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে এক আকাশ-উলঙ্গ আলোর মধ্যে ডুবে যাবার সাধনাতেই তো সে তন্ময়। সারাটা জীবনের সঞ্চয়ের বিনিময়ে শুধু এটুকু চেয়েই সে খালাস হতে চেয়েছে। তা কি পাবে না নিবেদিতা?

পাবে, নিশ্চয়ই পাবে। গুরুর কৃপাতেই খুলে যাবে তার চেতনার দুয়ার। প্রকীর্ণ হবে আলোর আপ্লব। নিবেদিতা তখন বুঝবে দ্বৈত আর অদ্বৈতের প্রভেদটা কি?

এমনি দিনে নিবেদিতা শুনল রবীন্দ্রনাথের নাম। কবি-প্রতিভা তখন বাংলার আকাশে প্রোজ্জ্বল অংশুমানের মতই প্রদীপ্ত। মহর্ষির যোগ্য পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা হলো নিবেদিতার।

শিলাইদহ থেকে কবি ফিরেছেন কলকাতায়।

থাকছেন জোড়াসাঁকোতে।

নিবেদিতা এলো—

এলো একদিন ঠাকুরবাড়িতে। কবি এ বিদেশী কন্যার কাহিনী কিছু কিছু শুনেছেন আগেই। এবারে দর্শনের পালা। কি আশ্চর্য! প্রথম দর্শনেই মর্ম স্পর্শনের আনন্দ লাভ করলেন কবি। একটা নিবিড় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বোধ করলেন রবীন্দ্রনাথ। ক্রমে নিবেদিতা হয়ে উঠলেন ঠাকুরবাড়ির এক মান্য অতিথি। অবনীন্দ্রনাথ ও সরলাদেবীর সঙ্গেও পরিচয় হলো নিবেদিতার। শুধু পরিচয়ই নয়—ক্রমে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। তখনকার ঠাকুরবাড়ি ছিল একটি সুস্থ সুন্দর সংস্কৃতির কেন্দ্রপীঠ। এ পরিবেশ নিবেদিতার মনকে বিশেষভাবে করল আকর্ষণ।

এমনি দিনে রাজরোষে দণ্ডিত হলেন তিলক। মহারাষ্ট্রের বীর বিদ্রোহী, দেশবরেণ্য নেতার কাহিনী নিবেদিতা শুনেছে ভারতবর্ষে এসে। এ সংবাদে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত চঞ্চল হয়ে গেল। হলেন তিনি বিচলিত। দেশের এই দুর্দিনে কবি-মন মগ্ন হয়ে গেল। এক সভার আয়োজন করা হলো টাউন হলে। সভায় রবীন্দ্রনাথ পাঠ করলেন 'কণ্ঠরোধ' নামে এক প্রবন্ধ। রাজদ্রোহ আইনের বিরুদ্ধে

এ এক জাগ্রত প্রতিবাদ। কল্পনাবিলাসী কবি সম্বন্ধে নিবেদিতার ধারণাটা সম্পূর্ণ পাল্‌টে গেল। নিবেদিতা বুঝল—কবি বাস্তব জগতের সুখ, দুঃখ, কান্না, হাহাকারের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়িত। শুধু তাই নয়—পরাধীন ভারতের শৃংখল ছেঁড়ার সাধনাতেও কবি কারো থেকে পিছিয়ে নেই।

কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে নিবেদিতার মন ভরে ওঠে। কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন থেকে শাক্ত যোগিনী নিবেদিতার কাছে এক পরম জন হিসাবেই আদরের হয়ে উঠলেন। ঠাকুরবাড়িতে আসে নিবেদিতা। বসে কবির মুখোমুখী। চলতে থাকে নানা ধরনের আলাপ আলোচনা। কখনো বা কবি আবৃত্তি করেন সুরেলা কণ্ঠে কবিতা। নিবেদিতার কাছে তা যেন মন্ত্রের মতো মনে হয়। মনে হয় যেন প্রেমের অমিয় নির্ঝর। তন্ময়ের মতো তাকিয়ে থাকে নিবেদিতা। ডুবে যায় অতল গভীরে। কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মগ্ন হয়ে থাকেন দুজনেই আনন্দের অথৈ সরসীতে।

কিন্তু এত কাছাকাছি এসেও কোথায় যেন থেকে যায় একটা দুস্তর ব্যবধান। নিবেদিতার আড়ম্বরহীন বৈঠকখানায়ও অনেকদিন রবীন্দ্রনাথ এসেছেন। বসেছেন দুজনে। আলাপ সেখানেও প্রতিদিনই জমে উঠত। তবুও সহজ বোঝাবুঝিটার পথে পা দিয়েই কবি আর খুঁজে পেতেন না নিবেদিতাকে। নৈকট্যের মন্দিরে বসে কবি যেন শুনতে পেতেন একটা আপাত বিরোধের সঙ্গীত। মনটা নিবেদিতার এক-রোখা সত্যি। যুক্তিবাদীও বটে। সত্যকে গ্রহণ করতে গিয়ে মিথ্যার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতে তার দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। এত সব থেকেও কি যেন নেই তার। তা হলেও নিবেদিতার মানস কল্পনার ঔদার্য কবিকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করল। করল তাঁর অন্তরে একটা সৃষ্টির রেখাপাত। যার প্রত্যক্ষ ফসল আমরা পেলাম 'গোরা'তে।

কবির মেয়ের ইংরেজী শিক্ষার দায়টা তিনি চান নিবেদিতার 'পর ন্যস্ত করতে। এ প্রস্তাব একদিন করলেন রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার কাছে।

নিবেদিতা মনে মনে বেশ রুষ্টা হলো। বলল দ্বিধাহীন কণ্ঠে, "সে কী! ঠাকুর-বাড়ির মেয়েকে বুঝি বিলিতি মেম বানাবেন?"

বললেন কবি, "ইংরেজী ভাষাটা শেখাতে চাই। আর সেই ভাষার মারফৎ যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই শিক্ষা।"

চোখ দুটো রক্তাভ হয়ে যায় নিবেদিতার। বলতে থাকে গম্ভীর কণ্ঠে, "ঠাকুর-বাড়ির লোক হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতায় আপনি এমনই আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন যে,

নিজের মেয়েকে ফোটবার আগেই নষ্ট করে ফেলতে চান? বাঁধা নিয়মে বিদেশী শিক্ষায় নিজের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে চাপা দেওয়া আমি আদৌ পছন্দ করি না।"

কবিকণ্ঠ সেদিন নিবেদিতার যুক্তির কোনো জবাব দিতে পারে নি। না পারলেও নিবেদিতার এই দৃঢ়তাই তাকে আরো নিয়ে এলো কবির কাছে। করে তুলল শ্রদ্ধার পাত্রী।

অধ্যাত্ম-জীবন আর ব্যক্তি-জীবনের মাঝের এই ব্যবধানটুকু কবি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতেন না। অধ্যাত্ম-জীবনটি তার সম্পূর্ণভাবেই ছিল নিবেদিত। কিন্তু ব্যক্তি-জীবনটি?

সেখানে নিবেদিতা অতন্দ্রিত প্রহরী। অভ্রান্ত যুক্তি আর বিচারবুদ্ধির শানিত সমাধানই তার পথ করে দিত। ভাবের বা কল্পনার নেশায় নিবেদিতা মগ্ন হয়ে পথ চলত না। জীবন সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা তার ছিল। এবং তা ছিল বলেই স্বাধীন ও দৃঢ় মতবাদ প্রকাশের ভাষা তার কণ্ঠে আপনি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত। এই গেল তার বাইরের জগতের পরিচয়।

কিন্তু অন্তর জগৎ?

সেখানে নিবেদিতা আত্ম-ভোলা শিবের সোহাগী। নিজের সব-কিছুকে ডুবিয়ে দিয়েছে গুরুর মধ্যে। এখানে নিবেদিতার নেই কোনো আত্ম-বিশ্লেষণ। নেই কোনো বিচার, বুদ্ধি, যুক্তি ও জিজ্ঞাসা।

সেদিন মুখোমুখী বসে কবি ও নিবেদিতা। আলোচনার বিষয় ছিল একটি দর্শনের পুস্তক। সহসা কে যেন এলো। এলো বেলুড় থেকে। বলল নিবেদিতাকে —আপনাকে স্বামীজী বেলুড়ে ডেকেছেন।

মুখর নিবেদিতা স্তব্ধ হয়ে গেল।

তার সমস্ত বুদ্ধির খরস্রোতে কে যেন প্রচণ্ড বাঁধ দিয়ে দিলে। থেমে গেল নিবেদিতা। বদলে গেল তার মুখের আদল। তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব যেন সহসা নির্গলিত নিবেদনে আনত হয়ে পড়ল। কবির দৃষ্টি থেকে তা এড়াল না। তাছাড়া নিবেদিতাও গোপন করল না কিছুই। বিনীত কণ্ঠে বলল নিবেদিতা—"স্বামীজীর আশীর্বাদ অনুক্ষণ আমাকে ঘিরে আছে। আমাকে যেতে হবে।"

বলেই উঠে পড়ে নিবেদিতা। কবির চোখে নামে বিস্ময়ের কুয়াশা। তিনি শুধু অস্ফুটে বলেন, "নিবেদিতা অন্তরের ভক্তি নিবেদন করবার মানুষ পেয়েছেন!"

স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "মার্গট, এবারে ব্রাহ্মদের ব্যূহ ভেদ কর দেখি।"

গুরুর আদেশকে নিবেদিতা সেদিন অন্তর দিয়েই গ্রহণ করেছিল। ব্যূহ ভেদ সে করতে পেরেছে। অন্তরের স্পর্শে হৃদয়ের মমতায় তার বিরোধীরাও এগিয়ে এসেছে তার সান্নিধ্যপ্রার্থী হয়ে। হৃদয় দিয়ে হৃদি। প্রাণের স্পর্শে পাষাণও গলে হয় নির্গলিত ঝরণা। তাই তো নিবেদিতা সকলের অন্তরে শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠল।

ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে নিবেদিতার একটা অন্তরের যোগ-বন্ধন স্থাপিত হলো। বিশেষ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার হৃদ্যতার ভাবটা বেশ গভীর হয়ে উঠল। নিবেদিতা কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে চলে আসে শিলাইদহ—পদ্মার পারে। এখানে কবির জমিদারী।

তরঙ্গমন্দ্রিত পদ্মা।

উচ্ছল কল কল করে বয়ে যায়। পাড় ভাঙ্গে। গতি তার অশ্রান্ত। উদ্দাম।

পদ্মার এই উদ্দাম খ্যাপামি নিবেদিতার বড় ভালো লাগে। ভালো লাগে শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন তার চলার গতিছন্দ। পদ্মার সঙ্গে নিবেদিতার অন্তরের কোথায় যেন একটা গভীর মিল রয়েছে। প্রায়ই পদ্মার পাড়ে এসে দাঁড়ায় নিবেদিতা। সঙ্গে থাকেন কবি রবীন্দ্রনাথ। স্তব্ধ শান্ত উষাক্ষণে পদ্মার অপূর্ব সৌন্দর্যের পানে অপলক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে নিবেদিতা। শুধু কি তাই? চাষারা মাঠে যায়। কাঁধে লাঙ্গল। কখনো তারা থমকে দাঁড়ায়। তাকিয়ে থাকে নিবেদিতার পানে। কেন? কি দেখছে তারা?

দেখছে এক মেমসাহেবকে। কিন্তু তার পরিধানে কেন ভারতবর্ষের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক গৈরিক বসন!

বিস্ময় লাগে তাদের। কিন্তু ভরসা পায় না কিছু জিজ্ঞেস করতে। সহসা নিবেদিতা ছুটে যায় তাদের কাছে। সরল শিশুর মত প্রশ্ন করে নিবেদিতা, প্রশ্ন করে কৃষকদের কাছে, "কেন দাঁড়িয়ে আছ তোমরা? কি দেখছ?"

ওরা বললে, "আমরা মেমসাহেব দেখছি।"

"তোমাদের ঘর কতদূর?"

ওরা বলে, "ঐ যে—ঐখানে।"

বললে নিবেদিতা, "চলো—, তোমাদের গাঁয়ে যাবো।"

পদ্মার পাড়ে পাড়ে, ধানবনের ফাঁকে ফাঁকে লীলায়িত যে জীবন তার সঙ্গে পরিচিতা হলো নিবেদিতা। পরিচিতা হলো তাদের দুঃখ, দৈন্য, হাহাকারের সঙ্গে। যাদের চোখের জলের হিসেব কেউ নেয় না, নেয় না যুগ-সঞ্চিত বক্ষ-জোড়া কান্নার কাহিনীর সংবাদ—তাদের জন্য নিবেদিতার অন্তর কাঁদে। চোখ ফেটে জলের ধারা

নামে। মৌন মূর্ছনায় প্রশান্ত হয়ে বসে থাকে সে। দেখে প্রকৃত ভারতের প্রতিচ্ছবি মাঝি-মাল্লা ও চাষীদের জীবন-ছন্দের মধ্যে। সংসারের এই চির-অবহেলিত মানুষদের জন্য নিবেদিতার বড় ভাবনা। ওদের মুখে হাসি ফোটাবার সাধনাই সে গ্রহণ করবে। দীন, দরিদ্রের মাঝে বিলিয়ে দেবে নিজেকে। আত্মার আত্মীয় করে নেবে সকলকে। তাইতো সে তাদের অন্দরের কাহিনীকে জেনে নিল। জেনে নিল তাদের দৈনন্দিন জীবন-ছন্দের ছন্দটি।

এমনি করে নিবেদিতা উদ্‌ঘাটন করল প্রকৃত ভারতের স্বরূপ। পদ্মার রজতশুভ্র তরঙ্গ তার কানে কানে কয়ে গেল অনাদিকালের কাহিনী।

উৎকর্ণ হয়ে শুনল নিবেদিতা। হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করল পদ্মার পেলব স্নিগ্ধ মাধুরী। এমন বিরাট আকাশ, নদী, বন তার অন্তরকে করল উদার ঐশ্বর্যে ভরপুর। নিবেদিতা প্রাণের বিনিময়ে আকর্ষণ করলো সবাইকে।

ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে বিশেষভাবে নিবেদিতার অন্তরের একটা যোগাযোগ হয়ে গেল। নিবেদিতা একদিন তার ব্রাহ্ম বন্ধুদের আমন্ত্রণ করল তার স্কুলে। আমন্ত্রণ করল একটি 'টি-পার্টিতে'। এলেন স্বামীজীও। সবাই একই টেবিলে বসে করলেন চা পান। কত গল্প করল নিবেদিতা তাদের সঙ্গে। ভ্রান্ত সংস্কারের অবরোধকে ও ভাঙতে জানে। জীবনকে একটি স্পষ্ট স্বচ্ছ প্রশ্নের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে তার জবাব দিতে নিবেদিতার কুণ্ঠা নেই বিন্দুও। একটি বিদেশী মেয়ের এ ধরনের উদারতা ব্রাহ্মদের মনে রেখাপাত করল। তাঁরা নিবেদিতার সঙ্গে সৌহার্দ্যের সূত্রে বাঁধা পড়ে গেলেন। এমনি দিনে সরলা ঘোষের সঙ্গেও নিবেদিতার অন্তরের বেশ একটা মধুর যোগাযোগ চলছিল। দুজনে মিলে একটা পাঠচক্র গড়ে তোলবার আয়োজন করছিল। এই সময়ে নিবেদিতাকে নানা স্থানে ভাষণ দিতে হয়েছে। কলকাতার বহু রঙ্গালয়ে সে বক্তৃতা করত। বক্তৃতা করত শিক্ষা আর ধর্ম সম্বন্ধে।

নিবেদিতার উদার মতবাদের কাছে নতি স্বীকার করেছিল ঠাকুর-পরিবারের একটি ছেলে। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন মাঝে মাঝেই আসত নিবেদিতার কাছে। বলত এদেশের দুঃখী, দরিদ্র ও চাষীদের কথা। নিবেদিতা উৎকর্ণ হয়ে শুনত। ঘণ্টা ঘণ্টা কেটে যেত। দুজনে দেশের কথায় ডুবে থাকত।

সুরেন ক্রমে ক্রমে তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আসতে লাগল নিবেদিতার কাছে। নিবেদিতা-স্কুলটি সুরেনের ভারি ভালো লাগে। বন্ধুদের কাছে সুরেন বলে নিবেদিতার গুণাবলীর কথা। নাটোরের মহারাজাকে বলল একদিন সে, "দেখুন, এই বিদ্যালয় হতে কালে বড় একটা কিছু গড়ে উঠবে। ছাত্রীরা কেমন স্বচ্ছ আনন্দে

এখানে বেড়ে উঠছে। দেশের ভবিষ্যৎ দৃপ্ত মহিমাকে নিবেদিতা এমনি করে রূপ দিচ্ছেন।"

সুরেন্দ্র নিবেদিতার কাজ করতে চায়। কিন্তু দুঃখ করে সুরেন্দ্র বলে, "আমি এখনো ছেলেমানুষ। আপনার কাজ করবার মত বয়স আমার হয়নি। কিন্তু কি করব আপনার জন্য, বলুন না ?"

নিবেদিতা আদর করে তাকে কাছে ডেকে বলে, "যে সব চাষী তোমার জিম্মায় আছে তাদের ভার নাও। তাদের যন্ত্রপাতি যোগাও। ভাল বাড়ী-ঘর করে দাও। জমির খাজনা কমাও। তাদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাও। বুড়োদের দেখাশোনা কর। একটা জীবনের পক্ষে এই কাজই তো ঢের।"

সুরেন্দ্রের হৃদয়ের তন্ত্রীতে কথাগুলো যেন মন্ত্রের মত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। বড় ভালো লাগে এই জীবনযুক্ত সত্যের সার্বিক প্রকাশ। সুরেন্দ্রনাথের মস্তক শ্রদ্ধায় আনত হয়ে পড়ে। নিবেদিতা বলে, "পরের জন্যে কাজ করা—এও তো 'তপস্যা' এটা বোঝ তো ?"

দিনের পর দিন তো এগিয়েই চলেছে। তাঁরই কাজে নেমেছে। তাঁরই কাজ করছে। একই আত্মার অনুরণন বিশ্ব নিখিলের মাটিতে ও মর্মে ছড়িয়ে আছে। কাজ কর। কাজের মত কাজ। জনসেবার মধ্য দিয়ে জনধাতার সেবা কর। কর তার পূজা অর্চা।

বুঝিবা ব্রাহ্ম সুরেন্দ্রনাথ নিবেদিতার কথাগুলো শুনে একটু আঘাত পেল। বলল তাই, "জানি, আমার অজানতে আপনি আমায় হিন্দু করতে চাইছেন।"

বলল নিবেদিতা, "হয়ত তাই। ঠিকই বোধ হয় বলেছ তুমি। কারণ আমার কাজ করতে চাও না ? ওতে কিন্তু আমাবই কাজ করা হচ্ছে...............”

বিরোধিতার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে নৈকট্যের মন্দির। সেখানে এসে দাঁড়াতে পারলে না জানি কত শান্তি। কত তৃপ্তি।

ছাদের 'পর ছোট একটি চিলে-কোঠা।

বেশ মনোরম পরিবেশ। আকাশের নীল, মলয়ের স্নেহ অজস্র ধারে বর্ষণ হয় ওখানটায়। রাত্রে যখন চাঁদ ওঠে, বাতায়নের দুয়ার খুলে তখন বসে থাকেন বসে থাকেন ব্রাহ্ম সমাজের কর্ণধার দেবেন ঠাকুর।

কেবল কি ঘরেরই দুয়ার খোলেন শুধু ?

না।

তবে ?

মনের দরজাটিও খুলে দেন। থাকেন মুদিত নয়নে বসে। বাইরের কলকোলাহল তখন থেমে যায়। বিকিরিত হয় আত্মজ্যোতি। আবেশে অবশ হয়ে যায় দেহ। স্বেদ-সিক্ত স্বর্ণতনুটির বাহ্যিক জ্ঞান বলতে কিছু থাকে না। দেবেন ঠাকুর ধ্যান-শান্ত। প্রাপ্তির আনন্দে পুলক-মদির।

নিবেদিতার মনটা কদ্দিন ধরেই বেশ উৎসুক হয়ে উঠেছে।—আমি দেবেন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করব।

কথাটা বললেন বন্ধুর কাছে—"পারো আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে?"

"এ আর এমন শক্ত কাজ কি। বেশ তো, চলুন দেখা হবে।"

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা পাকা কথা হয়ে গেল। সুরেন নিয়ে যাবে সঙ্গে করে নিবেদিতাকে।

দেবেন ঠাকুরের জন্মভিটা—ঠাকুরবাড়ি।

সেই ছাদের ছোট্ট ঘরটিতে বসে আছেন মহর্ষি। আজানুলম্বিত বাহু। আকর্ণ বিস্তৃত আয়ত আঁখি। প্রশস্ত ললাট। উন্নত নাক। বসে কি ভাবছেন যেন।

নিবেদিতা ঘরে ঢুকল।

অপলক দৃষ্টি। কি দেখছে মার্গট?

দেখছে জ্যোতির জোয়ার। এ তো দেহ নয়—যেন দীপ্তির আধার।

শুধু ক্ষরণ হচ্ছে স্নিগ্ধ কান্তি। দিব্য জ্যোতি। নিবেদিতার অন্তর শ্রদ্ধায় ভরে গেল। প্রণাম করল, অন্তরের প্রণাম। সঙ্গে স্বামীজীর প্রণতিটিও রাখল নিবেদিতা, রাখল মহর্ষির চরণ-তীর্থে।

মহর্ষির দৃষ্টিও অপলক। নিবেদিতার পানে তাকিয়ে কত কথা না আজ মনে পড়ছে।

ব্রাহ্ম সমাজের একনিষ্ঠ সাধক নরেন দত্ত। উপাসনা করে। গান গায়। জীবনের পরমকে চরম হয়ে খোঁজে।

কিন্তু কোথায়, কোথায় সেই অন্তর সুন্দর! কোন্ অসীমে তাঁর স্থিতি? কোন্ গহন অন্তরে তাঁর বসতি? কেউ কি দেখেছে তাঁকে? কেউ কি জানতে পেরেছে তাঁর হদিস, তাঁর ঠিকানা।

মত্ত মন। মানে না কোনো বাধা। যুক্তির জোয়ারে ভেসে যায় ভক্তির ভাবালুতা। 'ট্রুথ্ চাই, প্রুফ চাই' বলে অধীর নরেন ছুটে চলে। যাকে দেখে তাকেই শুধায়—তুমি কি ঈশ্বর দেখেছ?

এত বড় একটা রূঢ় সত্যের জবাব দেবে কে?

অবশেষে একদিন নরেন যাত্রা করল,

যাত্রা করল দেবেন ঠাকুরের উদ্দেশে।

গঙ্গা।

তারই বুকে বোট বাঁধা দেবেন ঠাকুরের। দেবেন্দ্রনাথ থাকেন তখন বোটেই। ছোট্ট নরেন। কি-ই বা হয়েছে বয়স? এসে দাঁড়াল গঙ্গার পাড়ে। কল্লোলিনী গঙ্গা। বয়ে চলেছে কুলুকুলু নাদে। আর কোনো কথা নেই। তার অন্তর যে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। সেখানকার তুফান সে কেমন করে থামাবে? কেমন করে রোধ করবে সেই অজস্র প্রশ্নের খরস্রোতকে। ঝাঁপিয়ে পড়ল নরেন। সাঁতরে এসে ধরল বজরার গলুইটা দু' হাতে। উঠে এলো বোটে। বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ঘন ঘন বইতে লাগল শ্বাস। শরীরটা যেন অবসন্ন হয়ে আসতে চায় তার।

সহসা মহর্ষি চমকে উঠলেন।

ভেঙে গেল তাঁর ধ্যান। তাকালেন চোখ মেলে।

নরেন দাঁড়াল গিয়ে দেবেন ঠাকুরের সামনে। ভূমিকাহীন একটি প্রশ্ন—"আপনি ঈশ্বর দেখেন কি? আমিও দেখব তাঁকে।"

আবার বললে, "পারেন আমাকে বুঝিয়ে দিতে অদ্বৈতবাদ?"

শুধু তাই নয়, নরেনের চোখে মুখে স্পষ্ট প্রতিভাসিত হয়ে উঠল অজস্র প্রশ্নের শর। অপলক তাকিয়ে থাকেন দেবেন্দ্রনাথ। বিস্ময়ের কুয়াশায় যেন কে আলোক সম্পাৎ করল।

অনেকটা সময় কেটে গেল। বিরাজ করল একটা স্তব্ধ নীরবতা। বললেন এক সময়ে দেবেন্দ্রনাথ, বললেন নরেনের পানে তাকিয়ে, "ঈশ্বর এ-যাবৎ শুধু আমায় দ্বৈতলীলাই দেখিয়েছেন বাবা।......হতাশ হয়ো না। তোমার চোখে যোগীর দৃষ্টি।"

তুমিও দেখবে। পাবে তার সন্ধান। তিনি যে সবার কাছেই ধরা দেন। তাঁর প্রকাশ যে মাটি থেকে মর্মে। "তোমার 'পরও তাঁর দৃষ্টি আছে বাবা।"

নরেনের মন এই একটি আশ্বাস নিয়ে নীরবে সেদিন ফিরেছিল ঘরে। কিন্তু এতে কি তার অন্তর-তিয়াষ মিটেছিল?

না।

স্পষ্ট জবাব পায়নি নরেন। তার অন্তরের ঝড় থামাতে পারেননি দেবেন্দ্রনাথ।

কত স্মৃতি, কত কথাই না আজ ঝড়ের মত এসে চোখের সামনে উঁকি মারল দেবেন ঠাকুরের। অতীত দিনের কাহিনীরা এসে ছায়ার মত দাঁড়াল মহর্ষির মনের

নেপথ্যে। নিবেদিতার কাছে কিছু বললেন তিনি। বললেন একবার নরেনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে।

কথাটা নিবেদিতা এসে বলল স্বামীজীর কাছে।

স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "সত্যিই এ-কথা বলেছেন তিনি? যাবো, আমি নিশ্চয়ই যাবো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বেশ তো তুমিও চলো না। এক সঙ্গেই যাই দুজনে!"

নিবেদিতার কি আর এ প্রস্তাবে দ্বিধা থাকতে পারে? যাকে ধরা যায় না, দেখা যায় না, তাঁর সঙ্গে যাবে ঠাকুরবাড়িতে। এ যে পরম সৌভাগ্য বলেই গ্রহণ করল নিবেদিতা।

বেশ তো, যাওয়া যাবে।

"শিগগির একটা দিন ঠিক করে ফেল।"

ধার্য হলো দিন। নিবেদিতা শ্রীগুরুর সঙ্গে যাত্রা করল, যাত্রা করল দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার মানসে।

ঠাকুরবাড়ি।

স্বামীজী ও নিবেদিতা এসে হাজির হলেন ঠাকুরবাড়িতে। প্রণাম করলেন স্বামীজী মহর্ষিকে। নিবেদিতা দুটি গোলাপ ফুল রাখল দেবেন্দ্রনাথের চরণ-তীর্থে। আনত করল শির। মহর্ষি করলেন আশীর্বাদ। নিবেদিতার ভাষায়:—

"আমাদের তখনই মহর্ষির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে চললেন বাড়ির দু-একজন। স্বামীজী এগিয়ে গেলেন। বললেন, 'প্রণাম', আমি দুটি গোলাপ ফুল দিয়ে করলুম প্রণাম। মহর্ষি করলেন আমাকে আশীর্বাদ। বললেন স্বামীজীকে বসতে। তারপরে কথাবার্তা চলল মিনিট দশেক। কথাগুলো বাংলায়ই হচ্ছিল।

স্বামীজী যে সব বাণী প্রচার করেছেন, মহর্ষি তারই উল্লেখ করতে লাগলেন একের পর এক। বললেন, আগাগোড়া তিনি স্বামীজীর প্রতিটি কার্যক্রমের 'পর নজর রেখেছেন, গভীর আনন্দ হয়েছে তাঁর। গৌরব বোধ করেছেন তিনি। মন ঢেলে শুনে গেছেন তাঁর ভাষণ। ঠাকুরবাড়ির সবাই কথাগুলো শুনে আশ্চর্য হচ্ছিলেন। কিন্তু স্বামীজীকে কেমন যেন লাগছিল। আড়ষ্ট, অন্যমনস্ক একটা ভাব তাঁর মধ্যে স্পষ্টই অভিব্যক্ত হচ্ছিল তখন। ও সব কথা যেন তাঁর কানেই পৌঁছায়নি। তারপরে নীরব হলেন বৃদ্ধ। স্বামীজী বিনীতভাবে করলেন আশীর্বাদ ভিক্ষা। মহর্ষি অজস্র-ধারে করলেন আশিস বর্ষণ। আমরা চলে এলাম নীচে।

স্বামীজী চাইলেন বেলুড়ে চলে যেতে। কিন্তু ছাড়লেন না ঠাকুরবাড়ির

লোকেরা। পুরুষেরা এসে ঘিরে বসলেন তাঁকে। যথারীতি আপ্যায়ন করা হলো। স্বামীজী বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন শ্রদ্ধা। বললেন—নব্য ভারতের তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।"

ঠাকুরবাড়ির সকলের মুখে ফুটল হাসি। মন ভরে গেল আনন্দে ও শ্রদ্ধায়। এই কথাই বুঝি তাঁরা শুনতে চেয়েছিলেন স্বামীজীর মুখে। বিকারহীন মন আর রামমোহনকে স্মরণ করলেন স্বামীজী। মনে মনে জানালেন প্রণতি। শ্রদ্ধায় আনত করলেন শির।

কেনই বা করবেন না?

রামমোহন কি যে সে? শতাব্দীর প্রদোষ প্রচ্ছায়ে রামমোহন এক আলোক-সম্পাৎ। যুগ-বিপ্লবী সমাজের বুকে আনলেন জীবন-বিপ্লব। ঝিমানো জাতির তন্দ্রালু নয়নে তুলে ধরলেন আলোর রোশনাই। নব দীক্ষায় দীক্ষিত হলো যুগ। জীবনে জীবনে এলো নতুন সাড়া। পথহারা জাতি সম্মুখে দেখল আলোর আভাতি দেখল জীবন-জয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ।

সে সব দিনগুলো বিস্মৃত হওয়া যায় না। স্মৃতির বাসরে অতীত যেন কথা কয়। মনকে টেনে নিয়ে যায় এই কলমুখর মহানগরী থেকে ছায়া-শান্ত বনকুঞ্জে।

বাঙলার শিল্প-সম্ভার, বাঙলার সভ্যতার স্রোত বয়ে যেত একদিন তাম্রলিপ্তের 'পর দিয়ে। সেদিনকার প্রাণ-প্রবাহের উচ্ছল ধারা বিমুগ্ধ করেছিল বিদেশী পরিব্রাজকদের। তাঁরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে গিয়েছেন মহাভারতের বিজয়-গাথা।

কিন্তু কিছুই রইল না। কালের কুটিল কুহকে তাম্রলিপ্তের ভাস্বর দ্যুতি অবলুপ্ত হয়ে গেল। দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল জাতি। তাদের সম্মুখে আর পশ্চাতে দেখতে লাগল শুধু আঁধারের প্রারব্ধ যৌবন।

নানা দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও জাতি তার কৃষ্টির কারুকর্মের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইল।

কিন্তু পারল কি তার ঐতিহ্যমণ্ডিত দিনগুলোকে ধরে রাখতে?

না।

বাঙালীর ভাগ্যাকাশে নেমে এলো দুঃখের রাত্রি। কেটে গেল শতাব্দীর পর শতাব্দী। গোটা জাতিটা এসে দাঁড়াল মৃত্যু-মোহনায়।

মোগল সাম্রাজ্যের সূর্যকিরণ প্রায় অবলুপ্ত। শ্লথ, মন্থর হয়ে এসেছে মহারাষ্ট্রের গতি-ছন্দ। শিখ গরিমার উজ্জ্বল আকাশে মেঘের ঘন ঘটা। আদিগন্তে অস্ত্রের ঝন্‌ৎকার। বিদেশী বণিকদের অন্তরে লুণ্ঠনের দুঃস্বপ্ন। কুঠিয়াল সওদাগরের দল

এসে করল পোত্ত নির্মাণ। শোষণের উদ্ধতি নিয়ে অবতরণ করল বাঙলার মাটিতে। এমনি একটা দারুণ সঙ্কটের দিনে বঙ্গমাতা চোখ মুছলেন আঁচলে। অঝোরে ঝরল চোখের জল। হাট বসল বণিকদের। সুতানুটি ও গোবিন্দপুর গ্রাম হলো তাদের সওদার কেন্দ্র। ইংরেজ এলো। এলো পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও আর্মেনিয়ান। তাদের সঙ্গে সঙ্গেই এসে জব চার্নক-এর জাহাজও একদিন নোঙর ফেলল। নোঙর ফেলল বাঙলার মাটিতে। সামান্য দামে কিনে নিল সাহেব—কিনে নিল সর্বহারা জননীর কোলের সন্তানতুল্য গ্রামগুলো। বিস্তৃত হয়ে পড়ল বেনিয়ার প্রভাব চতুর্দিকে। কালিকটের পত্তন করল তারা। এই কালিকটই পরে রূপান্তরিত হলো কলিকাতায়।

দিগ্‌ভ্রান্ত বাঙালী, আত্ম-বিস্মৃত বাঙালী সেদিন বুঝল না কি সম্পদ্ তাদের বুক থেকে ছিনিয়ে নিল বিদেশী বেনিয়া। বুঝল না—এই বণিকের মানদণ্ডই রাত্রি অবসানে দেখা দেবে রাজদণ্ড হয়ে।

তাই হলো। পলাশীর মর্মন্তুদ কাহিনীর মধ্য দিয়ে বাঙালী তার ললাট-ফলকে বরণ করল পরাধীনতার দুঃসহ পীড়ন। 'গ্রামীণ' সভ্যতার বেদীমূলে গর্জন করে উঠল বৃটিশ সিংহ। চরকা রইল না। ভাঙল তাঁতের মাকু। দেখা দিল সংস্কৃতির সঙ্কট। বাঙালী সেদিন তার আপন অক্ষমতার ক্লীবত্বে মায়ের হাতে পরিয়ে দিল বন্ধন-শৃংখল। নেমে এলো অবজ্ঞা, অবহেলা, লাঞ্ছনা ও পীড়ন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল তোড়ে যুগ-যুগান্তের কৃষ্টি, ঐতিহ্য কোথায় ভেসে গেল!

কে, কে এই গোবি, সাহারার বুকে এনে দেবে চেরাপুঞ্জির বর্ষণ? কে শোনাবে আশার বাণী? জীবনের সংবাদ?

রুদ্র বীণায় ঝঙ্কার দিলেন রামমোহন।

শোনালেন অভীমন্ত্র। শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন মহাভারতের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে। হলো তার নব রূপায়ণ।

ঘোষিত হলো বেদান্তের বাণী। পাপবিদ্ধ সমাজের বুকে হানলেন আঘাত। সংস্কারের মোহপাশ থেকে মুক্ত করতে চাইলেন জন ও জনতাকে। প্রবল প্রতিরোধের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে। গঙ্গাবক্ষে সন্তান-নিক্ষেপের পুণ্য থেকে টেনে আনলেন বাঙালী জননীদের। তাদের ভুল ভ্রান্তিগুলোকে করলেন উদ্‌ঘাটন। সঙ্গে এসে যোগ দিলেন বিদ্যাসাগর। সমাজের বুকে চালু করলেন বিধবা বিবাহের। রামমোহনের আরব্ধ কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুগ-বান্ধব বিদ্যাসাগর।

এলেন দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ ও শিবনাথ। নব গঙ্গায় স্রোত বইল মরা বাঙলার বুকে।

কিন্তু প্রবল প্রতিরোধের সৃষ্টি করল রক্ষণশীল দল।

বিভেদের প্রাচীরটা দাঁড়াল মাথা তুলে। বাঙলার বাঙালী আত্ম-বিস্মৃত হয়ে গা ভাসিয়ে দিল। গা ভাসিয়ে দিল ধ্বংসের খরস্রোতে। তারা মদ ধরল। মাতাল হলো। রাখল উপপত্নী। দল বেঁধে যাত্রা করল গীর্জায়। আপন ধর্মের মর্ম-মাহাত্ম্য ভুলে খৃষ্টান হয়ে যেতে লাগল তারা।

কিন্তু গোটা জাতটার রাস টেনে ধরল বাঙলার আকাশ, বাতাস ও প্রকৃতি।

সুরহারা জীবনে নতুন ছন্দে সঙ্গীত উঠল অনুরণিত হয়ে। অবচেতন মনগুলো কিসের আবেশে যেন তাকাল একবার পিছু ফিরে। দেখল রামমোহনের স্বপ্ন-সাধক বিদ্যাসাগরকে। দেখল বঙ্গমাতার চরণ-তীর্থে মুদিত নয়নে বসে বঙ্কিম। শুধু কি তাই? আশাহত, পরপদলেহী, আত্ম-বিস্মৃত জাতি পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত করল জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। খুলে গেল জাতীয় রঙ্গমঞ্চের দরজা। সাহিত্য আহ্বান করল বিশ্ব-ঐক্যকে। বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটা স্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হলো বাঙলার সার্বিক ক্ষেত্রে। উপনিষদের নব রূপায়ণ হলো। গড়ে উঠল ব্রাহ্ম সমাজ। বাঙালী তার সংস্কৃতির দেবীকে এনে বসাল বণিক লক্ষ্মীর পার্শ্বে। পয়ারের সীমিত গণ্ডি ভেঙে মাইকেল ঝাঁপিয়ে পড়লেন অমিত্রাক্ষরের মহাসমুদ্রে। সমাধান একটা এলো বটে, কিন্তু বুদ্ধি ও যুক্তির সড়ক পেরিয়ে। ফলে ধর্মে এসে দেখা দিল বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদের লড়াই। ভক্তির গঙ্গা শুকিয়ে যেতে লাগল। ঠিক এমনি একটা মোহ-মুগ্ধ দিনে গঙ্গার কূলে এক পাগল ঠাকুর দাঁড়িয়ে আহ্বান করলেন—"ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস্ আয়!"

শুধু কি কেবল তাই?

তিনি বললেন— "জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা।"
"মোটা ভাত কাপড় না হলে ধর্ম হয় না।"

শাক্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটল। মায়ের হাতের খড়্গ ঝলসে উঠল। আত্ম-বিশ্বাস, আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও মানুষের শাশ্বত দাবি নিয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার অর্জনের তপ-তিতিক্ষায় চোখ বুজল তাপিত জনতা। এলো নরেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন-বেদের মধ্যে সংহৃত হলো তাঁর চিত্ত। নরেন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক চেতনা সার্থকতা লাভ করল বিবেকানন্দের মধ্যে। আর বিবেকানন্দের উত্তরসাধিকা হিসেবে পেলাম আমরা আমাদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতাকে।

একের পর এক সব কথাগুলোই আজ মনে পড়ে স্বামীজীর। জীবনের সে অতীত অধ্যায়টা সংগ্রামের হ'লেও কত মধুরই-না ছিল।

আজ দেবেন্দ্রনাথের কাছে এসে স্বামীজীর মনকে অতীতটাই বিশেষভাবে আঁকড়ে ধরে বসল।

ওদের মধ্যে তখনো আলোচনা চলছিল।

আলোচনা চলছিল প্রতীকোপসনা আর কালী সম্বন্ধে। দু দলের মধ্যে চলল আলোচনা। কিন্তু নিবেদিতার ঠিক মনে ধরছিল না ওদের কথাবার্তা। ওরা বলে কালীকে মদাশক্ত দেবী।

কিন্তু সত্যি কি তাই?

না। তিনি হলেন বিশ্বজননী। করুণাময়ী মা।

সমস্ত জগৎকে তিনি ধারণ করে আছেন। এই জগৎ-জননী মায়ের আভাস প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। কি ভাবে? চেতদর্পণ ধৌত কর। অহংবোধের সীমানাটা পেরিয়ে যাও। তুমিময় কর তোমার সর্বসত্তা। আঁখিধার ঝরুক। অন্তরে অদর্শনের বেদনা উঠুক জেগে। আকুল হয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বলো—দেখা দে! দেখা দে মা।

কিন্তু নিবৃত্তি মার্গে যেতে হলেই কি গলা টিপে অপমৃত্যু ঘটাতে হবে প্রবৃত্তির?

না।

তবে কি করে সম্ভব দেবারাধনা?

আছে, আছে পথ আছে। তাকে খুঁজে নিতে হবে।

কি ভাবে?

ভারতীয় সাধনার ঐক্য দেখো।

বহু পথ আছে। বহু মত আছে। কিন্তু তাদের মিলন-তীর্থ একই। একই আনন্দ-নিকেতনে হবে শুভ উত্তোরণ। চলো এগিয়ে চলো। মাকে কেউ পেয়েছেন প্রেমের পথে। কেউ বা বাৎসল্যের স্নেহ-সমুদ্রে অবগাহন করে ছোট্ট কন্যাটির বেশে প্রত্যক্ষ করেছেন জননীকে। আবার কেউ পেয়েছেন পত্নীরূপে। বাঙলার প্রেমধর্মী সাধকদের ধারা বিচিত্রগামী। এমন আর কোথায় আছে? প্রবৃত্তির পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে পৌছে গেছেন তাঁরা নিবৃত্তির লীলা-তীর্থে।

এখানে আসে তন্ত্রের কথা।

তন্ত্রমতেও মাকে প্রত্যক্ষ করেছেন বহু সাধক। তন্ত্রের পথ বড় জটিল। আত্ম-সংহৃতির মধ্য দিয়ে চলতে হবে। বসতে হবে সংযমের শিলাসনে। সামনে সাজানো

থাকবে ভোগের সামগ্রী। কিন্তু তার মধ্যে বসতে হবে ত্যাগের মন লয়ে। ভোগের মধ্যেই যে লুকিয়ে আছে ভোগ-বিরতি। এ তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটিত হবে তখন।

তিনটি স্তরকে পেরিয়ে যেতে হবে। তারপরে মিলবে মায়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য। ওরে মাকে যে ডাকার মতো ডাকতে পারে তার কাছে মা কি না এসে পারেন? তিনি সন্তানের আকুল কণ্ঠটির জন্যই যে অধীর প্রতীক্ষায় কান পেতে থাকেন।

প্রথমে এসো পশ্বাচারের সমরভূমিতে।

তার পরে বীরাচার।

বীরাচার থেকে চলে যাও দিব্যাচারে।

কিন্তু পশ্বাচারের সাধকদের দেখে ওরা বললে কালীকে মদ মাতাল শাক্ত দেবী।

কিন্তু স্বামীজী বললেন ধীর গম্ভীর কণ্ঠে, "আপনাদের মতটাই শাস্ত্রসম্মত, তা ঠিক। কিন্তু অপর মতটাও আপনাদের মেনে নেওয়া উচিত। অন্ততঃ অদ্বৈতবাদের সঙ্গে প্রতীকোপাসনার যে একটা সম্পর্ক আছে, স্বীকার করাই ভালো।"

পথ ও মতের দ্বন্দ্ব নিয়ে মেতে থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না রে। সাধনপথেও চাই এক অখণ্ড সমন্বয়। চাই ঐক্যবোধ।

যিনি বিশ্ব নিখিলের জননী, তাঁকে খণ্ড, ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডিতে আটকে রাখা যায়?

বেশ একটা অপসীম আনন্দের মধ্যে দিনটি কাটল নিবেদিতার। স্বামীজী চলে এলেন ঠাকুরবাড়ি থেকে। ওঁরা বললেন—আবাব আসবেন স্বামীজী।

স্বামীজী বললেন—আপনাদেরও বলছি, যাবেন কিন্তু বেলুড়ে।

ওঁরা স্বামীজীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

সরলা আর স্থরেন্দ্র এসেছে।

এসেছে ঠাকুরবাড়ির প্রতিনিধি হ'য়ে বেলুড়ে।

ব্রাহ্ম সমাজের দুই চেলা। নিরাকারবাদী। এসেছে ব্রহ্মোপসনার অঙ্গন থেকে সাকার-তীর্থের মন্দির-প্রাঙ্গণে।

এখানে প্রতীক আছে। প্রতিমা আছে। মূর্তি আছে। আছে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণ।

ওরা ঘুরে ফিরে সব দেখতে লাগল। স্বামীজী সঙ্গে আছেন। আর আছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। নিবেদিতাও রয়েছে। সবাই মিলে বেশ মনের আনন্দে সারাটা মঠবাড়ি ঘুরে এলো। স্বামীজী মন্দিরে গিয়ে করলেন প্রণাম। একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির সম্মুখে। সরলা তো অবাক! তার চোখে মুখে তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটা উদাসীন ভাব। দাঁড়িয়ে থাকে দূরে।

নিবেদিতার অন্তরের আকুতির বিরাম নেই। মহাসমুদ্রে যে অবগাহন করেছে একবার, কেমন করে সে তৃপ্তির শান্তি অপরকে পরিবেশন না করিয়ে থাকবে? তাই তো নিবেদিতা অন্তরের অজস্র প্রার্থনার মধ্যে বলে, "হে প্রভু, তুমি ওদের কৃপা কর। দয়া কর। তোমার বিরুদ্ধে ওদের বিরূপ মনোভাব দূর কর। প্রসন্ন হও ঠাকুর, আমিও একদিন ওদের মতন ছিলাম······"

সারাটা দিন কেটে গেল। স্বামীজী ওদের নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

সমস্ত দিনের মর্ম-ঢালা কর্মছন্দে নিবেদিতার মনটা বেশ ছিল। আনন্দের নৃত্য দোলায় মরমী মন পেয়েছিল অন্তরঙ্গতার স্পর্শ। রাত্রে নিবেদিতা কাগজ আর কলম নিয়ে বসল—"কী স্থন্দর যে লাগল আজকার দিনটি! সরলা, স্থরেন আর আমি গাছতলায় বসেছিলাম। যখন উঠে আসি, সরলা দেখাল সিঁড়ির ধাপে গাছ-পালার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। নদীর তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে জলছে আলো। এক জায়গায় জলছে দুটি চিতার আগুন। নদীর বুকে পাল তুলে পাড়ি উজিয়েছে মাঝিরা।

"তার পরে এলাম শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। ওদের নিয়ে আসা হলো মন্দির দেখবার জন্য চত্বর দিয়ে। কিন্তু মন্দিরের দুয়ার তখন বন্ধ। ওরা বাইরে থেকে দেউলের মনোরম স্থাপত্য দেখেই খুশী হয়ে ফিরে এলো।"

"রাজা ততক্ষণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন বোটে। আমাদের নিয়ে তিনি মঠে ফিরলেন। সবাই আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম। উনি এবারে সরলার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমরা স্বামীজীকে যেমন ভালোবাসি, মনে হল সরলাও ওঁকে তেমনি চোখেই দেখতে লাগল। উনি বললেন, "সরলা একটি রত্ন, ও অনেক বড় কাজ করবে।"

কিন্তু সরলা ফিরে গিয়ে চিঠি লিখল একটা। লিখল এক মর্মদীর্ণ সংবাদ—স্বামীজীর সাদর অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু ঠাকুর বাড়ির সহযোগিতা ও সান্নিধ্য পেতে হলে স্বামীজীকে ছাড়তে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম। তবেই আমরা এক যোগে দাঁড়াব স্বামীজীর সঙ্গে। নিয়োগ করব আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ। চিঠি পেয়ে নিবেদিতার দুচোখ বেয়ে নামল অবাধ্য অশ্রুর ঢল। এতবড় একটা অবাঞ্ছিত কথা শোনবার আগে নিবেদিতার মৃত্যু বরণ করাও বুঝি ভালো ছিল। এ অবস্থার জন্য নিবেদিতা নিজেকেই নিজে দায়ি করল। দিতে লাগল আপন অদৃষ্টকে বারে বারে ধিক্কার। আশ্চর্য জিদ ওদের। এতবড় একটা কথা বলতে এতটুকু কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে এলো না? বুকের মধ্যে একটা সমুদ্র গর্জন করে উঠল না! বিনা দ্বিধায় হাতের কলম আখরগুলো লিখে গেল!

গুরু বুঝতে পারলেন নিবেদিতার অবস্থাটা। ডেকে কাছে আনলেন। বলতে লাগলেন ধীর গম্ভীর কণ্ঠে—"মার্গট, যদি নিশ্চিত জানতাম, মূর্তি পূজা তুলে দিলেই মানুষের কল্যাণ হবে, বিনা দ্বিধায় ওটা উঠিয়ে দিতুম। কিন্তু গভীর দীনতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী স্মরণ কবি, ঈশ্বর সাকার নিরাকাব দুই-ই, আবার তা ছাড়াও কিছু। তিনিই শুধু বলতে পারেন, আরও কত কি তিনি। দেখ মার্গট, যারা একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা কবতে জগতে আসে, তাদের কখনও এমন প্রত্যাশা রাখতে নেই যে মানুষ তাদের কথা শুনবেই। আবার একথাও জেনো, যারা নিজেদের মনে করে স্বতন্ত্র বলে, তাদের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। অন্তবে অন্তরে তারাই আবার সব চাইতে তোমার পা-চাটা। যাবা সাকার পুজা তুলে দেবার জন্য বাড়াবাড়ি করে, তারা নিজেদের মন জানে না। যে ভাবের বিরুদ্ধে নিজেরা লড়াই করছে মনে মনে, অন্যেব মধ্যে তার প্রকাশ দেখে তারা জ্বলে ওঠে। যদি নিজের মন বুঝত তারা!"

মাথা হেট করে নিবেদিতা শ্রীগুরুর কথাগুলোর যথার্থ মর্ম উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করল। খুব বড় একটা শিক্ষা হয়ে গেল নিবেদিতার। কর্ম সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রার্থনা করেছিল আপামর জনসাধারণের সাহায্য, কিন্তু ওটুকু চাইতে গিয়েই সে

ঢুকেছে। একা পথে চলবার নতুন করে একটা প্রেরণা লাভ করল নিবেদিতা। সাগরের স্রোতের মত সে ভেসে যাবে। যে আসে যে না আসে।

জগদীশচন্দ্রের অন্তভাব।

কে জগদীশচন্দ্র ?

প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু। চল্লিশ বছর বয়সেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বসু। খ্যাতি, যশ ও নাম তাকে ভরপুর। কে না তাকে চেনে। আবার ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ চেলা বলেও তার খ্যাতি কিছু কম নয়। কিন্তু লোকটি বড় নিরীহ নম্র। মাটির মত স্নিগ্ধ শান্ত একটি স্বভাব। বড় ভালো লাগল নিবেদিতার এই ছেলেটিকে।

তুলল নিবেদিতা অদ্বৈততত্ত্বের কথা। প্রশ্ন করল নানা ধরণের। একটি বাণবিদ্ধ পাখীর মতন চোখ তুলে তাকিয়ে ছিল নিবেদিতা। তাকিয়ে ছিল বৈজ্ঞানিক বসুর মুখের পানে।

বসু বললে, "আপনি কি অদ্বৈত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিজ্ঞানের প্রমাণ চান ?"

নিবেদিতা বললে, "সত্যি বলেছ। ঠিক তাই।"

"কিন্তু একথা তো সত্যি যে জ্ঞান আর বিজ্ঞানের অনুভব একই পথ ধরে আসে। দুটি একই জিনিস।"

"উপনিষদ তো তাই বললে।"

তবে আর দ্বন্দ্ব কিসের ? অন্তরের আবিল অপসৃত হলেই আত্মজ্যোতির প্রতিফলন ঘটবে। চেতদর্পণে প্রভাস্বর হয়ে উঠবে চৈতন্যের পূর্ণচন্দ্র। ঠিক তখনই মিলবে বিজ্ঞানের উপরে যে প্রজ্ঞান তার হদিস।

বসুর সঙ্গে আলাপ করে নিবেদিতার বেশ ভালো লাগল। দুজনার মাঝে গড়ে উঠল একটা গভীর অন্তরের অন্বয়। কিন্তু বসুর পর রাজশক্তির কতগুলো অবৈধ অত্যাচার চলছিল তখন। নিবেদিতা এক এক করে সব শুনে নিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ করছে বসু। বড় ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিনগুলো কাটছে তার। হিন্দু বলে সরকার তাকে তার যোগ্য মর্য্যাদা কিছুতেই দেবেনা। তার বেতনের হার কম। তাকে দেওয়া হবে না কোন নিজস্ব ল্যাবরেটরি। এ সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য বসু তৈরী হতে লাগলো। হিন্দু সহকর্মীদের পক্ষ হয়ে একাই তিনি এই হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। দাঁড়ালেনও বটে। তিনটা বছর

সরকারের সঙ্গে বিবাদ চলল তার। কিন্তু যার ভেতরে জ্বলছে প্রতিভার আগুন, তাকে কোন শক্তি পায়ে দাবিয়ে রাখতে?

বসু গবেষণা করছিল 'সমাবর্তন' নিয়ে। তাতে দেশে বিদেশে একটা সাড়া পড়ে গেল। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি তাকে সম্মানিত করল বৃত্তি দিয়ে। তখন আর সরকার তাকে মর্যাদা না দিয়ে কেমন করে পারবে। বাধ্য হয়েই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসুকে একটু সুবিধা দিতে লাগল।

কিন্তু বসু বড় ভেঙে পড়ল। জীবনের যাত্রাপথে এত বাধা, এত ঝড় ঠেলে তার যেন আর চলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। ঠিক তখনই এসে তার পাশে দাঁড়াল নিবেদিতা। শোনাল অভয়ের মন্ত্র। সঞ্চার করল সাহসের। প্রকৃত বন্ধুর মত নিবেদিতা জগদীশ বসুর জীবনের অনেকটা ভার স্বেচ্ছায় বরণ করে নিল। কেনই বা নেবেনা? একাকী পথে চলতে যে কি ক্লেশ তা নিবেদিতার মত আর কে জানে? বসুও চলেছে একাই। সত্য সাধকের সেই একনিষ্ঠ জীবন-ছন্দের মধ্যে নিবেদিতা দেখতে পেল তার আপন প্রতিচ্ছবি। তাইতো দুজনার হৃদ্যতার সীমানাটা আরও বিস্তৃত হয়ে পড়ল।

নিবেদিতা মিসেস বুলের কাছে একটা চিঠি লিখল। চাইল বসুর জন্য তার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য, "মহৎ হৃদয়কে কি করে বৃহৎ কর্মে উদ্দীপিত করতে হয় তা তুমি জান। বসুর কথা ভেবে দেখ। হৃদয়টি ওর করুণ কোমল, চরিত্র নিখুঁত। ওকে বড় করে তুলতে পারলে তুমি আরও বড় হবে। তুমি ওকে আশ্রয় দাও। স্বামীজীর মত ওকেও তোমার আরেকটি সন্তান বলে মনে কর। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বসু, তবু অবিশ্রাম খেটে চলবার আগ্রহ আছে তার সত্যি। শুধু এইটুকু দেশের লোকের কাছে প্রমাণ করতে চায়, যে কোনো ইউরোপীয়ানের মত তারাও ফলিত বিজ্ঞানে অমিত সাফল্য লাভ করতে পারে।"

মর্মস্পর্শী চিঠি। চিঠিটা ডাকে ফেলে বসুকে বলল নিবেদিতা, "বুলকে মায়ের মত দেখো।...তুমি তাকে চিঠি লেখ। লেখ তোমার আশা-আকাঙ্খার কথা। তোমার কাজের কথা। তার কাছে তুমি কিছু লুকিওনা। তোমারই প্রতীক্ষায় আছেন ধীরা মাতা, তোমার তরফ থেকে একটু সাড়া পেলেই এসে দাঁড়াবেন তোমার পাশে। তোমার 'পর তাঁর বিশ্বাস আছে। আছে তোমার শক্তিতে তাঁর আস্থা।"

এ দুটি অদ্ভুত জীবন। দুটি স্রোতের ধারা চলেছে। চলেছে পাশাপাশি। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী। এতটুকু মিল মেলে না দুজনার আদর্শে। তবুও কত মিল। কত নৈকট্য। বাইরের কলমুখরতা অন্তরকে স্পর্শ করে না। যা সত্য,

যা শাশ্বত, যা চিরন্তনের তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। দিতে হবে তাকে এগিয়ে। বসুর মাঝে মাঝে ধাঁ ধাঁ লাগে নিবেদিতার কথা ভেবে। আশ্চর্য, এমনি করেই বুঝি নিঃস্বার্থ জীবন উৎসর্গীকৃত হয় দেশ ও দশের হিতে। এমনি করেই বুঝি গড়ে ওঠে সৌহার্দের সুষম সম্বন্ধ। দুটি চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত—কিন্তু তার মাঝে কত হৃদ্যতা। নিবেদিতা বসুর প্রতিভাকে করবে লোকখ্যাত। দিবে তার প্রতিষ্ঠা। হোক সে অন্তপন্থী, অন্যধর্মের অনুগামী। তার প্রতিভা সেজন্য কেন পাবেনা সর্বস্বীকৃতি? তা ছাড়া, উত্তরণ তো হবে একই তীর্থে। শুধু পথের দ্বন্দ্ব। তাও একদিন আর থাকবে না। জীবনের মহতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে। গুরুর আদর্শকে অন্তর দিয়ে বরণ করেছে নিবেদিতা। নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্যে। অথচ বসুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একটি মুক্ত শুদ্ধ মন নিয়ে। কোনো সংস্কার নেই। নেই কোনো জিজ্ঞাসা, প্রশ্নেও প্রভঞ্জন।

স্বামীজীর কথা এলেই বলত জগদীশচন্দ্র, "যখন শুনলাম স্বামীজী বলছেন, দেশের লোককে মানুষ করে তোলাই তাঁর ধর্ম, তাঁর ব্রত, তখন সত্যি কি যে বিস্ময় লেগেছিল। তার পর দেখেছি—সার্বজনীন সত্যের প্রতিষ্ঠায়, মানুষের জন্য স্বামীজী তাঁর বিপুল খ্যাতিকে হেলায় একদিন জীর্ণ বস্ত্রের মত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কিন্তু তলিয়ে গেলেন তিনিও, তলিয়ে গেলেন ব্যর্থতায়। যিনি হতে পারতেন প্রাতঃস্মরণীয় দেশনায়ক, সেই মানুষটা হলেন কিনা একটা নতুন সাম্প্রদায়িকতার মহাজন।"

মিসেস বুলকে লিখল নিবেদিতা, "দেশ-বিদেশের ধর্ম নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার কথা তুমি যে বলতে, এতদিন তার প্রয়োজনীয়তা বুঝিনি। কিন্তু আজ ঠিক তোমার কথার মর্ম বুঝছি। ধর্মে প্রসঙ্গ যখনই ওঠে, বসুর কথায় মুষড়ে পড়ে মন। বেশ বুঝতে পারি, আমি যে দৃষ্টিতে সব কিছু দেখছি, ওকেও যদি তা দেখাতে চাই, তবে একমাত্র তুলনামূলক আলোচনার দ্বারাই তা সম্ভব।"

তাই করল নিবেদিতা। বসুর সঙ্গে তার মেলামেশাটার মধ্যে বাইরের প্রতিরোধ যা কিছু রাখল। খোলা রাখল ধর্ম নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার পথটা। বসুর সঙ্গে নিবেদিতার অন্বয় তার গবেষণাগারে। ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতির মধ্যে। বসুর সান্নিধ্যে এসে নিবেদিতা দেখতে পেল এতটা নতুন আলো। যা তার দৃষ্টিতে প্রমাণ সাপেক্ষ করে তুলল অদ্বৈত তত্ত্বের গূঢ় রহস্যকে। অণুহতে অনীয়ান, মহৎ হতে মহীয়ানে যে উত্তরণ, তার মধ্য দিয়েই তো প্রমাণ মেলে রূপ-অরূপ, দ্বৈত-অদ্বৈত ও সাকার-নিরাকারের প্রকৃষ্ট তত্ত্বটির।

বসু শোনাল নিবেদিতাকে নতুন কথা, আমি দেখেছি সেই অখণ্ড আত্মার বিচিত্র প্রকাশ। আছে, আছে, "জড়ের মাঝেও প্রাণ আছে। কোনো ভ্রান্তি নেই এতে। জড়ও চৈতন্যময়। সর্বত্র প্রাণের স্পন্দন। এমন-কি ধাতুও প্রাণময়। জীবন্ত। একদিন তার প্রাণকেও আমি আকড়ে ধরব। প্রথমে গাছপালা, তার পরে শীলা কঙ্করের প্রাণসত্বাকে আমি উদ্ঘাটন করব। আছে,—আমি দেখেছি।"

বিস্ময়-বিমুগ্ধ নিবেদিতা। তার চোখে মুখে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে অজস্র প্রশ্নের কলি।—সত্যি আছে?

—সত্যিই আছে। বিশ্বনিখিলের অখণ্ড আত্মার বিহার প্রতিটি অণুতে অণুতে। প্রতিটি পত্রে পুষ্পে। প্রতিটি জীবে জনতায়। তাকে উদ্ঘাটন কর অন্তরের দীপ জ্বেলে। মরমের মাধুরী ঢেলে। ধ্যানে বসলে কি হয়? প্রথমে আলোর মত একটি বিন্দু দর্শন হয়। তার পরে সিন্ধুর উচ্ছ্বাস। আলোয় আলোময়। তখন আর কোথাও একবিন্দু আঁধার নেই। সমতায় মমতায় মন মগ্ন। ঐক্যের সঙ্গীতে প্রাণ পুলক-মদির।

নিবেদিতা বললে বসুকে, "যা বলছ, তা লিখে রাখো। এসব ধরে রাখা দরকার।"

বসুকে বললে, "ক্ষণ ভাতির বিদ্যুৎ দ্যুতি এগুলো। আসে আবার হারিয়ে যায়। একে বলছেন রূপ দিতে? ও তো আমার চোখে মরিচিকার মতন।"

নিবেদিতা বললে, "তুমি না লেখো, আমি তো আছি। আমার লেখনী অতন্দ্র ভৃত্যের মত তোমার কাজ করবে। মনে কর এ লেখা আমার নয়, তোমারই।"

শুধু কি তাই? বসু সম্বন্ধে নিবেদিতা বুলকে এক পত্র দিল। লিখল তাতে, "আমাকে আমি যেমন জানি, তেমনি তোমাকেও। তুমি, আমি আর য়ুম—আমরা তিন জনে বসুদের চারিধারে রচনা করব একটা প্রীতির পরিবেশ। ওদের শক্তি দেব। সারাটা দুনিয়াকে করে তুলব ওদের ঘর। বুল, এখনো সময় আছে। স্বামীজীকে ভালোবাসি বলে অন্যকে ভালোবাসতে কোনো বাধা নেই। আর অন্যকে দেয়া ভালোবাসা তো তার কাছে সবচেয়ে বড় সত্য হয়ে উঠবে।"

ভালোবাসার জাদুনিকেতনে দেখব জীবনের প্রকাশ মহিমা। কি মজা। আনন্দের ভোজে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে উৎসব করব। কিছুই মিথ্যা নয়। জীবনের কোনো ধনই ফেলে দেয়া যায় না। ঝড়ের মাঝে ঝাপিয়ে পড়েছি—যেতে যেতে কত কি-না আসবে। হাসবে, মিলনের আনন্দে হবে আবিষ্ট।

নিবেদিতার মনে যেন সত্যগুলো আবছা এসে ধরা দিতে লাগল। কল্পনার রংমহলে বিশ্বদিঠির খণ্ডিত সত্বাকে ধরে সে এগিয়ে যাবে অখণ্ডের অন্তহীন অনন্তে। এই তো সার্থক যাত্রা। শান্ত থেকেই অনন্তে জমাতে হয় পাড়ি।

আমায় শক্তি দাও মা।

দাও ভক্তি, ভালোবাসা, মমতা ও প্রেম। নীরব করে দেওয়ার আগে একবারটি মুখর করে তোল। তোমার অসাধ্য কাজ নেই। তুমি পঙ্গুকে দাও পর্বত লঙ্ঘনের শক্তি। মূককে কর বাচাল। অন্ধকে দান কর বিশ্বদর্শনের নয়ন। আমাকে বঞ্চিত করো না। আমার আশার আলো নিরাশার নির্বাপনে ম্লান করে দিও না। তোমাকে দেখার আনন্দে আমাকে তন্ময় করে রাখো। তোমার মহিমা-সঙ্গীতে আমায় মুখর করে দাও। মাগো, মা, তোমার ঐ মৃন্ময় মূর্তি আমার অন্তর মন্দিরে কি চিন্ময় হয়ে উঠবে না কোনো দিন!

ধ্যানের আসনে বসে নিবেদিতা আকুল আকুতি জানায়। সারা অন্তর মাতৃ-মধুর স্পর্শে ভরপুর হয়ে যায়। নিবেদিতা যেন কোন অতল গভীরে তলিয়ে যায়।

সুরেন্দ্র বললে একদিন—

বললে নিবেদিতাকে, "যদি মূর্তি পূজাই করলে তো অমন বীভৎস কালী মূর্তির কেন?"

বেশ একটু আঘাত লাগল নিবেদিতার মনে। বুঝি বা একটু রুষ্টও হলো। বলল তাই, "আমি মূর্তি পূজা করি না।"

—তবে?

"যেমন আমার অন্তরে মা বিরাজিতা, তেমনি তোমার অন্তরেও তিনি আছেন। এ সত্যকে অস্বীকার করা চলে না। তাছাড়া, এতে এত আপত্তিটাই বা কিসের?"

যা ছিল এতদিন একান্ত গোপন, তা আজ ব্যক্ত হয়ে গেল সহসা। মাতৃ সাধনায় সিদ্ধ সাধিকার কথা শুনে সুরেন্দ্র একটু বিস্মিতই হলো বটে। তা হোক। গুরুর কৃপায় নিবেদিতার মানস নয়ন খুলে গেছে। সে দেখতে পেয়েছে মমতাময়ী মায়ের মহিমময় প্রকাশ। কি করে তাকে সে অস্বীকার করবে?

স্বামীজী বলেছিলেন নিবেদিতাকে, "সপে দাও নিজেকে তার কাছে।"

সপে নিবেদিতাকে সে দিয়েছে মায়ের পায়ে। কিন্তু একটি জিনিস তাকে জানতেই হবে। করতে হবে অনুভব। ধ্যানের গভীরে ডুবে গেলে তখন যেন শুনতে পায় তাঁর পায়ের শব্দ। একটা প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাঝ থেকে যেন স্পন্দিত

হয়ে ওঠে মায়ের জীবস্তরূপ। তাই নিবেদিতা আপন সত্তা বিলুপ্ত হয়ে দিন রাত শুধু ডাকে—"জয় মা কালী, জয় মা কালী।"

এক অক্ষরের এই 'মা' নামের যে কি মহিমা তা যেন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে নিবেদিতার হৃদয় মন্দিরে। ঠিক এমনি একটা মন ও আগ্রহ নিয়ে নিবেদিতা ঝাপিয়ে পড়েছিল সাধন সমরে। অর্জন করল শক্তি। মা করলেন এই বিদেশী মহিলাকে কৃপা ও করুণা।

এবারে শুরু হলো যাত্রা। গুরু একদিন আদেশ করলেন নিবেদিতাকে, "এবার তোমাকে কালী সম্বন্ধে বলতে হবে মার্গট। তোমার কালী।"

নিবেদিতা তাকিয়ে থাকে পলকহীন নয়নে।

তাকিয়ে থাকে গুরুর মুখের পানে। সে দৃষ্টির মধ্যে নিবেদিতার অন্তরের ভাষা ভেসে ওঠে—কি বলব আমি। একটি অনুক্ত প্রশ্ন।

"মাকে যেমন বুঝেছ তেমনি তাঁকে প্রকাশ করবে।"

নীরব নিবেদিতা। কিন্তু অন্তর তাব মুখর। নিয়ত রণিত ধ্বনিত হচ্ছে প্রার্থনার আর্তি। তন্‌হার শেষে যে কান্না তা যেন নিবেদিতার আত্মাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

এক একটা দিন যায়।

নিবেদিতার বুকের স্পন্দন তরিৎ বেগে ছোটে। দিন তো এগিয়ে আসছে। কিন্তু সত্যিই কি বলবে সে। কোন কথা দিয়ে শুরু করবে মাতৃ-বন্দনা।

সংশয়, ভয়, দ্বিধা দ্বন্দ্ব নানা ভাবে তাকে প্রতিহত করতে চায়। আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে নিবেদিতা। অন্তর থেকে জেগে ওঠে এক শাশ্বত বাণী—"আমায় তুষ্ট করতে কি বেশী কিছু লাগে? একটু ভালোবাসা, প্রাণ দিও তবেই আমি তুষ্ট।"

পূর্বেই নিবেদিতার বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে বলা হয়েছিল।

'কালীপূজা' সম্বন্ধে বলবে নিবেদিতা। বলবে জনাকীর্ণ এ্যালবার্ট হলে দাঁড়িয়ে।

ব্রাহ্ম বন্ধুদের উৎসাহের বিরাম নেই। তাঁরাও বেশ আনন্দে দিন গুণছিলেন। তাঁরা ঠিক একটি এমনি সুযোগের প্রতীক্ষায়ই এত দিন ছিল। বেশ জমাট হয়ে সবাই এসেছে।

আজ নিবেদিতা বক্তৃতা দিবে।

লোকে লোকারণ্য। জনতার অবিচ্ছন্ন মিছিল চলেছে।

ওরা কোথায় যাচ্ছে?

এ্যালবার্ট হলে। যাচ্ছে নিবেদিতার 'কালীপূজা' সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে।

নিবেদিতা অন্তর মন সপে দিয়েছে মায়ের শ্রীচরণে। স্মরণ করছে গুরুর মূর্তি। হে মহাশক্তিধর, তুমি আমাকে শক্তি দাও। দাও আমাকে বিশ্ব বোধের বুদ্ধি।

মঞ্চে এসে দাঁড়াল নিবেদিতা। উন্মুখ জনতা। তাকিয়ে আছে অপলক নয়নে। আত্মাহুতির অনির্বান শুদ্ধি নিবেদিতাকে করেছে স্নিগ্ধ পবিত্র।

ওরা কান পেতে শোনে—

শোনে মার্গারেটের মুখে ভারত আত্মার মর্ম মহিমা। বিস্ময়ে স্তব্ধ জনতা। সকলের মনেই এক প্রশ্ন এক বিস্ময়—কি অপূর্ব! কি অদ্ভুত!

ঝড়ের মত বলে গেল নিবেদিতা। সভা হলো নিস্তব্ধ। স্বামীজীও বেশ খুশী হয়েছেন। মনের আনন্দে তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন ঠাকুর বাড়ির সরলার সঙ্গে।

যদিও ঠাকুর বাড়ি নিবেদিতার বিরোধী দল। ওরা তীব্র ভাষায় করবে সমালোচনা। তবুও তাদের উপস্থিতি নিবেদিতা একান্ত ভাবেই প্রার্থনা করছিল।

নিবেদিতার মনোবাসনা পূর্ণ হলো। ওরা সবাই বক্তৃতা শুনল। বক্তৃতার শেষে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ল নিবেদিতা। ব্রাহ্মবন্ধুরা বলল নিবেদিতাকে, "বেশ চমৎকার লাগল তোমার ভাষণ। আমরা তৃপ্ত হয়েছি। কিন্তু বলতে পারো বাস্তব জীবনে কালীর স্বরূপ কি?"

আরও কত লোক কত কিছু বলল। নিবেদিতা একটা চিঠি লিখল তার বান্ধবীকে। "আমাকে আক্রমণ করা হচ্ছে। লোকে এটা দেখছে না যে কেউ ব্যবসাদারীর মতলব নিয়ে কিছু করছে না। শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধিকে হাতানোর জন্য কালীপূজার কারবার চালু করা হচ্ছে, এ তো নয়। কালী যা তা জেনে শুনেই তাঁর পূজা করি। তিনি ভগবতী। ভগবানের নামের মত তাঁর রূপের কল্পনা আছে। সে কল্পনার শক্তিও আছে। এও তাই। কোনও দরকারে কিংবা ভালোবেসে কেউ যদি তোমার নাম ধরে ডাকে, তুমি সাড়া দাও। দেবতার কালী নামটিও তাই। আমাদের যেমন ডাকার মন্ত্র হল, "দিব্য ধামবাসী হে পিতা!" তেমনি "মা কালী!"

এ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা দেওয়ার পরে আর একটি নূতন আমন্ত্রণ এলো নিবেদিতার। আমন্ত্রণ এলো কালীঘাটে প্রধান পুরোহিতের তরফ থেকে। তিনি নিজে এলেন বাগবাজারে। জানালেন নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ। কালীমন্দিরে নিবেদিতাকে কিছু বলবার জন্য করলেন অনুরোধ। ২৮শে মে মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে বক্তৃতা করতে হবে নিবেদিতাকে।

এলো সে শুভদিন।

স্বামীজী সকালে এলেন নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে। করে গেলেন আশীর্বাদ। বললেন স্বামীজী নিবেদিতাকে, "এই কালী আর তাঁর যত কাণ্ড কারখানাকে কী অশ্রদ্ধাই না করতাম! আমি তাঁকে স্বীকার করিনি,। ছ'টি বছর লড়াই করেছি। পরমহংসদেব আমায় উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর পায়, তবুও এতদিন যুঝেছি। জান তো মানুষটাকে ভালোবাসতাম, তাই জোর পেয়েছি। জানতাম এমন খাঁটি লোক আর কখনও দেখিনি বা দেখব না, আর জানতাম তিনি আমায় যেমন ভালোবাসেন আর কেউ এমন কি বাবা-মারও তেমন ভালোবাসার সাধ্য নেই। কিন্তু তিনি যে কী বিরাট তখনও তা বুঝতে পারিনি। বুঝেছি পরে। যখন আত্মসমর্পণ করলাম তখন······"

নিবেদিতা প্রশ্ন করল, "আপনার কিসে প্রত্যয় হলো, বলবেন না আমায়?"

বিবেকানন্দ বললেন, থাক সে-কথা, আমার সঙ্গেই ছাই হয়ে যাবে।······ভয়ানক দুরবস্থায় পড়েছিলাম এই সময়টাতে। মা দেখলেন এই সুযোগে আমায় গোলাম বানাতে হবে। হাঁ ঠিক এই তার মুখের কথা। গোলাম বানাব তোমায়। ঠাকুর আমাকে সপে দিলেন তাঁর পায়ে। ······আশ্চর্য! এর পরে তিনি আর মোটে দুটি বছর বেঁচে ছিলেন। আর তার বেশীর ভাগই ছিলেন অসুস্থ। মাত্র শরীরটা তার ছ'টি মাস ভাল ছিল। গুরু নানকও এমনি ছিলেন, জান? তিনিও তাঁর শক্তি সঞ্চারের জন্য একটি শিষ্য খুঁজে বেড়াতেন······তাঁকে পেলে তবে তিনি দেহ ছাড়তে পারবেন······

তখনও বলেই চলেছেন স্বামীজী, "কোনও দ্বিধা বা সন্দেহের কারণ নেই, মা শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ আশ্রয় করে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করছেন। দেখ মার্গট, ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এক বিরাট শক্তি আছেন যিনি আপনাকে 'নারী' ভাবনা করেন, তিনিই কালী। এ আমি বিশ্বাস না করে পারি না। আবার ব্রহ্মকেও বিশ্বাস করি। ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নাই, এও। অসংখ্য কোষে মিলে দেহ গড়ে ওঠে, তৈরী হয় একটা মানুষ। অগণ্য মস্তিষ্ক কেন্দ্রে উৎপন্ন হয় এক চেতনা। সর্বত্রই বহুর মধ্যে এক। ব্রহ্ম একই, দ্বিতীয় নেই। আবার তিনিই বহু হয়ে যান। এক এক সময় কি যন্ত্রণা যে দেন মা! তখন তার কাছে গিয়ে বলি, কাল যদি আমায় এই এই না দাও, আমি তোমায় দূর করে দিয়ে শুধু ব্রহ্মের কথা বলে বেড়াব।······ মার্গট, আমি সব জিনিস কিন্তু ঠিক ঠিক পেয়ে যাই······"

আবেগ মথিত অন্তরে কথাগুলো বলেছিলেন স্বামীজী। সহসা কোথায় যেন

হারিয়ে গেলেন। অহঙ্কার মরণ হলো। দীনাতিদীনের মত বললেন তিনি, বললেন নিবেদিতাকে, "তোমার ভাষণের দিন আমাকে সভাপতি করতে চেয়েছে কালীঘাটের পুরোহিতরা। কিন্তু আমি যাবো না মার্গট। আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারব না।"

বিদায় নেবার সময় নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করে গেলেন স্বামীজী। বললেন, "মায়ের গুণগান যে করে, সে-ই ধন্য। .....তাঁর নিত্য দাসী হও।"

নির্ধারিত দিনটি এলো। স্বামী সদানন্দের সঙ্গে নিবেদিতা এলো কালীঘাটে। মন্দির প্রাঙ্গণে। সরু একটা পথ পেরিয়ে যেতে হয়েছে নিবেদিতাকে। রাস্তার দুধারে জীবন যন্ত্রণায় ছটফট করছে কতকগুলি মানুষ। লোকেরা বলে ওদের ভিখারী। হাহাকার হতাশায় অন্নরিক্ত, ক্ষুধা ক্লিষ্ট মুখগুলোর উপর নেমেছে বিষণ্ণ গোধূলির ছায়া। নিবেদিতা অপলক তাকিয়ে থাকে। প্রাণটা ডুকরে কেঁদে উঠে। বড় আঘাত লাগে তার বুকে।

ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল নিবেদিতা সভা মঞ্চে।

প্রচুর লোক জমেছে। শুনছে তারা বিদেশী এক মহিলার কাছে এদেশেব দেব দেবীর কথা। উন্মুখ জনতা। ভক্তিপ্লুত অন্তরে উৎকর্ণ হয়ে আছে একটি শুভক্ষণের প্রতীক্ষায়। নিবেদিতা প্রথমটায় অন্তরের প্রণতি নিবেদন কবল মায়ের উদ্দেশ্যে। বলতে লাগল ভাব গম্ভীব কণ্ঠে—"আজ বিকেলে আমরা যেখানে এসে মিলিত হয়েছি, মায়েব যত মন্দির আছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে পবিত্র। যুগ যুগান্তর ধরে বহু পুণ্যাত্মারা অন্তবের পিপাসা নিয়ে এখানে এসেছেন। নিবেদন করেছেন তাঁদের কান্না ও আর্তি। স্মরণ কবেছেন মাকে। আমরা এখানে মায়ের পূজা করতে এসেছি, এই কথাটি যেন না ভুলি।"

আবার বলতে লাগলো, "যতদিন আমবা অশক্ত, ততদিন মায়ের নামে সব জ্বালা জুড়ায়, হৃদয়ক্ষতে পড়ে স্নিগ্ধ প্রলেপ। এ অধ্যায় যখন শেষ হয়, তখন আত্মাহুতিতে ধন্য হয়েছ বলে গোটা জীবনটাই যেন ছন্দোময় উল্লাসে ভরে ওঠে। ......মনে হয় আধ্যাত্মিকতা আর আভিজাত্যের গর্বের মধ্যে একটা বিরোধ আছে। ধর্মের আসন জনসাধারণেবই হৃদয়-গুহায়। ধর্মকে মার্জিত রূপ দেওয়া মানেই তাকে বীর্যহীন করা। প্রত্যেকে তার মনের খোরাক পাবে ধর্মে, তবে না। সুতরাং দেবোপাসনার রহস্যার্থ যদি আকাশচারীও হয়, তার প্রতিষ্ঠা কিন্তু হওয়া চাই এই মাটির বুকেই। দ্বৈতবাদ যেদিন থাকবে না, ভগবানের ভগবত্তাও নয়, সেই দূর ভবিষ্যতে হয়তো এর অন্যথা ঘটতে পারে। কিন্তু আজ নয়। শবরূপী দেবতার বুকেই আনন্দময়ী মায়ের চিন্ময় নৃত্য বিলাস ....."

কালীঘাট মন্দিরে এই ভাষণটি দিল নিবেদিতা। দিল উচ্ছল প্রাণের ভক্তির অর্ঘ্য করে মায়ের শ্রীচরণে।

কালীঘাটের মায়ের মন্দিরে বক্তৃতা দেওয়ার পরেই নিবেদিতার যেন একটু ভাবান্তর হলো। কয়েকটা দিন পরে বলল নিবেদিতা তার এক বন্ধুকে। "কালী সম্বন্ধে আমার মনে নতুন একটা ভাব জেগেছে। কি করে শিব-আঁখি মায়ের চোখের সঙ্গে মিলেছে তাই দেখছিলাম। পদতলে শায়িত শিব। ঢুলু ঢুলু নয়ন। কালীতো ঐ সদাশিবের দৃষ্টির সৃষ্টি। নিজেকে রেখেছেন আড়ালে সাক্ষীরূপে। দেখছেন দেবত্মশক্তিকে। শিবই কালী, কালীই শিব। নিরন্তর চলেছে মানুষের মনে বিপুল শক্তির আলোড়ন, তারই প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে দেবতার এই রূপে—এই কি সত্য? অর্থাৎ দেবতাকে মানুষই কি সৃষ্টি করে? তাই ভাবি। বিশ্বের রহস্য কোন্ লাস্যময়ীর লীলাচাতুরীর হাল্কা ওড়নায় ঢাকা।"

নিবেদিতা অন্তর ভক্তির তরঙ্গে আপ্লুত হয়ে যায়। আত্মার আকাশে ভেসে ওঠে মায়ের মহিমময় রূপ। নিবেদিতা বিহ্বল হয়ে যায়। অলক্ষ্যে কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়—"মা, মা, আমি তোমার আজন্মের দাসী, তোমায় দেবার মত আমার কিছু নেই। শুধু আছে হৃদয় ভরা ভালোবাসা। আমি প্রাণ ঢেলে তোমায় শুধু ভালোবাসি।"

হে কৃপাময়ী তোমার কৃপা কটাক্ষে ধন্য কর এ দাসীকে। তৃপ্ত কর দাসীর অন্তর তন্‌হাকে।

দেহ ভেঙেছে স্বামীজীর।

মনটা তার চেয়েও দুর্বল হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আজকাল বলেন তিনি, "দিন ফুরিয়ে এসেছে।"

এদিকে মঠের ভাণ্ডার শূণ্য। অভাবের দুঃসহ পীড়ন। চতুর্দিকে যেন মরুর কান্না। সন্ন্যাসীরা যে যার মত অর্থ সংগ্রহে বেরিয়ে পড়েছে। গুজরাট থেকে দুজন সন্ন্যাসী পাঠিয়েছে হাজার টাকার মত। আর কোনো উপায় নেই।

মাত্র একটি পথই খোলা আছে শুধু। তা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ভারতের জন্য কাজ করা। যদি কিছু হয় তাতে।

মঠের অবস্থা খুবই জটিল।

পুরানো সন্ন্যাসীরা দুঃখের দহন সইতে প্রস্তুত। কিন্তু যারা নতুন, যাদের সংযম, তিতিক্ষা ও কঠোরতার পরীক্ষা এখনো হয়নি—তাদের 'পর কি করে আস্তা রাখা যায়?

স্বামীজী তাদের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। অল্প কয়েকটি রইল মঠে।

নিবেদিতাকে আগেই বলেছেন স্বামীজী, "আমাদের আর টাকা নেই। পাবারও আশা নেই। সব ভেঙ্গে পড়বার আগেই আমাদের সংস্রব ত্যাগ কর মার্গট।"

নিবেদিতা তার জবাবে বলেছে, "আপনি বললে আমি চলে যাব ঠিকই। কিন্তু আমি কি কোনো অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছি স্বামীজী।"

বলেছেন স্বামীজী, "না সেদিক থেকে কোনো অভিযোগ নেই তোমার বিরুদ্ধে। কাজ তুমি ভালোই করেছ। কিন্তু আমরাই পারলাম না।"

স্বামীজীর মুখে হতাশার কথা শুনে নিবেদিতার আত্মায় আগুন ধরে যায়। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার অন্তর। স্বামীজীর পার্শে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলে, "আপনি অপারগ হতে পারেন স্বামীজী। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কি পরাভব হতে পারে কখনো?"

ক্ষণকাল নীরব থেকে বলেন স্বামীজী, "এভাবে আমি তাঁকে দেখিনা। তাঁর সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা অন্য রকম। বলতে পার সৃষ্টি ছাড়া। আমি ভাবি, সে আমার ছেলে। জান তো, দলের মধ্যে আমি সবচেয়ে গুণ্ডা বলে আমার 'পর তাঁর সবসময় একটা নির্ভর ছিল।"

"বেশ তো, আমার কাছে ছ'শ কুড়ি টাকা জমানো আছে। ওটা আমি ছুঁইনি। কাজ করবার মত যথেষ্ট সামর্থ আমাদের আছে বলেই আমার মনে হয়। না হয় এক সঙ্গেই সবাই ডুবে যাব। আপনি যে ভাবেন মাথা উঁচু করে বাঁচতে হবে, ওটা নেহাত লোক দেখানো ভাবনা। আমাদের কাউকে দেখাবার কিছু নেই।

একটু থেমে আবার বলে। আমার কি করে চলবে তা মোটেই ভাববেন না। আমার যা আছে তাতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভালোই কাটবে। এমন ভাবে কাজ করে যাব যেন ক্ষয় ক্ষতির কোনও সম্ভাবনাই নাই। কেন জানিনা, মনে হয় যা করছি, ঠিকই করছি। শাশ্বত কালের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।"

নৈরাশ্যের গুহা গহ্বর থেকে যেন সূর্য-দ্যুতি প্রতিফলিত হলো। মিস্ ম্যাকলয়েডকে লিখল নিবেদিতা, "আমি স্বামীজীর একটা বোঝা হয়ে উঠেছি। টাকার চেষ্টায় বার হব ঠিক করেছি। বছরে মাত্র পঞ্চাশটা পাউণ্ড হলেই আমার পাঁচটি ছেলে মেয়ের একটি স্কুল চলতে পারে। আমি আমার সঙ্কল্পে অটল। জীবনে এই প্রথম একটা সাফল্যের সুযোগ পেয়েছি।"

"স্বামীজীকে নিয়ে এখনই চলে এসো।" ম্যাকলয়েড লিখল।

স্বামী সদানন্দ বুঝিয়ে বলল মেয়েদের, "তোমাদের আমরা ছেড়ে যাচ্ছিনে। ফিরে এসে অনেক বড় স্কুল খুলব।"

সবাইকে কথা শোনাতে পারল, কিন্তু সন্তোষিণীর চোখ ফেটে জলের ধারা নামল অঝোরে—আমি কি করব! আমার কি উপায় হবে!

নিবেদিতা তাকে টেনে আনে বুকের মধ্যে। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "ছিঃ, অমন করে কাঁদতে নেই।"

সন্তোষিণীর কান্না আরও বেড়ে যায়। নিবেদিতা চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে, "না আর চোখের জল ফেলো না সন্তোষ। তোমার বাবার কাছে কিছু টাকা রেখে গেলাম। ওটা দিয়ে ইংরাজী শেখার কাজটা হবে। যতদিন আমি থাকব না, ততদিন তোমাকে দেখবেন সন্ন্যাসীরা। কাঁদে না, চোখ মোছ।"

নিবেদিতা মনে মনে একটা পরিকল্পনা করে নিল। বলল তা স্বামীজীর কাছে। স্বামীজী বললেন, "তোমার পরিকল্পনাটি বেশ ভালোই হয়েছে। পশ্চিম থেকে কিছু অর্থ নিয়ে ফিরতে পারলে তোমার কাজও ভালো ভাবেই চলবে। তোমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করবার একটা সুযোগ পাবে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো মার্গট। কোনো মতেই ভুলো না যে তুমি মায়ের মেয়ে। তুমি যখন তৈরী হবে, তখন তোমার 'পরে অনেক ঝুঁকি পড়বে। আর দেরি নয়। তোমার ভূত ভবিষ্যৎ

আমার চোখের সামনে মেলা আছে। কিন্তু এখন নম্র হও, মাথা নিচু করে থাক। মায়ের লক্ষী মেয়ের মত তাঁর কথা শুনে চল।”

যাবার দিন স্থির হলো। নিবেদিতা যাবে। যাবে স্বামী তুরীয়ানন্দও। যাবার আগের দিনে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন স্বামীজী। বসলেন অনেকক্ষণ সতীর্থদের নিয়ে। নিবেদিতা চুপি চুপি এলো পঞ্চবটিতে। এখানেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

নিবেদিতা অশ্রু ছল ছল নেত্রে এসে দাঁড়ায় সেখানে। দুখানা করপল্লব যুক্ত করে রিক্ত কণ্ঠে অন্তরের আর্তি নিবেদন করে বলে, “মাগো, সত্যি যদি ওঁর চির শান্তির দিন, চির নিদ্রার দিন ঘনিয়ে এসে থাকে, তবে বিদায়ের আগে ওঁকে স্বস্তি দাও, বিশ্রাম দাও একটু। যে কষ্ট ওঁকে দিতে চাও তা আমায় দাও মা।...”

ওঁর সব গ্লানি, সব চিন্তার বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে ওঁকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও মা।

“যতদিন তিনি বাঁচবেন আর এ দেশে থাকবেন, আমি তাঁকে ছেড়ে দূরে যাব না। সে আমি পারব না। তিনি যে আমার ঠাকুর, আমি যে তাকে ভালোবাসি। আমাকে তার দরকার অথচ আমি তাঁব কাছে থাকব না—এত বড় ঝুঁকি নিতে কিছুতেই পারব না আমি। এই ক'বছরে তাঁর পায়ে পূজা নিবেদনের ভাবটি পলে-পলে কেমন করে দল মেলেছে তা ভাবতে গেলে শিউরে উঠি। কথাটা বলা ছেলে-মানুষি, কিন্তু ভগবান যদি স্বামীজীর শেষ মুহূর্তটি যন্ত্রণায় বিষিয়ে তোলেন, তবে অমন ভগবানকে আমি চাইনা, তাঁকে একটুও ভালোবাসতে আমি পারব না। এই একটি সুকান্ত পুরুষের জন্য অনন্তকাল আমি সগুণের ঘরে বন্দিনী থাকব, নির্গুণের ভাবনায় আমার দরকার নেই। হাঁ, তাঁর আর যে-ভাবই থাক না, তিনি যে আমার ঠাকুর শুধু এরই জন্য আমি বেঁচে থাকব, আমরণ তাঁর কাজ করে যাব।..... কিন্তু না, তিনি তা করবেন না·· করতে পারেন না। সে যে হবে পৈশাচিক নির্মমতা...”

সাত্বিক প্রেমের সার্বিক প্রকাশ এযে। নিবেদিতা তার অন্তর পুরুষ বলে বরণ করেছে স্বামীজীকে। তার বেদনা, তার কষ্ট কিছুতেই সে সহ্য করতে পারবে না। তাছাড়া, মনের মানুষের চেয়ে বড় ভগবান বা শক্তিই বা আর কি আছে! প্রাণের যে এই প্রত্যয়, এই ভালোবাসার মাধুর্য, এতেই নিবেদিতাকে করবে মহিয়সী। করবে সিদ্ধকামা যোগিণী। দেবতা আর প্রিয়র মাঝে কোনো ব্যবধান রাখেনি নিবেদিতা। দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়কে করেছে সে দেবতা। পরিয়েছে

তার কণ্ঠে প্রেমের মালা। তাঁর কষ্ট, তার দুঃখ কেমন করে সইবে সে। তাই তো—বলল নিবেদিতা—ওর কষ্ট আমাকে দাও।

একেই বলে সাত্ত্বিক প্রেম। বৈষ্ণবতন্ত্র বলে রাগানুগাভক্তি। আমার সুখ আমার আনন্দ, সবকিছু বিসর্জিত হবে তোমারই জন্য। তোমারই গরবে হবো আমি গরবিণী। তোমার সুখে পাবো সুখ।

এরই মধ্যে স্বামীজী ফিরে এলেন। বসলেন গঙ্গার পারে। বললেন নিবেদিতাকে, "মার্গট, প্রথম যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলাম সে দিনের মতই আজ আমি মুক্ত। এখন মঠের কর্তৃপক্ষের সংশ্রব ছেড়ে গাছতলায় বসতে পারি গিয়ে ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে।"

যাবার দিনে স্বামীজী সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ করলেন। তারা জানাল স্বামীজীকে বিদায় সম্ভাষণ। নিবেদিতা এগিয়ে এলো। দিল স্বামীজীকে কয়েকটি ফুল। করলেন স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতাকে আশীর্বাদ।

সমুদ্রের বুকে জাহাজ ভাসল। অবারিত উন্মুক্ত আকাশ। নিচে তরঙ্গ ফেনিল জলরাশী। তারই বুক চিরে চলেছে জাহাজ। কয়েকটা দিন কাটল।

একটু ভালো মনে হলো স্বামীজীর শরীর। আশাহত স্তিমিত মনে যেন নতুন সূর্য উঠেছে। আর ভয় নেই। পশ্চিমের অর্থ আর পূর্বের মন—দুই মিলে এক পরম ঐক্যের মিলন মন্দির গড়ে উঠবে।

নিবেদিতারও কি কম আনন্দ? একদিন একটা বিরাট স্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে সে এসেছিল গৈরিক ভারতে। ভেবেছিল জীবনটা এখানে দায়মুক্ত হবে। শান্তির স্পর্শে উঠবে উজ্জীবিত হয়ে। কিন্তু রূঢ় বাস্তবের সংঘাত তার সে আশার মিনার-গুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। তাই আবার সেই ভারতের জন্যই ভিক্ষুণীর মত পাড়ি উজিয়েছে পশ্চিম অভিমুখে। এতে কোনো দুঃখ নেই তার। নেই এতটুকু আক্ষেপ। বরং তার বুকে যেন অমিত বল সে পেতে লাগল। উৎসাহে উদ্দীপ্ত হলো। লিখল ম্যাকলয়েডকে, "যে কাজে হাত দিয়েছি তার জন্য বাঁদীর মত খাটতে আমি প্রস্তুত। একটা বিরাট শক্তির খেলা অনুভব করছি আত্মার জগতে।"

একটা বিরাট আশা নিয়ে ওঁরা এসে পৌছল, পৌছল লণ্ডনে।

মেয়েকে এতদিন পরে কাছে পেয়ে খুব খুশী হলেন মেরি নোবেল। স্বামীজীকে আদর করলেন সন্তানের মত। যেন ওঁরা এক সংসারেরই লোক।

অতিথিদের জন্য ওঁদের কত ভাবনা। সব সময়ের জন্যই মেরি নোবেল ভাবেন—এই বুঝি ওঁদের অযত্ন হলো।

পাড়ারই আর একটা ঘর ভাড়া করা হলো। এবারে একটু চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারলেন নিবেদিতার মা।

শরীর সত্যিই স্বামীজীর ভাঙনের মুখে। বিশ্রাম, আর বিশ্রাম। রণশ্রান্ত সৈনিকের এখন অখণ্ড বিশ্রামের দরকার। লণ্ডনে এসে সেরকম একটা পরিবেশ স্বামীজী পেলেন। পেলেন মেরি নোবেলের স্নেহের অঙ্ক। মেরির মধ্যে স্বামীজী যেন দেখতে পান তাঁর গর্ভধারিণী জননীর প্রতিচ্ছবি। মাথা রাখেন তাঁর কোলে। বলেন, "আমি ক্লান্ত, নিশ্বাস নিতেও আমার কষ্ট হয়। তোমার এই মাতৃ-হৃদয়ের আদর-যত্ন, এ যেন মরুভূমিতে মরুদ্যান! এই তো চাইছিলাম এদ্দিন ধরে।"

মেরির আদর, যত্ন ও স্নেহে লালিত পালিত হতে লাগলেন স্বামীজী। অসুস্থ শরীর। সংবাদটা পৌছল গিয়ে আমেরিকায়। সেখান থেকে ছুটে এলো স্বামীজীর শিষ্যা মিসেস ফ্রাঙ্ক আর ক্রিস্টিন্ গ্রিন্স্টিডেল। ওরা চাইল গুরুকে নিউ-ইয়র্কে নিয়ে যেতে। কিন্তু মেরির মুখের পানে তাকিয়ে সব পরিকল্পনা বাদ দিতে হলো। একটা বাসা ভাড়া নিল অবশেষে উইম্বলডনে।

লণ্ডনের শিষ্যরা অনেকেই বাইরে। গ্রীষ্মের ছুটি হয়েছে। তাই যে যার মত বেরিয়ে পড়েছে। তাছাড়া কিছুটা দ্বন্দ্বও দেখা দিয়েছে ওদের মধ্যে। কেউ কেউ নিজেদের মত করে দল গড়ল বেদান্ত প্রচার করবার জন্য। স্বামীজীর আদর্শকে ঠিক ঠিক অন্তরে পোষণ করতে পারছিল না যেন। মিঃ ষ্টার্ডিওয়েলস্ বিয়ে করে গিয়ে ঘর বেঁধেছে অন্যত্র।

ওদের এই দ্বৈত মতের মূঢ় প্রচেষ্টার কথা শুনে স্বামীজী ব্যথা পান। নিবেদিতার অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। কায়মনে নিবেদিতা প্রার্থনা করে—ওদের সুমতি হোক। ওরা পথের অন্ধকার ঠেলে আলোর অভিসারে যাক।

সাথী সঙ্গীরা এসে বলে নিবেদিতাকে ভারতবর্ষের কাহিনী শোনাও।

নিবেদিতা ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলতে থাকে দেব-প্রিয় ভারতবর্ষের কথা।

ওদিকে মে দিদিকে খুব শক্ত করে ধরেছে। বলে—দিদি আমার বিয়ে পর্যন্ত তোমাকে থাকতে হবে কিন্তু।

নিবেদিতা মিষ্টি হেসে ছোট বোনকে আদর করে। কাছে টেনে নেয়। কিন্তু ওর কি বিশ্রাম করবার সময় আছে?

একটা বিরাট কাজের দায়িত্ব নিয়ে সে এসেছে। দিনরাত শুধু সেই ভাবনাই তার মনকে আবিষ্ট করে রাখে।

জগতে কি কান্নার বিরাম আছে ?

না।

সমস্ত জীবনই-তো কান্না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক অভঙ্গ বিলাপের ক্ষীণতান অন্তরকে নিয়ত স্তিমিত করে রাখে।

বলি এ কান্নার সমাপ্তি কোথায় ? নেই কি তা ?

আছে।

প্রতীক্ষা আর তিতিক্ষা। সঙ্গে যুক্ত কর তন্‌হা। ডুবে যাও আত্মরতির সায়র-স্নানে। তিনি যে তোমার মধ্যে চির জাগরুক। চেত দর্পণ ধৌত কর। অন্তর আঁখি মেলে চাও। তাঁকে দেখার সাধ মিটিয়ে নাও। তাঁকে প্রিয়জনের মত গ্রহণ কর জীবনে। ঘর বাঁধ তাঁকে নিয়ে। লাভ কর তাঁর সান্নিধ্য। দেখবে সব কান্নার অবসান হয়ে গেছে। সব দেখার সাধ মিটেছে। সব জ্বালার দহন নিভে গেছে। তখন বিশ্ব হয়ে উঠবে তোমার কুটুম। প্রাণে জাগবে অফুরন্ত প্রেম। তা দিয়ে শেষ করা যায় না—শত্রু মিত্র ভেদ থাকে না। আপন বলে সবাইকে জড়িয়ে ধরে।

নিবেদিতা বললে ক্রিস্টিনকে, "তাঁকে (গুরুকে) ভালোবাসি বলেই তোমাকেও ভালোবাসি। তোমার আমার মধ্যে কিছুই আড়াল নেই। তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্য আমরা দাসীর মত খাটব পরস্পরের বন্ধু হয়ে, এটা কিছু মনে প্রাণে অনুভব কর না ?"

ক্রিস্টিন একটু অপ্রস্তুত হলো। কারণ সে একটু দূরে দূরে নিজেকে সরিয়ে রাখছিল। কিছুটা অবিশ্বাস, কিছুটা দ্বন্দ্ব তার মনকে নিয়তই আন্দোলিত করছিল। কিন্তু নিবেদিতার কথাগুলো তার তন্দ্রামদির দোলায়িত চিত্তের দুয়ারে সজোরে আঘাত করল। কাজে যখন নেমেই পড়া গেছে তখন সাফল্যের স্বর্ণ সকালকেও ছিনিয়ে আনতে হবে দুর্যোগের তমোবিভা থেকে। তাই নিবেদিতার মুহূর্ত বিরাম নেই। বিশ্রাম নেই।

মেরি নোব্‌ল মার্গারেটের পানে তাকান আর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান। মনে পড়ে বাল্যের কথাগুলো। মনে পড়ে সেই স্বপ্নে ঢাকা দিনের কাহিনী। বড় বিচলিত হয়ে পড়েন মেরি নোব্‌ল। রোজ লোকের জমায়েত হয় স্বামীজীকে ঘিরে একটা

তীব্র আকর্ষণে সবাই যেন মন্ত্র মুগ্ধের মত নীরব হয়ে থাকে। লাভ করে এক অপার্থিব মহিমা।

মের মনের তারগুলোও ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। সমস্ত ছন্দ কোন্ অতল গভীরে যেন আপন হারা হয়ে যায়। লুপ্ত হয়ে যায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের দুর্ভেদ্য কাঠিন্য। রঙিন মনে বিলাসের ফুল বাসরে প্রকীর্ণ হয়ে ওঠে ত্যাগ তিতিক্ষার গৈরিক পথ। নয়নে ধারা নামে অলক্ষ্যে। পাগলের মত দিশাহারা। সে জড়িয়ে ধরে নিবেদিতাকে। বলে—দিদি, আমাকে রক্ষা করো। "তোমার মনের শক্তি আছে। আমায় তুমি বাঁচাও। স্বামিজীর শক্তিকে তুমি ঠেকিয়ে রাখো। তা না হলে এ জীবনে আর সংসারী হতে পারব না।"

অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে নিবেদিতা। মের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সোহাগে। আনন্দে তার অন্তর মন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তার রাজার শক্তি-মাহাত্ম্য বিঘোষিত হচ্ছে মের মুখে। এ কি কম গৌরবের ?

সে অশ্রু ছল ছল নয়নে তাকায় নিবেদিতার পানে। বলে, "আমি যে কথা দিয়ে দিয়েছি। স্বামিজীর ডাক কেমন করে শুনব বলো দিদি ?"

মের যে বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। কেমন করে তা ভাঙবে সে !

ও দিকে রিচমণ্ডও স্বামিজীর প্রতি ঝুকে পড়েছে। স্বামিজীরও ভালো লেগেছে তাকে। সন্ন্যাসীর আদর্শকে রক্ষা করতে গিয়ে ছাড়তে হয়েছে তাকে অনেক কিছুই। একদিন হেসে হেসেই বলে ফেলল রিচমণ্ড, "ভারতের রীতিকে মানতে গিয়ে তামাম বাড়ির লোকে গোমাংস ত্যাগ করেছে স্বামিজী।"

স্বামিজী হেসে ফেললেন। নিয়ে গেলেন একদিন রিচমণ্ডকে রেস্তোরায়। আনালেন একটা শিককাবাব। বললেন, "নাও খেয়ে নাও। তোমার জন্য আনিয়েছি। যে অধিকার থেকে নিবেদিতা তোমাকে করেছে বঞ্চিত, আমি সে অধিকার তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম, রিচমণ্ড।"

অবাক বিস্ময়ে নির্বাক রিচমণ্ড। খুঁজে পায় স্বামিজীর মধ্যে খৃষ্টের পরিচয়। ভারতীয় যোগীর যোগ-যুক্ত মনের প্রকাশ দেখে রিচমণ্ডের শুধু বিস্ময়ই লাগে। মনে মনে ভাবে কি অপূর্ব ! কি সুন্দর !

লণ্ডন থেকে স্বামিজী তাঁর শিষ্যাদের সঙ্গে চলে এলেন আমেরিকায়। নিবেদিতা রয়ে গেল। মের বিয়ের পরে সে যাত্রা করবে।

মের বিয়ে হয়ে গেল। নিবেদিতা সেই রাত্রেই ট্রেন ধরল। বিশ্বমায়ের কর্ম-যজ্ঞে নিজেকে করল উৎসর্গ। জীবনে তার আর কোনো চাহিদা নেই। একে একে সব

বিসর্জন দিতে সে পেরেছে। নিরোধের সাধনায় লাভ করেছে সিদ্ধি। হয়েছে একজন সার্থক দেশ-কর্মিণী।

এই তো জীবন। যৌবনে যে বেদনার বিষকুম্ভ নিয়ে অভিসারিণী বারে বারে আঘাত পেয়ে ফিরে এসেছে—তার কাছে এ ত্যাগ কিছুই নয়।

নিউ-ইয়র্কে চলে এলো নিবেদিতা। কিন্তু এখানে থাকল না বেশি দিন। তার ভাবনার বিরাম নেই। ভারতবর্ষের ভাবনা তাকে সব সময়ের জন্য ভাবিয়ে তুলছে। টাকা সংগ্রহ তাকে করতেই হবে। যে মহান ব্রত নিয়ে সে নেমেছে—তাকে সার্থক না করা পর্যন্ত বুঝি ও দুটি নয়নে নিদ্রাও আসবে না।

স্বামিজী নিবেদিতার কর্মব্যস্ততা বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য করেন। তাছাড়া জাহাজে বসে জিজ্ঞেস করেছিলেন স্বামিজী নিবেদিতাকে, "মার্গট, পশ্চিম থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করতে চাইছ, তা কি পারবে বলে মনে হয়?"

নিবেদিতা উদাসীনের মত বলেছিল সেদিন,—"ঠিক বলতে পারছিনা এখনো, স্বামিজী।"

গুরু তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "পারবে, এ আমার মনের প্রত্যয়। মরবার আগে দুটো জিনিস দেখে যেতে চাই। একটা হয়েছে, বাকী আছে আর একটা।"

সহসা নিবেদিতার অন্তর-বীণায় একটা বেহাগ রাগ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। দুচোখে জলের ছোঁয়া লাগে। হারিয়ে যায় যেন কোন ভাবের গভীরে, "ঠাকুর, একটা গভীর শান্তিতে সব তলিয়ে যেতে চাইছে। কি পাব জানি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস টুটবে না। এবার সময় হয়েছে।……"

কথাগুলো শুনে স্বামিজীর চোখেও জল এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "শান্তি, শান্তি, শান্তি। আমার শান্তি তোমার মাঝে। তাকে সার্থক কর।" বলেই একখানা কাগজ তুলে দিলেন স্বামীজী নিবেদিতার হাতে। বললেন, "আমার দিনগুলো যে শান্তির মাধুরীতে কেটে গেল, তা তোমাকে দিলাম। এই নাও।"

হাত পেতে আশীর্বাদি পুষ্পের মত গ্রহণ করল নিবেদিতা কাগজখানা। খুলে ধরল চোখের সামনে। কি লেখা ওতে? একটি কবিতা—

এতো কবিতা নয়—স্বামিজীর অন্তরদহনের অভিব্যক্তি। জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অনুভূতির অনুরণন থেকে থেকে তাঁকে পাগল করেছে, হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে—এ কবিতায় শোনা গেল তারই প্রতিধ্বনি।

নিউ ইয়র্কে এসে স্বামিজী চাইলেন তার পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। তারা এলো। দেখা হলো। চলল বেদান্ত প্রচার। সবার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল

স্বামী তুরিয়ানন্দের। এপ্রিল থেকে ধারাবাহিক বক্তৃতা করে চলেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে স্বামিজীও যোগ দিলেন। কিছুদিন পরে তুরিয়ানন্দকে স্বামিজী পাঠিয়ে দিলেন কালিফোর্ণিয়ায়। বলে দিলেন তাঁকে, "যাও বীর, কালিফোর্ণিয়ায়, আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর। উড্ডীন কর বেদান্তের পতাকা। মুছে ফেল মন থেকে ভারতবর্ষের চিন্তা। আদর্শ জীবন যাপন কর। কৃতকার্য হবে জগজ্জননীর কৃপায়।"

নিবেদিতাও স্থানে স্থানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে লাগল। ১৭ই জুন বক্তৃতা দিল নিবেদিতা 'হিন্দু রমণীর জীবনাদর্শ' সম্বন্ধে। পরের রবিবারে বক্তৃতা দিল 'প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা' সম্বন্ধে।

একদিন একটা বৈঠকী সভায় বললেন স্বামিজী নিবেদিতাকে, "সাযুজ্য আর ভালোবাসা দুটো সম্পূর্ণ উল্টো জিনিস। যা নিয়ে পাত করলাম জীবন, অন্তরের সিদ্ধরূপ ধরেছে যার মধ্যে, সে জিনিসকে ভালবাসি বললেই সব বলা হয় না। এই অর্থে ধর্মকে আমি ভালবাসি না। ও যেন আমার সঙ্গে এক হয়ে গেছে। ওই তো আমার সর্বস্ব। যাকে ভালবাসি তাকে ঠিক আত্মসাৎ করতে পারি না। ভক্তি আর জ্ঞানের মধ্যে এই তফাৎ, আর এইজন্য ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বড়।"

আবার কখনো বলেন স্বামিজী, "মার্গট, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ় মতে।"

"সমাজ-সংসারের তুচ্ছ ডোরগুলো ছিঁড়তে হবে। অবিরাম আত্মভাবনাকে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণের বিরুদ্ধে অটল রাখতে হবে। ভোজন-বিলাস বা আরাম-শয্যার মত শারদ-শ্রীর উল্লাসও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আয়োজন মাত্র এই জানতে হবে। মানুষের অর্থহীন নিন্দাস্তুতিকে উপেক্ষা করবে এই হল আদর্শ।"

ধ্যান-যোগে আত্মার আর্শিতে যে দর্শনের তন্‌হা, তা এখনো নিয়ে যায় নিবেদিতাকে সান্ত থেকে অনন্তে। ও তন্ময় হয়ে পড়ে। পাগল হয়ে যায়। কিন্তু এ তো ভাবের খেলা। আত্মরতির তৃপ্তিধারায় অমৃত আস্বাদন। না, না, এ নয়। এখনো সময় হয়নি জগতের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে চলে যাবার। কাজ আর কাজ। বহু কাজ বাকী আছে। তাই তো স্বামিজী নিবেদিতার এ ভাব দেখে একটু রুষ্ট হলেন। বললেন একদিন, "এখন কসরত করবার সময় নয়। সহজ অন্তরা-বৃত্তির চাহিদা ছাড়া কিছুই যেন ঠাঁই পায় না জীবনে। মুক্ত আত্মার পক্ষে ধ্যানও একটা বন্ধন।"

সাধনা রূপান্তরিত হোক কর্মে। ধ্যান নিয়োজিত কর মানুষের সেবায়। পূজার ঘরে বসে নরনারায়ণের আরাধনায় যাও তন্ময় হয়ে।

স্বামিজী একদিন এসে ঢুকলেন নিবেদিতার ঘরে। করলেন তাকে আশীর্বাদ। বলতে লাগলেন ভাবগম্ভীর কণ্ঠে—"বুঝেছি এখন, শিবই পরম গুরু। জ্ঞান-বৃক্ষের মূলে যোগারূঢ় হয়ে তিনি শিক্ষা দেন, অজ্ঞান দূর করেন। তাকেই দিয়ে দিতে হবে সব কর্ম। নইলে সুকৃতিও বন্ধন হয়ে ওঠে, তা হতেও কর্মের সৃষ্টি হয়। নিত্যবুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পুরুষই শিব। জগতের হলাহল পান করেন বলেই না তাঁর নাম নীলকণ্ঠ? অনায়াসে কালকূট জীর্ণ করেন এমন মহাপ্রাণ শুধু তিনিই। জীবনের তারুণ্যকে উৎসর্গ করা কি সহজ কথা?……যৌবন-মধ্যাহ্নে যে নিজের জীবন ডালি দিতে পারে সেই ধন্য, সে-ই তো সদ্‌গুরু।"

"যে শান্তি পেয়েছ তাতেই মহিময়ী হয়ে ওঠ। এবারে কাজের সময় এসেছে। তোমার সঙ্গে সর্বদাই শক্তি-স্বরূপিণী মা আছেন। তাঁকে ডাকো। তাঁকে ডেকে জাগিয়ে তোল। দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! মা দশভূজা মূর্তিতে দুর্জয় প্রহরণ ধরে দানব দলন করবেন। তোমায় দেবেন অফুরন্ত শক্তি।

বিনাওয়াটার স্টেশন। এখান থেকেই বিদায়ের পালা। নিবেদিতা এখন অন্য পথের যাত্রী হবে। স্বামিজী বললেন স্নেহ-মথিত কণ্ঠে, "কিছু ভুলে যাও নি তো? সব নিয়েছ ঠিক, ঠিক? শোন মার্গট, কোথাও যাত্রার প্রাক্কালে দুর্গা, দুর্গা, বলবে।"

নিজেই হাত জোড় করলেন স্বামিজী। বলতে লাগলেন, "দুর্গা, দুর্গা।"

ঝড়ের বেগে কাজ করে চলেছে নিবেদিতা। এসেছে যুক্তরাষ্ট্রে। অর্থ তাকে আহরণ করতে হবেই। তা বলে—"নিজেকে বিকিয়ে দেবে না।" স্বামীজীর নির্দেশ। ও কথাটা নিবেদিতার অন্তরে মন্ত্রের মত গেঁথে আছে। ঠিক একটা নির্ধারিত পথ ধরে চলতে থাকে তার কর্ম-প্রবাহ। শিকাগোর ভদ্র সমাজ তেমন সাড়া দিল না নিবেদিতার আহ্বানে। নিবেদিতার মনটা একটু দমে গেল। এর চেয়ে হাল-হাউসে একটা অভূতপূর্ব সাড়া সে পেয়েছিল। তারা আগ্রহে ভেঙে পড়েছিল নিবেদিতার বক্তৃতা শোনবার জন্য। আত্মমুক্তির একটা দুর্জয় বাসনায় তারা তন্ময় হয়ে উঠেছিল। বলেছিল নিবেদিতার কাছে—বলুন, কেমন করে পথ চলব?

এখানকার শ্রোতাদের কাছে নিবেদিতা তুলে ধরে হিন্দু-সাধনার গভীর তত্ত্ব। সবাই মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকে নিবেদিতার পানে।

কিন্তু শিকাগো নিবেদিতাকে বেশ কিছুটা আঘাত করল। স্বামীজী এগিয়ে

এলেন নিবেদিতার কাছে। বললেন, "মার্গট, জগতে যারা আদর্শ প্রচার করতে আসে, তাদের নিজেদের পথ নিজেদেরই করে নিতে হয়। মানুষ যে তাদের কথা শুনবেই এমন আশা করতে আছে কি?"

তুমি তরী ভাসাবে উজান নদীতে। প্রতিকূল বাতাসে ছিঁড়ে যাবে তোমার পালের দড়ি। ভেঙে যাবে আশার ঝাড় লণ্ঠনগুলো। কিন্তু তখনো মনে করবে—আমি মায়ের দাসী। মায়ের দেয়া কাজ নিয়ে পথ চলছি। তবে আর মনে হবে না তুমি পরিত্যক্তা, সর্বহারা।

জগতের বুকে এসেছ। একটা দাগ এঁকে দিয়ে চলে যেতে হবে। বাধা বন্ধন তো আছেই। সেজন্য ভাবনা কি? মা তো আছেন। তিনি সব বাধা দূর করে দেবেন। সব দ্বন্দ্বের অবসান করে নিয়ে যাবেন আনন্দ নিকেতনে। কাজ করে নিবেদিতা। অন্তরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে একটা প্রার্থনা, "এই যে কাজ করছি এর মধ্যে ফলের আকাঙ্ক্ষা কতখানি ঢুকেছে? ভারতের মেয়েদের জন্য যে ভিক্ষা করছি তা কি সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবেই করছি? মা গো! শুধু সেবা করবার আনন্দেই যেন যুগের পর যুগ সেবা করে যেতে পারি।"

ঠিক এমনি দিনে একটা পত্র এলো স্বামীজীর, "আদরিণী নিবেদিতা, প্রাণ ঢেলে তোমাকে আশীর্বাদ করছি। কোনো মতেই ভেঙে পড় না।"

গুরুর বজ্রদৃঢ় বাণীতে নিবেদিতার অন্তরে আনন্দের দোলা লাগে। হৃদয়ের সব ভক্তি ও ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে স্মরণ করে নিবেদিতা, "শিব! শিব! মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি কর্মের শক্তি, ব্যক্তের মধ্যে সুব্যক্তির আকুতি। যখন শেষ হয়ে যাবে সব, তখন জানব শিবের কৃপায় সেই একজনকে। জানব অব্যক্তকে, নির্বিশেষকে, অখণ্ডকে।......কিন্তু কাজ পারলেম না এখনো শুরু করতে।"

নিউইয়র্কে ফিরে এলো নিবেদিতা।

তখন জুন মাস।

ভাবছিল ফিরে যাবে এবারে ভারতবর্ষে। কিন্তু বান্ধবীদের কাছে এসে অন্য রকম ব্যবস্থা হলো।

ওদিকে স্বামিজীও এলেন নিউইয়র্কে। সব বন্ধুবান্ধবরা এলো। প্রচার চলল বেদান্ত। নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হলো। সেও বসে নেই। ১৭ই জুন বক্তৃতা দিল নিবেদিতা, বক্তৃতা দিল, হিন্দুরমণীর জীবনাদর্শ ও প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা সম্বন্ধে। ৩রা জুন স্বামিজী ফিরে এলেন ডেট্রয়েটে। বাইরের পৃথিবী

থেকে ডাক এলো। প্যারিস যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন স্বামীজী। ২০শে জুলাই যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিবেদিতাও যাত্রা করল।

নিবেদিতার মনটা আনন্দে নেচে ওঠে জগদীশ বসুর কথা ভেবে। সেও আসছে ইউরোপে। তার সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে নিবেদিতার।

মিসেস বুল বহু চেষ্টা করে বসুকে একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। জুলাই-এর প্রথম দিকটায় এসে পৌছলেন বসু—প্যারিসে। দেখা করল গেডেসের সঙ্গে। হৃদ্যতা হলো দুই বৈজ্ঞানিকের মধ্যে। বাইরে থেকে দেখে অন্ততঃ যে কেউ বলবে একথাটা। কিন্তু বিজ্ঞান কংগ্রেসের দরবারে দাঁড়িয়ে দুজনে দু মুখো হয়ে গেলো। বসু তাঁর আবিষ্কার 'জড়ের উপর বিদ্যুৎশক্তির প্রতিক্রিয়া' সম্বন্ধে থিসিস পেশ করল। বুঝিয়ে বলল গেডেসকে তরু বিথির প্রাণস্পন্দনের বাণীটি। বলল, "পুরাদস্তুর প্রাণবন্ত জীব ওরা, তবে ওদের নাড়ীতন্ত্র খুব সূক্ষ্মধরণের।"

বসু অলৌকিক বিশ্বাসে দৃঢ়চিত্ত। কিন্তু গেডেস ঠিক তার উল্টো ধারণাটি ধরে আছে। বসু হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিশ্ব নিখিলের সুন্দরকে অনুভব করে। দেখে তাঁর বিচিত্র লীলা প্রবাহ সর্বত্র বিরাজিত। একই জ্যোতিষ্কের বহুবিচ্ছুরণে জগৎ, জীবন, তরু, বিথার স্পন্দিত অনুরণিত হচ্ছে। শুদ্ধ বুদ্ধি ও স্নিগ্ধ চেতদর্পণে তার ছায়াও পড়ছে। বসু এ সত্যটি দেখতে পেয়েছে তার মুগ্ধ দিব্য নেত্রে। গেডেসের দুয়ার এখনো খোলেনি। তাই সত্যের সীমা স্বর্গে আবর্তিত হয়েও নিয়ন্তার সন্ধান জানতে পারছে না। বসু ও গেডেসে এখানেই দুস্তর ব্যবধান।

স্বামীজী তাঁর 'পরিব্রাজক' বইতে প্যারীপ্রদর্শনী ও বসু সম্বন্ধে লিখলেন—"আজ ২৩ শে অক্টোবর। কাল সন্ধ্যার সময় প্যারী হইতে বিদায়। এ বছর প্যারী সভ্য-জগতের এক কেন্দ্র। এ বছর মহাপ্রদর্শনী। নানাদিক্ দেশ সমাগত সজ্জন সঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন, আজ এ প্যারীতে। মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম ঘোষণা করবে, সে নাদ তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে করবে তার স্বদেশকেও সর্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য থেকে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস। এক যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক।

আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজ প্রতিভা ও মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে

বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমি মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করল। সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী। ধন্য বীর বসু ও তাঁর সতী, সাধ্বী, সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী। যে দেশে যান, সেখানে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!"

এদিকে দুদিন যেতে না যেতেই বসুজা পড়ল মহা বিপাকে। একদিকে রাজধানীর সমাজ-আবর্ত, অন্যদিকে মানসিক দ্বন্দ্ব। দুই মিলে বসুর মনটা সত্যিই একটু ব্যথা পেলে।

স্বামীজীও এখানে আসামাত্র পড়লেন তাদের খরদৃষ্টির মধ্যে। পাছে একটা অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়—এই শঙ্কায় মিসেস লেগেট প্রস্তাব করল তার বাড়িতে স্বামিজীকে গিয়ে থাকতে। কিন্তু স্বামিজী সে প্রস্তাবে কান দিলেন না। নিজেকে নিলেন একটু গুটিয়ে। রয়ে গেলেন তাঁর ফরাসী শিষ্য জুল বোয়ার কাছেই।

বুল ব্রিটানিতে এসেছে বেলুড় সম্বন্ধে স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার জন্য। বুলকে সমস্ত ভার অর্পণ করলেন স্বামীজী। রিপোর্ট সংগ্রহ থেকে চাঁদা আদায় ও নতুন নতুন পরিকল্পনা ইত্যাদি সবকিছু বুল করবে। কারণ স্বামিজী নানা ভাবনা চিন্তায় বেশ কিছুটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া মাস-কয়েক পূর্বে একটা চিঠিতে বুলকে লিখেছিলেন স্বামিজী, "তুমি নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে ভারতে, যাবে না? দিশারী হিসাবে তোমার'পর আমার নিজের চেয়েও ভরসা বেশী।······তোমার মধ্য দিয়েই এখন আমাকে পথ দেখাচ্ছেন মা। আমি যে তার অবোধ ছেলে। আমায় যা-ই করতে হ'ক না কেন, আমার সবশক্তি যে তোমায় দিয়ে দিয়েছি, এটা স্পষ্ট অনুভব করি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে কোনও কিছু বলা আর আমার আসবে না। তাতে আমি খুশী। এখন চাই ছুটি। আমি যে ক্লান্ত তা নয়। কিন্তু এবারে আর কথা নয়,—একটু ছোঁয়াতেই কাজ হবে মন্ত্রের মত। শ্রীরামকৃষ্ণের মত। বলার কথার দায় তোমার। আর ছেলেদের ভার দিয়েছি মার্গটকে। ওসবের সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নাই। আমি খুশী। ছুটি নিলাম স্বেচ্ছায়। কেবল এখান থেকে সরিয়ে ভারতে নাও আমাকে, নেবে না কি? মা তোমাকে দিয়ে নেওয়াবেনই জানি।"

প্যারিসে স্বামিজী থাকতেন ম্যাকলয়েডের কাছে। ওখানে থাকতেই ফ্রেঞ্চ শিখেছিলেন তিনি।

মিসেস লেগেটের বাড়িতে বসে গান বাজনার আসর। সন্ধ্যার আসরে স্বামিজী যোগ দেন। শোনেন গান। সে যুগের বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী শিল্পী এমা কাল্ভে।

তার গান মুগ্ধ করে স্বামিজীকে। এমাকে দেখেছেন তিনি আমেরিকার বক্তৃতা সভাতে। এমা কাল্ভের শিল্প সত্তার প্রতি স্বামিজীর একটা অনুরাগ আছে। একদিন তাই বললেন, "সবচেয়ে আনন্দ পাও তুমি যে ভূমিকাটিতে, একবার সে ভূমিকায় তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে এমা। বলো তো সে ভূমিকাটি কি?"

এমা অপলক তাকিয়ে থাকে স্বামিজীর পানে। বললে এমা, "আমি যখন কার্মেন সাজি, তখন মনে হয় ঘর-ছাড়া বাঁধন-ছেঁড়া যাযাবর তরুণী হয়ে যাই। তাই বলে মনে করবেন না স্বামিজী প্রতি সন্ধ্যায় নাচ গানের আসরে আমি অমনটি হয়ে যাই।"

স্বামিজী বললেন,—বেশ তো। "আমি গিয়ে শুনব।"

কিন্তু নিবেদিতা বাধা দিয়ে বললে, "না, থিয়েটারে আপনার যাওয়া চলবে না। ওখানে গেলে দারুণ সমালোচনার মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে।"

একটা উদাস দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেন নিবেদিতাকে।

সে কথা শুনেও যেন শুনলেন না স্বামিজী। একদিন গিয়ে হাজির হলেন মিঃ লেগেটের সঙ্গে নাট্য মঞ্চে।

নাটক শেষ হয়ে গেলনা। এই মাত্র বিরতি হলো। স্বামিজী ঢুকলেন গিয়ে শিল্পীদের ঘরে। স্বামিজীকে দেখে রহস্য মদির নয়নে তাকাতে লাগল একদল কোরাস গায়িকা। বলাবলি করতে লাগল, "কে এ সৌম্যদর্শন পুরুষ। আমাদের এমার সম্বন্ধে এত উৎসুক্য কেন ওঁর?"

এমা এগিয়ে এলো। জানাল অভ্যর্থনা। কিন্তু একটু বুঝি বিব্রতই বোধ করল এমা। বললেন স্বামিজী, "এমা, দেখতে এসেছিলাম তোমার কার্মেন। সেও সত্য। সেও কিছু মিথ্যা বলে না। তাকে খারাপ ভেব না।······তার উদ্দামতায় আত্ম-স্বরূপকেই অনাবৃত করে সে। যে মহীয়সী নারীরা প্রার্থনার শেষে ম্যাডোনাকে বলেন, 'মাগো, আমার কথায় কান দিও না তুমি, আমি যে কামনার আগুনে পুড়ে মরতে চাই মা', তাদেরই জাত সে।"

পরের দিন আবার এলো এমা, এলো লেগেটের বাড়ীতে। বসল আসর। গান হলো। বললেন স্বামিজী এমাকে, "যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে তুললে অনুষ্ঠানের শেষে, আমায় সেই গানটি শোনাবে এমা? ও গানটি আমি শিখতে চাই।"

বললে এমা, "লা মার্সেইল্যাজ? কিন্তু সে যে সমর সঙ্গীত, স্বামিজী। কামান উঠেছে গর্জন করে। ছাড়ছে সৈন্যেরা হুঙ্কার।"

আগ্রহে ব্যাকুল স্বামিজী বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ; এমা ঐ গানটি! ও গানে তোমার অন্তরে জ্বলে নির্ভয়ের আগুন। দেশকে ভালোবেসে তার জন্য প্রাণ বিসর্জন

দেখায় প্রেরণা পাও তোমরা, তাই না? কল্পনার চোখে দেখতে পাও, কিছু না ভেবেই নাগরিকরা কোন্ অদৃশ্য শক্তির আহ্বানে মাথা তুলে দাঁড়াল। আমার ছেলেদের এ গান শেখাব আমি।"

বিদ্রোহীর আত্মায় যেন আগুন ধরে গেল কথা বলতে বলতে। পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালার দহন থেকে এ গান এনে দেবে মুক্তির মাতাল নেশা। শৃংখল ছেঁড়ার পণে দৃঢ়বদ্ধ করবে চিত্ত। দেশ জেগে উঠবে এক সুরে। কুজ্ঝটিকা মূর্ছিত হয়ে পড়বে আলোক সম্পাতে। গাও এমা সেই গান শোনাও আমাকে। আমিও গান শিখব।

স্বামিজীর কার্যকলাপে নিবেদিতার চোখে নামে বিদিশার অন্ধকার। কি আশ্চর্য! এ আবার কেমন ধরণ তাঁর! আজকাল দেখা সাক্ষাৎও কমই হয়। মনের আনন্দে কত প্রশ্নের শরবর্ষণ হয় নিবেদিতার।

স্বামিজী সব বুঝতে পারলেন। বললেন নিবেদিতাকে, "মার্গট। আমি এখন স্বাধীন, স্বাধীন!……জন্ম সূত্রে এ স্বাধীনতা আমি অর্জন করেছি। এখন যা করছি তা ভার মুক্ত হয়েই করছি। যেন শিশু বনে গেছি আমি।"

চাপা একটা অভিমান নিবেদিতার অন্তরকে বেদনায় অভিভূত করে ফেলল।

ঠিক এমনি দিনে স্বামিজীর কয়েকজন বন্ধু তাঁকে নিয়ে মিশর যাবে ঠিক করল। সেখান থেকে ফিরবেন ভারতের পথে। নিবেদিতা, এমা আর ম্যাকলয়েডও থাকবে। থাকবে আরও একটি দল—তারা হলো প্যারিসের গুপ্তবিদ্যা সম্প্রদায়। কথাটা নিবেদিতার কানে যেতেই হয়ে উঠল বিদ্রোহী। বলল এসে স্বামিজীকে, "না, এমন পাঁচমিশেলী দলে থাকলে আপনার দুর্নাম হয়ে যাবে।"

স্বামিজী এক দীর্ঘ জবাবে নিবেদিতাকে নীরব করে দিলেন। "ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। কি হয়েছে তাতে? তোমাদের মধ্যযুগীয় গির্জার তোরণের পানে নজর করে দেখনি কখনও? আগে আগে চলেছেন মহামানব, পরমপিতার ইচ্ছার কাছে আপনাকে তিনি সঁপে দিয়েছেন। তাঁর ঠিক পিছনে দেখবে সবসময় একটা শয়তান লেগে আছে।…পায়ের তলায় যে ফুল ফুটেছে তাদের কুড়িয়ে নিতে শেখ।

ভাল চোখে দেখ সব কিছুকেই। কাদার ছিটে যদি গায়ে লাগে—তবুও। অখণ্ড-মণ্ডলাকারে জগৎ ব্যাপ্ত করে রয়েছেন তিনিই। কোন কিছুর ভাল মন্দ বিচার করা কি আমাদের কাজ? অনেকদিন আগে হিমালয়ে মায়ের একটা মন্দির দেখেছিলাম -ভাঙাচোরা। মুসলমানেরা করেছে ধ্বংস। অহঙ্কার নিয়ে ভাবলাম—সে সময়

যদি আমি থাকতাম মা, তোমায় রক্ষা করতাম, এর চেয়েও বড় মন্দির তৈরী করে দিতাম তোমায়।

কিন্তু আমার এ ভাবনায় বাধা দিলেন মা। শুনতে পেলুম মা বলছেন,—এই ভাঙা মন্দিরে থাকা আমার খুশি তা জানিস? নইলে এখানে কি সাততলা সোনার মন্দির গড়তে আমি পারতাম না? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি?"

বললেন আরও, "যেমন তুমি জেদী, তেমনটি ঠিক আমিও ছিলাম। তোমার চাল চলনে এখনও রয়েছে আত্ম স্বাতন্ত্র্যের ছাপ। ওটুকুন সঁপে দাও মায়ের কাছে।

কি ভালো, কি মন্দ তা বেছে নেবার অভিমান এখনও তোমার রয়েছে। সুযোগ পেলেই নির্জনে নিঃসঙ্গ হয়ে থাক। ভেদবুদ্ধি যাতে ছাড়তে পার, নিজের অন্তরে সেই শক্তিটি অর্জন করবার চেষ্টা কর। কেমন করে তা করবে আমি জানি না। ডুবে যাও অন্তরের গভীরে। ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেল সংস্কারের সকল ছাঁচ। তবেই আলোর নির্ঝর ছুটবে কুল অতিক্রম করে। তখনই সব আয়োজন পূর্ণ হবে তোমার। যে পাঁকের ছোঁওয়ায় আজ তোমার হাতে দাগ লাগে, তখন তাই দিয়ে গড়বে প্রতিমা, তাতে সঞ্চার করবে মুক্ত প্রাণের আনন্দ। বস্তুকে দাম দিও না। তুমি শুধু অবিশ্রাম সৃষ্টি করে চল।"

নিবেদিতার অন্তর শুধু বলে, "সৃষ্টি······শুধু অবিশ্রাম সৃষ্টি করে চল।"

গুরুকে ঘিরে বিচিত্র জনতার মিছিল। তার মধ্যে কোথায় যে মানুষটা হারিয়ে গেলেন তা নিবেদিতা বুঝতে পারে না। কিন্তু এ অভিযাত্রা কেন? কেনই বা নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন বল্গাহীনভাবে? বেদন-বিদ্ধ হৃদয় নিবেদিতার। মরুর দহনে অন্তর পুড়ে ছাই হয়ে যেতে চায়। এ কি হলো! একটা বিরাট গোলক ধাঁধাঁর পাড়ে এসে পড়লেম না কি! কেমন যেন বিভ্রম লাগে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আর ভাবতে পারে না নিবেদিতা।

একটা চিঠি লিখতে বসল নিবেদিতা মিস ম্যাকলয়েডকে। তবুও লিখে কিছু শান্তি পাওয়া যায়। ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট অভিমান, এবং ছোট ছোট বিরহের শান্ত-তরঙ্গ মনের দেয়ালে প্রতিহত হ'য়ে কি যেন করে যায়। তার ভাষা বড় মধুর। বড় অন্তর স্পর্শী।

নিবেদিতা লিখল, "যে আঘাতে স্বামিজী আমাকে ছিটকে দিয়েছেন, তা আমার পাওনা বটে।······এক রকম ভালোই হয়েছে। তিনি স্বপ্ন দেখছেন ভাবী যুগের

হিন্দু নারীর। তাঁদের জন্য আর তাঁর জন্যই আমাকে থাকতে হবে বেঁচে। এ ছাড়া আর কোনও অবলম্বন আমার নেই কিছু। এ কথা আজকে যেমন সত্য হয়ে উঠেছে, এর আগে ঠিক এমনি আর কখনও হয়নি। খুব বিস্ময় লাগছে, না? অথচ তাঁর কাছে কোনও চিঠি বা খবর পাঠাতে হলে কিংবা তাঁর সঙ্গে ব্যাবহারিক সম্পর্ক রাখতে হলে তাঁকে এক রকম 'গত জীবন' বলেই ধরে নিতে হবে আজ। এ ছাড়া অন্য কোনও ভাব মনে আসছে না।"

নিবেদিতার অনিন্দ্য অঙ্গে যেন জ্বলছে দাহের অনল। নিয়ত অন্তরে আবর্তিত হচ্ছে, এক স্বর, এক কান্না, এক প্রার্থনা, কি সে প্রার্থনাটি?

ঘুচিয়ে দাও আমার অন্তরের অনন্ত পিপাসা। তৃষা-মূর্ছা মধ্যাহ্ন মরুতে ঢালো অঝোর সুধা ধারা। আমাকে বাঁচতে দাও। শান্তিতে পথ চলতে দাও। কর্মের জলধিগর্ভে ডুবিয়ে দাও দম্ভ। অহংকার ও কামনার কারু-মনকে। নিরাসক্ত হয়ে পথে হাঁটবার সামর্থ দিতে পারো না তুমি?

উপেক্ষা আর অবহেলা এই দিয়ে শুধু আঘাত করতে শিখেছ। শেখনি কি, কাছে টেনে নিয়ে প্রশান্ত স্পর্শে সব আবিল-দহন নির্বাপিত করে দিতে? এবারে তাই করো।

ধীরে ধীরে এক আকাশ নির্বাক স্তব্ধতা নিবেদিতার অন্তরকে অভিভূত করে ফেলে। হৃদয়ের গভীরে তখন ধ্বনিত হয়ে ওঠে গুরুর আদেশ—"জীবন্ত সৃষ্টির তপস্যা করে যাবে তুমি।"

বারে বারে ঐ একটা কথাই প্রাণকে অপানে নিয়ে যেতে চায়। তন্ময় হয়ে যায় নিবেদিতা। অনেকটা সময় কেটে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের প্রাচীর ভেঙে বাইরে এলো। বড় ক্লান্ত! বড় শ্রান্ত! দৃষ্টির দিগন্তে শুধু নীলের অনন্ত। মিসেস্ বুলকে একটা পত্র লিখতে বসল। কলম ধরে ক্লান্ত অবসন্ন নিবেদিতা লিখল, "মানুষের সবচেয়ে বড় আকাঙ্খা হল জ্ঞান লাভ করা। জানতে চাই—বৃহৎ কেউ আছেন। শক্তিহীন আর আশাহীন হলেও ভালবাসতে যে চাই কাউকে, সে বিষয়ে আমরা সচেতন। এমন কারও সন্ধান চাই যিনি সব দুর্বলতার উপরে। তিনি সত্য স্বরূপ। তাঁর খবর জানি না, এ খুবই ঠিক কথা। স্বামিজী অলৌকিক উপায়ে সে জ্ঞান যদি আমাতে সঞ্চারিত না করেন তা হলে নিজে থেকে তার নাগাল পাব এমন আশাও রাখি না। এখন এখানে এসে ঠেকেছি। শুধু বাইরের দুনিয়া আর তিনি, আর সব কিছু তিক্ত চিত্তে সয়ে যাওয়া। যা চাই তা কি দেবেন তিনি? দেবেন কি? হায়রে······আজ চুপি চুপি বলি তোমায়, দিতে উনি পারবেন না। এর

আগে ওঁকে চেষ্টা করতে দেখেছি আমি। পারলে এর মাঝেই উনি আমায় দিতেন। সত্যকে লাভ করেছেন তিনি, দেওয়ার শক্তিও রাখেন। কিন্তু আমার নিজেরও কিছু করবার আছে। অথচ সে সাধ্য আমার নাই। সত্যি নাই। এমন চাওয়া কি জেগেছে যার জন্য হেন জিনিস নাই যা ছাড়া না যায়? নিজের ভাবনা। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর বাসনা-লালসা এ কি কেউ ছাড়তে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণ আর উনি কি কি ছেড়েছেন? কি তাঁরা ছাড়েন নি তাই বল।"

নিবেদিতার এ আকুল আর্তিতে বুল অন্তরে ব্যথা পেল। দুদিন বসে ভাবল সে কি সান্ত্বনার শীতল স্পর্শে নিবেদিতার অন্তরদহন নির্বাপিত করবে। কিন্তু কি-ই বা করবার আছে। প্রাণের ছন্দে যে সুর সাধা হচ্ছে তা এখনো দৃঢ়বদ্ধ হয় নি। তাই নিবেদিতার চিত্ত বিক্ষিপ্ত। চঞ্চল।

বুল মাত্র একটি ছত্রে জবাব দিল তার পত্রের, "আমার কাছে চলে এসো ব্রিটানিতে। সমুদ্রের হাওয়া তোমার মনের ভার অপসৃত করবে।"

বুলের পত্রটা পেয়ে ঠিক যাকে বলে প্রশান্ত চিত্ত, তা নিবেদিতা হতে পারল ন। তাই এ দারুণ নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য গুরুকেই লিখে বসল এক পত্র। অনেক কথাই তাতে লিপিবদ্ধ হলো। স্বামিজীও পত্রটা পেয়েই জবাব লিখলেন, "তোমার চিঠি পেলাম এইমাত্র। আমি এখন স্বাধীন, কোনও কাজে আমার কোনও অধিকার, নেতৃত্ব বা ক্ষমতা আমি রাখি নি। রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষপদও ত্যাগ করেছি। সব বোঝা ঘাড় থেকে নেমে যাওয়ায় কী যে খুশী হয়েছি। এখন সত্যি আমি সুখী। আর আমি কারও প্রতিনিধি নই, কারও কাছে কোনও দায়ও আমার নাই। বন্ধুদের সম্বন্ধে আমার একটা দায়িত্ব বোধ ছিল, সেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। বেশ ভেবে দেখছি, আমি কারও কোনও ধার ধারি না। যদি ঋণ কোথাও থেকে থাকে, তার বদলে মরণ পণ করে আমার যা কিছু ঐশ্বর্য তা বিলিয়ে দিয়েছি। বিনিময়ে পেয়েছি কেবল শাসানি, কেবল বজ্জাতি আর আমায় জ্বালিয়ে খাওয়া। তোমার চিঠি পড়ে মনে হয়, ভেবেছ আমি তোমার নতুন বন্ধুদের ঈর্ষার চোখে দেখি। এই শেষবারের মত বলছি, আমার আর যে দোষই থাক, আমি হিংসুটে নই, লোভী নই বা কারও উপর কর্তৃত্ব করবার ইচ্ছাও রাখি না। ছোট বেলা হতেই এগুলো আমার মাঝে ছিল না।...............................যাদের সঙ্গে খুশি, বন্ধুত্ব পাতাও না কেন, তাতে আমার ঈর্ষা করার কিছুই নাই। আমার গুরুভাইরা যার সঙ্গেই মেলা মেশা করুক না কেন, আমি কখনও তাদের কিছু বলি না। কেবল একটা কথা ঠিক জানি, পশ্চিমের লোকদের একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে,

নিজেদের কাছে যা ভাল তা পরের ঘাড়েও জোর করে তারা চাপাতে চায়। মনে থাকে না যে তাদের কাছে যা ভাল, অপরের কাছে তা যে ভাল হবেই এমন নাও হতে পারে। সেই জন্তেই ভয় হয়, নতুন বন্ধুর সংস্পর্শে এসে তোমার মন যখন যেদিকে ঝুঁকবে, অন্তদেরও তুমি সেইদিকে জোর করে টানতে চাইবে। শুধু এইজন্তই মাঝে মাঝে বিশেষ ধরণের কোনও প্রভাব বিস্তার বাধা দিতে সচেষ্ট হয়ে উঠি। অন্ত কিছুই নয়।

তুমি স্বাধীন। তোমার পছন্দ অপছন্দ তোমার নিজস্ব। তোমার কাজও তাই।······শত্রু হ'ক বা মিত্র হ'ক, সকলেই মায়ের হাতের যন্ত্র মাত্র। তাদের দিয়েই মা সুখে দুঃখে আমাদের কর্ম-ক্ষয় করান। এমনি করেই মায়ের করুণা ঝরে পড়ে সবার উপরে। আমার স্নেহাশীষ নিও।

পত্রখানা হাতে ধরে নিবেদিতা স্তব্ধ হয়ে যায়। দু চোখে নামে অবাধ্য অশ্রুর ধারা। সমস্তটা মন ধিক্কারে ভরে যায়। এর চেয়ে নিবেদিতা যদি চিরটা দিনের মত ফুরিয়ে যেতে পারত—সেও ছিল অনেক ভালো। এই বিচ্ছেদ বেদনা যেমন মর্মান্তিক, তেমনি অসহ্য। প্রতিটি ঘটনার মধ্যে একটা অন্তরালের, একটা ব্যবধানের প্রাচীর যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়। ঘটিয়ে দেয় গুরুর সঙ্গে বিচ্ছেদ। সমস্ত কাজ যেন মনে হয় মিথ্যা। ক্লান্তিতে দেহ মন পড়ে অবসন্ন হয়ে। একাকী ঘুরে বেড়ায়। উদাস মনে নীরবে বসে কাটিয়ে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

চোখের জলের হিসেব কষতে গিয়ে বারে বারে চিত্তটা বিভ্রান্ত হয়ে যায়? এত দহন কি সহ্য করা যায়? মিস্ ম্যাকলয়েডকে লিখল নিবেদিতা, "আমাকে ছেড়ে গেছেন স্বামিজী। ভালই করেছেন। আমার পাওনা এই-ই ছিল। তাঁর অন্তরের মানুষটিকে গ্রহণ করবার যোগ্যতা আমার ছিল না। কিন্তু বছরের পর বছর তুমি থাকবে স্বামিজীর পাশে, আমি তা দেখতে পাচ্ছি। হয়তো কোনো দিন এসে আমি ছুঁয়ে যাব তোমার চরণ। আমিও ভালবাসব তাঁকে তোমার মতই, বিচ্ছেদ-বেদনায় আর তোমার মধ্য দিয়ে সে কথা বুঝতে শিখেছি। বড় আশ্চর্য না? আজ তাঁকে একটা চিঠিও লিখতে আমি পারছি না। আমার খবরও দিতে পারছি না। আমার অন্তর-দিগন্ত থেকে তিনি কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন। আমি শুধু প্রাণপাত করব মায়ের কাজে। এ ছাড়া আমার বেঁচে থাকবার আর কোন-অর্থ নেই।"

এদিকে স্বামিজী মিস্ ম্যাকলয়েডকে লিখলেন, "আমি নিবেদিতাকে তোমার হাতে দিলাম, জানি তুমি ওকে দেখবে।"

বুলের কাছ থেকে একটা আমন্ত্রণ এলো নিবেদিতার কাছে। বন্ধুরাও যাচ্ছে। বুল লিখল—তুমিও লণ্ডনে চলে এসো।

মনটা একরকম ঠিক করে ফেলেছিল নিবেদিতা। কিন্তু যাওয়ার কয়েকটা ঘণ্টা পূর্বে খবর এলো ম্যাকলয়েড আসছে। স্বামিজিও এলেন।

অন্তরঙ্গতার হাট বসল ব্রিটানিতে। কিন্তু স্বামিজী যেন কোন উদাস জগতে বিহার করছেন। তেমন কোনো সাড়া এলো না তাঁর তরফ থেকে। নিবেদিতার মনটা আরও যেন ভেঙে পড়ল।

সহসা কি হলো। যাবার আগের দিন ডাকলেন স্বামিজী, ডাকলেন নিবেদিতাকে। বসলেন গিয়ে বাগানে। বললেন নিবেদিতার পাণে তাকিয়ে অরুণ ঘন নয়নে, "নিবেদিতা, শক্তিধর পুরুষ কর্মী তৈরী করে দূরে সরে যান, এই নিয়ম। কর্মী পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে ওঠে। আমি এখন তোমার কেউ নয়। আমার যা শক্তি ছিল, তা সব তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। আমি এখন শুধুই সন্ন্যাসী। একশ্রেণীর মুসলমান আছে, তারা এমন ধর্মান্ধ যে শিশু জন্মাতেই তাকে বাইরে রেখে দেয়। বলে, 'ভগবান যদি তোমাকে বানিয়ে থাকেন তো মর, আর আলি যদি তোমাকে প্রাণ দিয়ে থাকেন, তো বাঁচ।' আমিও তাই বলছি, যাও, জগতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়। আমি যদি তোমায় গড়ে থাকি তো তুমি টিকবে না। আর মা যদি তোমায় গড়ে থাকেন অমর হবে।"

দুটি হাত তুলে নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করলেন স্বামিজী। তার মনের সব আবিল ধুয়ে মুছে নিলেন।

ছ বছর পরে বুলকে লিখল নিবেদিতা, "বোধ হয় তোমার মনে আছে, ব্রিটেনের সেই শেষদিনের সুন্দর সন্ধ্যায় স্বামীজী আমায় মুক্তি দিয়েছিলেন। সব কিছু আগে থেকে দেখবার মুক্তি। বলেছিলেন, 'এও তো মা।" যদি মরে যাই, তুমি যেন খোকাকে (জগদীশ বসু) নিয়ে সেই বাগানখানি দেখো, যেখানে স্বামিজী তাঁর চরম ও পরম আশীর্বাদ আমাকে দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন তাঁর ঋষি-ব্রতের উত্তরাধিকার।"

স্মৃতিরা আজও কথা কয়। নিবেদিতার অন্তরটা যেন সমুদ্র গর্জনে জেগে ওঠে। ও তাকিয়ে থাকে, তাকিয়ে থাকে অপলক। মনে পড়ে কত কথা। কত কাহিনী।

কেন, ভারতবাসী বলে সে হবে অবজ্ঞাত? হবে অবহেলিত?

না তা হয় না। হতে পারে না।

নিবেদিতা এসে দাঁড়াল বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসুর পাশে।

বুলেরও চেষ্টার বিন্দু বিরাম নেই। তাকে বসু মা বলে সম্বোধন করেছে। ছেলের প্রতিষ্ঠা তো মায়েরই আশীর্বাদের কৃপায়। লণ্ডনের সভ্য সমাজের সঙ্গে ওরা দুজনে একটা বোঝাপড়া করতে চায়। চায় বসুর প্রকৃত মর্যাদা আদায় করে নিতে। বসুর মূল্য যা-ই থাক না কেন, লণ্ডন সোসাইটির সভ্যরা তা কিছুতেই মানবে না। তারা একথা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না যে বসু একজন প্রতিষ্ঠাবান প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তারা বলে, "ওঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদকে ঠিক বিজ্ঞানের কোঠায় ফেলা যায় না। ওগুলো কতটা কল্পনা এলাকার জিনিস।"

ভারতের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারের দায়টা স্যর জর্জ বার্ডউডের 'পর ন্যস্ত। সম্প্রতি জামশেদজী টাটা এসেছেন লণ্ডনে। তিনি চান বার্ডউডের সঙ্গে একবার দেখা করতে। মিস্ বুলের প্রচেষ্টায় সে সুযোগটি করে দিল তার নিজের বাড়িতেই। নিবেদিতাও সে পার্টিতে একজন আমন্ত্রিত অতিথি। বেশ আলাপ জমিয়ে ফেলল। কিন্তু এ আলাপনের অন্তরাল রহস্যটি শুধু নিবেদিতা ও বুলই জানত। তারা বসু সম্বন্ধে একটা কিছু স্থির করতে চায়। এখান থেকে বসু একটা কিছু কর্ম না নিয়ে দেশে ফিরলে যে কি অবস্থায় গিয়ে পড়বে সে সম্বন্ধে নিবেদিতা বেশ ওয়াকিবহাল। তাই জানতে চাইল সে বার্ড সাহেবের কাছে শিক্ষাব্রতী হিসেবে সরকারের নিয়োগটা কি ধরণের হবে।

বার্ড সাহেব নিবেদিতার কথার জবাবে বললেন, "একটা পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং তা ঘোষণা-করা হবে কাগজে। তারই ফলাফল অনুসারে আড়াল থেকে প্রণয়ন করা হবে নিয়োগ পত্রের তালিকা, এইটাই ভারত সচিবের ইচ্ছা।"

কথাটা শুনে নিবেদিতার মাথাটা যেন গরম হয়ে গেল। কিন্তু কথায় তা প্রকাশ না করে বলল, "আপনার কি মনে হয় না, এ ধরণের অবৈধ কাজ করলে সমূহ একটা বিপদের সম্ভাবনা থাকতে পারে?"

জর্জ সাহেব কথাটায় একমত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, তা থাকতে পারে বটে, তবে কি জানেন—ভারতবাসীরা কখনো আমাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে না। শাক-সব্জি খায়, গোবেচারী ওরা।"

পরাধীনতার নির্মম অভিশাপে অভিশপ্ত ভারত-আত্মার অবমাননা নিবেদিতাকে পীড়া দিল। সে বিনা দ্বিধায় বলল, "কিন্তু আমি ভাবছি ভারতের বিপদের কথাই—আমাদেরই কথা নয়।"

জর্জ সাহেবের চোখ দুটো বড় হয়ে গেল। এতক্ষণে বুঝি তিনি বুঝতে পারলেন নিবেদিতার প্রশ্নের যথার্থ মর্মার্থ। তাই বললেন একসময়ে, "ওঃ, তাই নাকি? আমি কিন্তু তা ভাবিনি। কথাটা অবশ্য ভাববার মতই বটে।"

নিবেদিতা আরও সুর চড়িয়ে দিল, "একটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করছেন মিঃ টাটা। সেখানে অধ্যাপকদের পদে বিশেষ গুণী হিন্দুদের নিয়োগের কি ব্যবস্থা করবেন স্যার জর্জ?"

জর্জ সাহেব বললেন, "এ ধরণের কোনো পরিকল্পনা করলে বিজ্ঞান চর্চার গোড়াতেই মারা হবে কুড়ুল।"

নিবেদিতা বিদ্রোহিনীর মত প্রতিবাদের সুরে বলল জর্জ সাহেবকে, "স্যার জর্জ যা করতে চাইলেন না, তা করব আমি। শিক্ষিত হিন্দু সমাজের লক্ষ লক্ষ লোকের চেষ্টায় জন্ম হবে যে ভারতের তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না ইংলণ্ডের।"

সেদিন ঘরে ফিরে নিবেদিতা একটা চিঠি লিখল জগদীশ বসুকে, লিখল, "তোমরা দুজন এক্ষুনি আমায় ভারতীয়দের নামের একটি তালিকা পাঠাও—যাঁরা সত্যিকারের জ্ঞানী-গুণী, অথচ অবহেলিত ও অবজ্ঞাত হচ্ছেন বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বৈজ্ঞানিক, আইনজীবী, ডাক্তার, ভাষাতত্ত্ববিদ্—সবার নাম দিও। আমি কি করতে পারব জানি না। তবে যা সাধ্য তা থেকে নিজেকে কখনো গুটিয়ে আনব না।"

এদিকে নিবেদিতা খুবই ব্যস্ত। বসু এবং রয়াল সোসাইটির মধ্যে একটা পাকা-পাকি যোগাযোগ স্থাপন না করতে পারলে সব বানচাল হয়ে যাবে। তাছাড়া এবারে বছরের গোড়াতেই বসুর গবেষণা নিয়ে আলোচনা হবে রয়াল সোসাইটিতে। কিন্তু বসু খুব অসুস্থ। একটা অপারেশন হবে তার। কি করেই বা কাজকর্ম করবে সে। বড় ভেঙে পড়ল যেন বসু। আশার মিনারগুলো যেন কুয়াশায় অবলীন হয়ে যেতে লাগল। মিসেস বুলকে লিখল বসু, "আমার কাগজপত্র হয়ত আগামী সপ্তাহেই এসে পড়বে। তবুও আমার অস্বস্তি বোধের শেষ নেই। কারণ, কতগুলো দরকারী পরীক্ষা করছি আমি চলনসই ঘরোয়া যন্ত্রপাতির সাহায্যে। উপযুক্ত যন্ত্র পেলে তা নিখুঁত হত, ফল হত আরও ভালো। আমি যদি আমার গবেষণার কথা প্রকাশ করে দিই, অথচ নিজে কাজ না করি, তাহলে অন্যেরা

শীঘ্রই আরও ভালো কাজ দেখাবে। আমার কাজগুলি তখন নেহাত আদ্যিকালের বলে মনে হবে।"

বসু চলে এলো নার্সিং হোমে। ওখানেই হলো তার অপারেশন। শরীরটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। মমতাময়ী নিবেদিতা তার অন্তরের অজস্র স্নেহধারায় বসুর দেহের সব বেদনা, সব ক্লান্তি দূর করে দিল। অবলা বসু ও নিবেদিতা বসুর সেবায় রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতে লাগল।

মাঝে মাঝে কোথায় যেন হারিয়ে যায় নিবেদিতার মন। সমস্ত কর্মছন্দের মাঝে বেজে ওঠে একটা অসীমের সুর। নিবেদিতা তখন কি আর নিজের মধ্যে নিজে থাকে। গির্জার ঘটাধ্বনি তার অবরুদ্ধ হৃদয়-দুয়ারটা খুলে দেয়। নিবেদিতা আত্মগত হয়ে বলে, "এখনও জানি না কেমন করে অন্যের হৃদয়ের সুরে এ হৃদয়ের সুর বেঁধে নেব। কেমন করে প্রতিটি মুহূর্তে সবার সঙ্গে মিলনের ঐকতান ধ্বনিত হবে অন্তরে। কেমন করে মানুষকে পূজা করতে হয় এখনও তা শিখতে পারিনি। ওগো মধুময়ী কুমারী জননী, আলো জ্বেলে দাও সেবিকার অন্তরে।"

বসু এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে নিবেদিতা চলে এলো তার বাড়িতে। তাড়াতাড়ি বসুর সুস্থ হওয়া দরকার।

বসুর 'পর নিবেদিতা রাখে প্রহরী-চোখ। ছাত্রী হয়ে বসে তার পাশে। নতুন নতুন তত্ত্ব শিখে নেয় নিবেদিতা। জেনে নেয় ব্রাহ্ম সমাজের দর্শন।

বসুর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কুরীদম্পতির সঙ্গে চলছে তার পত্রালাপ। টমাস হাক্সলির সঙ্গেও স্থাপিত হ'ল বন্ধুত্ব।

বসু একদিন বলল নিবেদিতাকে, বলল, জীবজগতে প্রকৃত মুক্তি কি, এবং কিভাবে তা আসে।

নিবেদিতা অপলক তাকিয়ে থাকে। উৎকর্ণ হয়ে শোনে বসুর ছন্দমধুর সুরেলা কণ্ঠ, "দেখুন মহাব্যোমই সব, চরাচর মহাব্যোমের টানা-পোড়েনে বোনা। প্রাণমাত্রেই—তা সে ফুলেরই হ'ক, কীটেরই হ'ক বা আপনার আমারই হ'ক—অনন্তের দুটি মেরুবিন্দুর সেতুস্বরূপ। আমাদের পেছনে অনন্তের সিদ্ধরূপ। আর সম্মুখে তার সাধ্যরূপ। ঠিক ম্যাগনেসিয়াম আর অন্য সব ধাতুর বাঁকা রেখার মত, তাই না? তাই মানুষই পারে গভীরের অতল গহনকে ছুঁয়ে আসতে, পারে চেতনার তুঙ্গতম শিখরে কূটস্থ হতে—পথের বাধা কোথাও না মেনে। জীবনের অতীতে ভবিষ্যতে এক অভিজ্ঞতা হতে আর এক অভিজ্ঞতায় অবাধে সঞ্চরণ করুক মানুষ, চলুক এগিয়ে। স্থাণু হলে তার চলবে না। এই তো মুক্তি।"

নিবেদিতা বলে, "যেখানে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ভুল পথে পা বাড়ান অন্ধের মত, সেখানে অদ্বৈতবাদের কৃপায় বসু কিভাবে যে ভুলের হাত থেকে বেঁচে যায় সে বড় আশ্চর্য লাগে দেখতে, নিবেদিতা লেখেন, ও যেন আকাশচারী। একটার পর একটা সত্য আবিষ্কার করে চলেছে। যন্ত্রের পর যন্ত্র উদ্ভাবন করছে, দীপ্ত সহজবোধরূপ ধরছে গণিতসিদ্ধ বাস্তব। রুদ্ধশ্বাসে বিস্ময়ে দেখে যেতে হয় শুধু। ভুবনেশ্বরী তাঁর শক্তি এমন অজস্রধারে ঢেলে দিতে পারেন কেমন করে কে জানে?"

এদিকে মার্চ মাসে এক পত্র দিলেন সারদাদেবী। লিখলেন নিবেদিতাকে কলকাতায় ফিরে আসতে।

কিন্তু নিবেদিতার হাতে অনেক কাজ। পত্রিকার লেখা লিখতে হয়। বক্তৃতা দিতে হয়। তবে কিছু অর্থের ব্যবস্থা হয়। আপাততঃ ভারতে যাওয়া স্থগিত রাখতে হলো তাকে। আরও অনেক অর্থের দরকার। তাই বক্তৃতাগুলো সব সেরেই ফিরবে সে ভারত-পথে।

ধীরে হাওয়া বইছিল।

পাতায় পাতায় উঠেছিল মর্মরী।

পাখী ডাকছিল।

ডাকছিল নরওয়ের অরণ্যভূমিতে।

নিবেদিতা উৎকর্ণ। বসে আছে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে। মাঝে মাঝেই মনটা হারিয়ে যায়। হয়ে পড়ে উদাসীন। যেন নিজেকে হারিয়ে ও নিজেকেই খুঁজে ফেরে। খেয়াল খুশীর সম্রাজ্ঞী সেজে বসে মাঝে মাঝে। ভারতের কথা ভাবতে ভাবতে যায় আত্মলীন হয়ে। টাকা তার চাই। শুধু টাকা কেন? আজকাল খুব করে ভারতবর্ষের পরাধীনতাও নিবেদিতাকে উন্মাদিনী করে তোলে?

কিন্তু কেন?

নিবেদিতা মনে ভাবে, রাজার আদর্শ তাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। দিতে হবে তাঁর স্বপ্ন সাধনার একটা বাস্তব রূপ। এ না পারলে তার বেঁচে থেকে কোনই লাভ নেই। যে পুষ্প সে দেবতার অর্চনায় নিবেদন করেছে, আজ তা মানুষের সেবায় ছড়িয়ে দেবে নিবেদিতা। নরের মাঝে প্রত্যক্ষ করবে নারায়ণ। জীবের মাঝে দেখবে শিবের সার্বিক প্রকাশ। তবেই তার জীবন হবে সার্থক। হবে স্বামিজীর আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ। এ কি সে পারবে না?

জীবনের ক্ষেত্রে একদিন আঘাতের পর আঘাত এসেছে। অন্তরভরা ভালোবাসার একটা নির্মল আকাশ পানে অপলক তাকিয়ে মনের মানুষকে খুঁজেছে। কিন্তু তা কি সে পেয়েছে? ছোট ছোট তরঙ্গের মত তারা এসে আবার ফিরে গেছে। নিরাসক্ত এবং নির্লিপ্তের মত নিবেদিতা প্রচণ্ড আঘাতে মৌন হয়ে রয়েছে। গোপনে নীরবে মুছে ফেলেছে চোখের জল। মানুষকে ভালোবাসতে গিয়ে ফিরে এসেছে প্রত্যাখ্যানের বেদনা নিয়ে। হায়রে জীবন! নিজের 'পর অরুচি এসেছে। মৃত্যুর সঙ্গে মিতালি করবার জন্য মনটা কতবার আকুল হয়ে উঠেছে।

সব কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই ফেলে-আসা দিনের ক্লান্ত করুণ কাহিনীর ইতিবৃত্ত।

তারপর?

ভারতীয় যোগী স্বামিজীর দর্শনলাভ। এবং প্রথম দর্শনেই তার অন্তর স্পর্শন ঘটেছিল। নিবেদিতা এগিয়ে গেল। তাঁকে যাচাই করে নিল। প্রাণের সবটুকু ঠাঁই তাঁরই জন্য সে অকাতরে অকুণ্ঠ চিত্তে ছেড়ে দিয়ে দায়মুক্ত হলো। নিজের ভার বইতে আর যেন পারছিল না নিবেদিতা। স্বামিজী তাকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু দুটি অন্তর এক হলেও দুটি মানুষের মধ্যে রইল একটা সীমা-চিহ্ন। কিন্তু প্রবৃত্তির শর-নিক্ষেপে নিবেদিতা যখনই ব্যাকুল হয়ে উঠত, তখন শুনতে পেত স্বামিজীর কণ্ঠে—তা হয় না, আমি সন্ন্যাসী।

প্রচণ্ড একটা আঘাত লাগত নিবেদিতার অন্তরে। মন্থর হয়ে আসত তার চিন্তার চলোর্মি। ছিটকে পড়ত গিয়ে কোন এক অচিন দেশে। অন্তরটা দীর্ণ হাহাকারে ভরে যেত। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত নিবেদিতার পাঁজর ভেঙ্গে। চোখে আসত অবাধ্য অশ্রুর প্লাবন। বলত তখন নিবেদিতা—শূন্য মন্দির মোর!

কত কথাই না আজ নিবেদিতার মনে পড়ছে। এই সবুজের অরণ্যে এসে ওর সবুজ দিনগুলোর কাহিনীর অধ্যায়গুলোর সমাপ্তিহীন পরিচ্ছেদের পাতাগুলো খুলে যেতে লাগল।

অভিভূতের মত বসে থাকে নিবেদিতা। আর একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস অন্তরকে মন্থন করে। নিবেদিতা আদি অধ্যায় থেকে ফিরে আসে তার চলতি জীবনে।

সব চিন্তাগুলোকে এক এক করে বিদায় করে দেয় নিবেদিতা। মগ্ন হয়ে পড়ে ভারতবর্ষের ভাবনায়। শুধু আধ্যাত্মিক মুক্তি নয়—ভারতের পরাধীনতার দুঃখময় কাহিনীও নিবেদিতাকে ভাবিয়ে তোলে। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার আত্মা। নিবেদিতা রওনা হয়ে এলো ভারতের পথে। যাত্রার প্রাক্কালে মনে করেছিল নিবেদিতা প্রথমেই গিয়ে দেখা করবে শ্রীমার সঙ্গে। কিন্তু খবর পেল সে, গুরুজী ভীষণ অসুস্থ। নিবেদিতার চলিষ্ণু মনটা সহসা যেন থেমে যেতে চাইল। রুদ্ধ হয়ে এলো বদ্ধ-বদ্ধ শ্বাস। নিবেদিতা উন্মনার মত এসে ঢুকল বেলুড় মঠে।

১৯০১ সাল।

নভেম্বর মাস।

একটা বাণবিদ্ধ পাখীর মত তাকাতে থাকে নিবেদিতা। কই! কোথায়! চোখ দুটো বারে বারে কাকে যেন খুঁজল একবার। কান্নায় সমস্তটা মন ভরে গেল। স্বামিজী এসে দাঁড়াননি নিবেদিতাকে অভিনন্দন জানাতে। দু-একজন সাধু দাঁড়িয়ে

ছিল বারান্দায়। নিবেদিতা তাদের পানে যেন তাকাতে পারে না। সহসা অশ্রুসজল নয়নে ওদের পানে তাকিয়ে আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, "কেমন আছেন স্বামিজী? তাঁর কাছে আমায় নিয়ে চলুন।"

নিবেদিতা ঢুকল স্বামিজীর ঘরে। রণশ্রান্ত যোগী এলিয়ে দিয়েছেন দেহ। চির বিশ্রামের প্রত্যাশায় দিন গুণছেন শুয়ে শুয়ে। নিবেদিতাকে দেখেই আনন্দ-বিহ্বল হয়ে আহ্বান করলেন স্বামিজী। বসালেন তাঁরই বিছানার পার্শ্বে।

রোগশয্যায় শুয়েও স্বামিজীর বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নেই। 'ভারতীয় জাতীয় মহাসভার' অধিবেশন আসন্ন। সমস্ত দেশ-নেতারা এসেছেন কলকাতায়। তাঁরা আসেন স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে। নিবেদিতার আলাপ জমে তাঁদের সঙ্গে। গান্ধীজির সঙ্গেও আলাপ হলো নিবেদিতার।

কলকাতা জমজমাট হয়ে উঠেছে। নেতারা আসেন স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে। আলাপ করেন। কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বলে যান তাঁরা স্বামিজীকে "দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী।" স্বামিজী কথা বলতে বলতে একসময় জিজ্ঞেস করেন নেতাদের কাছে, "কিন্তু বলতে পার জনসাধারণের স্থান কোথায়?"

শুধু কি তাই? স্বামিজী তাঁদের কাছে তুলে ধরেন একটা স্থির নির্দিষ্ট পথ, "ধর্মকে আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি সাধন কর। এটাই হলো মুল আন্দোলনের উদ্দেশ্য। টাকা খরচ কর জনশিক্ষায়।"

মানুষ তৈরী কর। দূর কর তাদের অজ্ঞানতা। সংস্কারের বন্ধন থেকে দাও তাদের মুক্তি। হৃদয়ের প্রসারতা বৃদ্ধি কর। দেশ আপনি গড়ে উঠবে। আসবে তাদের অন্তরে জাগরণের সাড়া। তারা জাগবে। ঘুচে যাবে দেশের পরাধীনতা। মুক্ত হবে স্বদেশ। শৃঙ্খল থেকে উন্মুক্ত হবেন দেশজননী।

মন্ত্রমুগ্ধের মত কথাগুলি শুনতে থাকেন সকলে। প্রতিটি বিকেলে এসে জমায়েৎ হন নেতারা স্বামিজীর কাছে। রোগশয্যায় শুয়ে 'সাইক্লোনিক হিন্দু' তুলে ধরেন আগামী ভারতের প্রতিচ্ছবি। ওঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে স্বামিজীর কথাগুলো হৃদয়গত করে নেয়। শুনতে থাকে স্বামিজীর অমৃতমধুর বাণী, "গোঁড়া হিন্দুরা প্রাচীন ঋষিদের দোহাই দিয়ে কেবল তাঁদের প্রবর্তিত আচার-বিচারগুলিই মানে। অথচ মানুষের মাঝে, ভাইয়ের মাঝে দেখতে চায় না নারায়ণকে। এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর কিছু আছে কি?"

স্বামিজী কথা বলতে বলতে হয়ে পড়েন ক্লান্ত। নিবেদিতা এসে দাঁড়ায় পেছনে। স্বামিজীর মুখের কথার রেস টেনে নিজেই বলতে আরম্ভ করে। কথাবার্তা চালিয়ে

যায় সমানভাবে। আগন্তুকদের বাড়িতেও নিবেদিতার অবাধ গতিবিধি ক্রমেই ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে।

এদিকে জাপান থেকে ফিরে এসেছে মিস ম্যাকলয়েড। সঙ্গে এসেছেন দুই জাপানী বন্ধু। ওডা ও কাকুসো ওকাকুরা। প্রত্নমন্দির সংস্কার সমিতির প্রধান হলেন ওকাকুরা। আর ওডা হচ্ছেন বৌদ্ধ ভিক্ষু। এসেছেন স্বামিজীকে আমন্ত্রণ জানাতে।

কিসের আমন্ত্রণ?

জাপানে হবে এক ধর্মমহাসভা। স্বামিজী যদি সেখানে না যান তবে ওঁরা মনে দারুণ ব্যথা পাবেন।

কিন্তু স্বামিজী যে অসুস্থ। কি করেই বা যাবেন অতটা দূর দেশে? অবশ্য এ ভাবনাগুলো স্বামিজীর মনকে একবারটির জন্যও দুর্বল করল না। তিনি যেন আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

এমনি একটা দিনের প্রতীক্ষায়ই তিনি দিন গুণছিলেন। যাবেন তিনি, যাবেন বোধিদ্রুমমূলে। নিবেদন করবেন সেখানে অন্তরের অকুণ্ঠ প্রণতি। করুণাবতার বুদ্ধের পদতীর্থে জীবনের সবকিছু ঢেলে প্রার্থনা করবেন তাঁর আশীর্বাদ।

স্বামিজী হলেন সম্মত। ক্ষয়ে-যাওয়া দেহটা নিয়ে স্বামিজী দেশভ্রমণে নেমে পড়লেন। সঙ্গে চললেন ওঁরাও। কিন্তু তীর্থভ্রমণ শেষ হয়ে এলো। দেহটা বড় অসুস্থ হয়ে পড়ল। ফিরে আসতে হল স্বামিজীকে। ফিরে আসতে হল ভগ্নদেহ নিয়ে।

শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। শরীর শীর্ণ, ক্লান্ত। চোখের কোলে অশ্রুর স্পর্শ। রক্ত লাল। এ অবস্থায় কি করা যাবে? পাহাড়ের হাওয়া যদি একটু সুস্থ করতে পারে ওঁকে। নিবেদিতা কয়েকজন সাধুকে নিয়ে চলে এলেন মায়াবতীতে।

কিন্তু কি হবে তাতে? মা ডাকছেন তার সন্তানকে। বলছেন—ওরে আয়, আয়, ফিরে আয়। দেহ-ক্লান্তি থেকে ফিরে আয় বাছা আমার প্রশান্ত অঙ্কে।

সে আহ্বান এসে পৌঁছে গেছে রণশ্রান্ত কবির কর্ণে। দিন গুণছেন তাই। নিঃশেষ করছেন আয়ুর ঋণ। মায়াবতীতে এসে আরও বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন স্বামিজী।

নিবেদিতা অপলক চোখে দেখা দেখে। লেখা লেখে, "উনি বড্ড অসুস্থ। যেমন করেই হোক, ওঁকে আরাম দেওয়া ছাড়া এখন আমার অন্য কোন কাজ নেই। এ সময় সত্য-মিথ্যার চুলচেরা বিচার, কিংবা যুক্তির গরমিল কোনটা নিয়েই মাথা ঘামান চলে না।"

'প্রবুদ্ধ ভারতের' জন্য একদিন নিবেদিতা প্রাণপণ করে খেটেছে। কিন্তু আজ আর সে দিকেও তার মন নেই। ও কাজটা ছেড়েই দিয়েছে সে। তাছাড়া স্বামী স্বরূপানন্দের গণ্ডী-বাঁধা কর্ম-সীমার মধ্যে নিবেদিতার মুক্ত মনটা যেন কাজ করে তেমন তৃপ্তি পাচ্ছিল না।

বাইরের সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে নিবেদিতা এবারে আত্মার মধ্যে ডুবে গেল। ফুটে উঠল একটি শতদলের মত। পরিতৃপ্তির পয়োধারায় তার অন্তর স্নাত। স্নিগ্ধ মাধুর্যে মনটা ভরপুর। নিবেদিতা লিখল, "এখন আমি মাত্র একটি যন্ত্র। এমনি একটা স্থিত নিবেদনের ভাবকে মনে আবদ্ধ করবার জন্য চারটা বছর করেছি অক্লান্ত পরিশ্রম। আমার অধ্যাত্ম শিক্ষার পাঠ সুরু হল সেদিন—যেদিন বেলুড় মঠের নতুন নামকরণ হল।......একথা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি, স্বামিজী এমন একজনের প্রত্যাশায় ছিলেন যার মাঝে নিজের অন্তরের সব শক্তি সব ভাবনার অধিকার দিয়ে যেতে পারেন। আহা! আমার স্বভাব যেন কখনো পাষাণ না হয়। তাঁর দেয়া শক্তির এক কণাও যেন আমাকে ফিরিয়ে দিতে হয় না।......আমায় জগতের কাজে পাঠালেন স্বামিজী। তারপরে নেমে এলো এক অন্ধকার মলিন রাত্রি। চতুর্দিকে তমসার গুণ্ঠন। আমার অন্তরাত্মাও দুটো বছর তমসাবৃত হয়েই ছিল। গুরুর কৃপায় সে আঁধার সায়র থেকে আজ আলোর তীর্থে এসে পৌছতে পেরেছি। এখন আত্মসচেতনতা অচঞ্চল। আমার কাছে জীবনের অর্থ হল স্বাতন্ত্র্য। তা যদি না পাই, মৃত্যু ঢের ভালো।......যদি মূঢ় আতঙ্কে শ্বাসরোধ হয়ে যায়, যা শ্রেষ্ঠ বা মহত্তম নয় তাকে বেছে নিতে অন্তর প্ররোচিত করে আমায়, আমি শরণ নেব শিব সুন্দরের। জানি, অন্যায়ের পায়ে মাথা নত করবার আগেই তিনি আমাকে মৃত্যুর দেশে টেনে নিবেন।"

ফিরে এলেন স্বামিজী বেলুড়ে। দিন শেষ হয়ে এসেছে। সবাই এ সত্যটা বুঝতে পারল। সবাই এখন থাকে স্বামিজীর কাছে কাছে।

যেতে যেতেও কি চিন্তার বা কর্মের বিরাম আছে? শেষ দিনটি পর্যন্ত বুঝি কাজ করে যাবেন স্বামিজী।

'আপনি আচরি ধর্ম
জীবেরে শিখায়।'

ধ্যানে বসেন রাত তিনটে বাজবার আগেই। স্বামিজী আসন ছেড়ে না উঠতে কেউ উঠে না। প্রতিটি কাজের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য করেন তীব্রভাবে সবাইকে কটাক্ষ। এক চুল এদিক-সেদিক হলে আর রক্ষা থাকে না কারো।

ভৎর্সনা থেকে রেহাই পায়না কেউ। বিকেলে গঙ্গার ধারে যান বেড়াতে। তদারক করেন তার প্রিয় হরিণ, সারস, ছাগল ও কুকুরটার। এমনি ধারা চলছিল দিনগুলো।

নিবেদিতা সবকিছুই বেশ ভালো করে দেখেন। তার মনের ক্রান্তিবৃত্তে ছায়ার মন সঞ্চারিত হয় স্বামিজীর অতীত দিনের কর্ম ও কাহিনী। মনে পড়ে কত কথা। বলতেন স্বামিজী নিবেদিতার কাছে তাঁর সাধন জীবনের কত কাহিনী।

রোগজীর্ণ দেহ। তবু মন নিয়মের দাস। দীর্ঘ সময় কেটে যায় ধ্যানমগ্নতার মধ্যে। সন্ন্যাসীরা ঘিরে বসে। নিবেদিতাও তাদের মধ্যে মুদিত নয়নে সময় অতিক্রম করে চলে। একটা অনুভব, অনুভূতির তীব্র বাসনায় মন মগ্ন হয়ে পড়ে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যাবার আগে যে ভাবটা স্বামিজীকে মন্ময় করে তুলেছিল, নিবেদিতা যেন ঠিক তেমনি একটি শান্তির অঙ্কে মাথা রাখতে চায়। গুরুর সে উপলব্ধির কাহিনীটি নিবেদিতা আজও বিস্মৃত হতে পারেনি—স্বামিজীর কথা, "তারপর সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করতে বসে দেহবোধ হারিয়ে ফেলতাম। দেখছি, সব শূন্য ·····একেবারে ফাঁকা······চন্দ্র সূর্য দেশকাল মহাব্যোম সবই যেন এক হয়ে গেল, তারপর কোন্ সুদূরে মিলিয়ে গেল। কিন্তু অস্মিতার একটা সূক্ষ্ম রেশ অনুভবে জেগেছিল, যার সূত্র ধরে আবার এই জাগুতিক জগতে ফিরে এলাম। পাশে বসে ঠাকুর তখন আমায় বোঝাতেন, "যদি দিন রাত এমনি থাকিস। মায়ের কাজ হবে না যে। যেদিন তোর কাজ শেষ হবে সেদিন আবার এ-অবস্থা ফিরে পাবিরে নরেন।"

নিবেদিতা সেই অতীত দিনগুলোর সঙ্গে আজকের দিনটির যেন একটা মিল খুঁজে পায়। বুকের মধ্যে তোলপাড় হয়ে যায় তার। দু' চোখ ফেটে জলের ধারা নামে। তবে কি, তবে কি শেষ যাত্রার আয়োজনে রাজা তন্ময়। সেই ব্রহ্মানুভূতির আনন্দে মগ্ন।

ভাবতে পারে না নিবেদিতা। তার চেতনায় মুঠা মুঠা কুয়াশা কে যেন ছড়িয়ে দেয়। অন্ধকার হয়ে আসে এত বড় পৃথিবীটা। পায়ের নীচে থেকে সমস্ত মাটি সরে যায়। হাহাকার করে ওঠে নিবেদিতা। চমকে তাকায়। বিভ্রান্তের মত বসে থাকে।

সেদিন কয়েকজন সাধুকে নিয়ে স্বামিজী এসেছিলেন বাগবাজারে নিবেদিতার নতুন স্কুলবাড়ি দেখতে। গুরুজীকে অন্তরের অভ্যর্থনায় বরণ করল নিবেদিতা। বসতে দিল একখানা মৃগচর্ম। এ আসনটিতেতে বসেই ধ্যান করতেন স্বামিজী। কয়েকটা দিন আগে তাও দিয়ে দিয়েছেন নিবেদিতাকে।

আসনে বসে স্বামিজী কয়েকবার তাকালেন বাড়িটার পানে। বললেন

একসময়ে, "বেশ হয়েছে বাড়িটা। ভালই লাগল। তোমার কাজের উপযুক্তই হয়েছে। শিশুর মাঝে যে ভগবান আছেন, ভুলনা তার অর্চনা করতে কখনো। নিবেদিতা, ক্ষুদ্র কীটের মাঝেও লুকিয়ে থাকেন ব্রহ্ম বস্তু।"

ক্ষণ বিরতি। বললেন স্বামিজী, বললেন নিবেদিতাকে, "কাল সকালে একবার বেলুড়ে এসো। আমার ইচ্ছা তোমার কাজের ধারাটা একবার সাধুদের বুঝিয়ে বলব।"

নিবেদিতা বলল, "স্বামিজী, বিত্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটনের দিনে আপনি এসে আশীর্বাদ করে যাবেন।"

স্বামিজী বললেন, "নিবেদিতা, সব সময়েই আমার আশীর্বাদ তোমার শিরে বর্ষিত হচ্ছে।"

বেলুড়ে ফিরে এলেন স্বামিজী বাগবাজার থেকে।

চোখে ঘুম নেই।

নেই বিন্দু তন্দ্রা।

গুরুজীর কথাগুলো মালার মত কে যেন সাজিয়ে ধরেছে চোখের সামনে। নিবেদিতা অপলক। দেখছে তন্ময়তার মাঝে তিতিক্ষুর মত।

শুধু কি তাই?

শবরীর প্রতীক্ষা!

ওরে রাত, এখনো তোর অলস মায়ার মাদকতা কাটল না। যা, চলে যা। প্রভাতের অরুণস্পর্শে দিনের দুয়ার খুলে যাক। আমি যাবো। যাবো সেই মহা-সমুদ্রের তীর-তীর্থে—স্বামিজীর কাছে। ও বলেছে—কালকে এসো।

আবার দেখব। দেখব আমার রাজাকে। আমার গুরুজীকে, প্রিয়জীকে। ওকে দেখার সাধ মেটে না। যত দেখি তত মাতি। আরও যেন এগিয়ে যাই কাছে। হয়ে পড়ি লগ্নচিত্ত।

রাত ভোর হলো।

পাখী ডাকল আকাশে।

দিগন্তে পড়েছে আলোর আলিম্পন। রক্তিম হয়েছে পূর্ব প্রান্ত।

নিবেদিতা তাড়াতাড়ি কাজগুলো সেরে নিল। চলল বেলুড়ে।

রোদ এখনো উঠেনি।

পথে নেমেছে দু' একজন কর্মব্যস্ত মানুষ। নিবেদিতা এসে পৌছল বেলুড় মঠে।

আজ অনেক পরিবর্তন হয়েছে স্বামিজীর। দেহ-ক্লান্তি হয়েছে তিরোহিত। জেগে বসেছে মন। সাধুদের মনেও কত আনন্দ। নিবেদিতা প্রণাম রাখে শ্রীগুরুর শ্রীচরণে। স্কুল সম্বন্ধে বলতে থাকেন অনেক কথা স্বামিজী। আলোচনা করেন নানা ধরণের। সারাটা সকাল ঐ একটি প্রসঙ্গ নিয়েই রইলেন। একটা বাস্তব কর্মপন্থার ছক তুলে ধরলেন নিবেদিতার চোখের সামনে।

বেশ খুশী হ'তে পেরেছে আজ নিবেদিতা। ভালো লাগে তার। অনেকদিন পরে গুরুর প্রিয় সান্নিধ্য নিবেদিতাকে ভরে তুলেছে।

বেলা কম হয়নি। রোদ উঠে গেছে। এবারে বিদায়ের পালা। নিবেদিতা

গুরুজীকে প্রণাম করল। তাকাল আয়ত আঁখি মেলে। স্বামিজী করলেন তাকে আশীর্বাদ। শুধু কি একবার ?

তুবার হাত তুলে নিবেদিতার শীরে বর্ষণ করলেন অন্তরের শুভ কামনা। সহসা নিবেদিতার মনে পড়ে গেল কয়েকটা সপ্তাহ আগের লেখা স্বামিজীর একখানা চিঠির কয়েকটি ছত্র—"স্নেহের নিবেদিতা, তুমি হও অফুরাণ শক্তির আধার। স্বয়ং মা তোমার দেহে মনে অধিষ্ঠিত হ'ন। তোমার মাঝে আমি চাই একটা বিপুল শক্তির জাগরণ। আর সেই সঙ্গে চাই অসীম শক্তিও।

শ্রীরামকৃষ্ণ যদি সত্যের ঠাকুর হ'ন। আমায় যেমন তিনি নিয়েছেন চালিয়ে, ঠিক তেমনি করে তোমাকেও চালিয়ে নিন……না তার চেয়েও হাজার গুণ সার্থক করুন তোমাকে।"

চিঠিটার কথা ভাবতে ভাবতে নিবেদিতা তন্ময় হয়ে যায়। একটা অপূর্ব আনন্দের দোলা লাগে তার চিত্তে। প্রাণভরা একটি মধুর আবেশ নিয়ে নিবেদিতা ফিরে আসে বাগবাজারে।

কিন্তু বড় শূন্য লাগে। একা লাগে। সমস্তটা বাড়ি নিঝুম, নিথর। মনে শুধু একটি বাসনাই বারে বারে এসে তাকে পাগল করে দেয়। আবার কবে তোমাকে দেখব ? আবার কবে গিয়ে বসব তোমার কাছে ? তোমার চরণতীর্থে ?

মন মানে না। নিবেদিতা হঠাৎ একদিন রওনা হয়ে গেলেন। মনটা যেন আকুল হয়ে গিয়েছিল। আর থাকতে পারে নি। তাই উন্মাদিনীর মত ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছে গেল বেলুড়ে।

স্বামিজীর কাছে খবর গেল। কি খবর ?—সিষ্টার এসেছেন। অপ্রত্যাশিত আগমন। অভাবনীয় উপস্থিতি। স্বামিজী প্রগাঢ় আগ্রহে পাঠালেন ডেকে। নিবেদিতা এলো। এ যেন সাগর-সঙ্গম। দিনটা ছিল বুধবার—একাদশী।

নিবেদিতা স্বামিজীর কাছে দাঁড়াতেই সমস্তটা অন্তর ভক্তি ও ভালবাসায় আনত হয়ে পড়ল। মাথাটি লুটিয়ে পড়ল স্বামিজীর শ্রীচরণে। স্বামিজী মিষ্টি হেসে আশীর্বাদ করলেন নিবেদিতাকে। আশীর্বাদ করলেন তাঁর সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে।

মঠের এক সন্ন্যাসীকে ডাকলেন স্বামিজী। বললেন—নিবেদিতা এখানে খাবে। ভাত, তরকারী, দই আর ফলের ব্যবস্থা করবে।

নিবেদিতা বাধা দেয়। কিন্তু স্বামিজী সে নিষেধকে করেন অমান্য। আজ স্বামিজীর মনে অফুরাণ আনন্দ। খুশীতে ভরপুর। মেজাজটা বেশ দিলদরিয়া। নিজেই দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করলেন। নিবেদিতার খাওয়া হয়ে

গেল। ঘটি ভরে জল নিয়ে এলো এক সন্ন্যাসী। স্বামিজী ঘটিটা নিয়ে নিলেন নিজের হাতে। নিবেদিতার হাতে জল ঢেলে ধুইয়ে দিলেন। শুধু কি তাই, তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিলেন হাত।

নিবেদিতা অবাক। এসব কি হচ্ছে! ভেবে পায় না নিবেদিতা। বলল স্বামিজীর মুখের পানে তাকিয়ে, "আমরাই তো এ সব করব আপনার জন্য। এ কি করছেন আপনি?"

স্বামিজীর অধর-যুগলে একটুকরো মিষ্টি হাসি চুমু দিয়ে যায়। প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "যীশু তো তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন।"

নিবেদিতা বললেন, "হাঁ, তা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে যে শেষের দিনে!"

সে কথার কোনো জবাব দিলেন না স্বামিজী। নিবেদিতার মনটা সহসা কেমন যেন হয়ে গেল। একটা অজানিত আতঙ্কে শিউরে উঠল সে। চোখ দুটো উঠল ছলছল হয়ে।

সব কাজগুলিই সেরে ফেললেন স্বামিজী। এমন কি শেষের কাজটি পর্যন্ত। তবে কি দিন আগত হয়েছে। মায়াময় ছায়া-ঘেরা এই পৃথিবীর কোল থেকে তবে কি বিদায় নিচ্ছেন স্বামিজী? আর ভাবতে পারে না নিবেদিতা। তার চোখ দুটি বুজে আসে। স্বামিজী দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেন তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতাকে। সমস্ত অন্তর মন গুরুর কৃপাবর্ষণে অভিসিক্ত হলো নিবেদিতা। বুঝিবা কয়েকবিন্দু জলও ঝরল নিবেদিতার চোখে। সমস্ত কিছুই আজকে যেন তার কাছে নতুন ঠেকছে। কিন্তু এ কেন? কিসের জন্য?

সারাটা দিন কেটে গেল।

এলো সন্ধ্যা ঘনিয়ে। দেখতে দেখতে রাত নেমে এলো।

ফিরে এলো নিবেদিতা। স্বামিজী নিজের হাতে তৈরী করলেন নিবেদিতার জন্য রুটি। দিলেন এনে নিবেদিতার হাতে। রুটিখানা নিবেদিতা দুহাত পেতে গ্রহণ করলে। এবং তুলে ধরল মাথায়। এ যে তার গুরুর দেয়া পরম প্রসাদ! ভক্তিতে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মনে মনে বলে নিবেদিতা, "আমি আজ ধন্য হলাম স্বামিজীর মানসকন্যা হয়ে।"

সারাটা রাত আর ঘুমাতে পারল না। বারে বারে ঐ একটা কথাই কাঁটার মত বিঁধেছে তার বক্ষে—"যীশু তো তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন।"

মনটা যেন কেমন উড়ু উড়ু লাগে। সমস্তটা দিন বেশ কেটেছিল। গুরুর সান্নিধ্য স্পষ্ট অনুভব করেছে নিবেদিতা। জীবনে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কি

আছে তার। বিকেলের দিকে চলে এলো ছাদে। পাষাণ-চাপা বুক। মাঝে মাঝে দীর্ণ হাহাকারে তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। তাকাল একবার নীল দিগন্তের পানে। মৃদু মধুর মলয় বইছে। দু' একটি পাখী ডেকে নীড়ে ফিরছে। গঙ্গার গমকও মাঝে মাঝে ভেসে আসছে কানে।

ঈশান কোণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে নিবেদিতা।

বসে ধ্যানাসনে। ক্রমে ঘনিয়ে আসে আঁধার। ফুলের মত ফোটে তারার কুসুম। চাঁদ নেই। ঘনঘোর অন্ধকার। কালোয় কালোয় আলো গিয়েছে ম্লান হয়ে।

এই তমসাবৃত অন্ধকারের ঘনঘটার মধ্যে নিবেদিতার ডুবে গেল, হয়ে গেল অতলীয়িত। আত্মার গভীরে আজ শুধু একটি প্রার্থনা তার—হে প্রভু, দেখা দাও। তোমার সাবয়ব সমুপস্থিতি আমার অন্তরকে প্রশান্ত করে দিক। আমি ধ্যানাসনে বসে তোমাকে দেখতে চাই। দেখা দাও, দেখা দাও হে সুন্দর!

তন্ময় নিবেদিতা। মন্ময় নিবেদিতা। বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত। এক অবাচ্য অনুভূতিতে আনন্দশান্ত নিবেদিতা। ধ্যানের গভীরে নিবেদিতা ডুবে গেল। দয়াল দয়া করেছেন। নিবেদিতার মানস-নয়নে দিয়েছেন দিব্য দৃষ্টি। একটা বিরাটের স্পর্শ অনুভব করল নিবেদিতা। অপূর্ব আনন্দে তার দেহমন পুলকিত হলো। প্রশান্তির গভীর অতলে শান্তির শান্ত স্পর্শে নিবেদিতা আপন সত্ত্বা হারিয়ে ফেলল।

অনেকটা সময় কেটে গেল। কেটে গেল প্রহরের পর প্রহর। রাত্রির গভীর যাম। কেউ কোথাও জেগে নেই। তন্দ্রাতুরা রজনী। কেবল নিবেদিতা বসে আছে মুখোমুখী তার জীবন-দেবতার সঙ্গে। তার জীবন-দৈবতের সঙ্গে।

এ ধ্যান যেন আর ভাঙ্গে না। এ চোখ যেন আর মেলে না। আমাকে তুমি ধরে রাখো। আমাকে তোমার চরণতীর্থে মাথা রাখতে দাও। হে সুন্দর, তুমি কত মধুর! কত সুন্দর!

"আমার এ দেহখানি তুলে ধর
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর।"

কিন্তু কি করে তা হবে?

নিবেদিতার যে অনেক কাজ বাকী আছে। গুরুজী তাকে দিয়ে সব শেষ করিয়ে তারপরে আহ্বান করবেন। আঘাতে আক্ষেপ, বিলাপে, কান্নায়

নিবেদিতা আজ খাটি সেবিকা হ'তে পেরেছে। দেশ ওর মুখের পানে তাকিয়ে আছে। নরনারায়ণের সেবা পূজা না করে নারায়ণীর কোথাও কি যাবার সাধ্য আছে?

ধ্যান টুটে গেল।

আনন্দলোক থেকে নেমে এলো নিবেদিতা কান্নার জগতে। কখন যেন সমস্ত মুখখানা কান্নার অশ্রুতে সিক্ত হয়ে গিয়েছে। এ কান্নায় যে অপার শান্তি। এ কান্না অন্তরে আনে স্নিগ্ধ ভাব। স্নিগ্ধ কান্তি।

অনেক দিনের মধ্যে ঠিক এমনটি হয়নি নিবেদিতার। এমন জমাট ধ্যান, এমন লোভন মধুর দর্শন! সত্যি এ বড় আনন্দের। বড় শান্তির!

এখনো হয়নি ভোর।

পড়েনি অকাশের আর্শিতে আলোর আল্‌পনা।

ডাকেনি পাখী।

শেষ রাত। নিবেদিতা জেগেছে।

সহসা চম্‌কে উঠল। কে যেন দরজার 'পর আঘাত করল। দুয়ার খুলে দিল নিবেদিতা।

একটা চিঠি।

কি লেখা?

"নিবেদিতা, সব শেষ। কাল রাত ন'টায় স্বামিজী ঘুমিয়ে পড়েছেন চিরতরে।"

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই জীবনবিপ্লবী তাপস যুগের বুকে একটা ঝড় তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন। রেখে গেলেন নিবেদিতাকে। দিয়ে গেলেন তাঁর অসমাপ্ত কর্মের সকল দায় তারপর।

চিঠিটা লিখেছেন স্বামী সারদানন্দ। নিবেদিতা থর থর করে কাঁপতে লাগল। বারে বারে যেন ঐ একটি ছত্র তার চোখের সামনে ঘুরপাক দিতে লাগল। দু চোখ ফেটে নামল অবাধ্য অশ্রুর ঢল। পেছনে ফিরে তাকাল নিবেদিতা। চাকরটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। তার আর্তনাদ নিবেদিতাকে আরও যেন অস্থির করে ফেলল! মুখে কোনো কথা নেই। স্থবিরের মত বসে কাঁদবার সময় এটা নয়। বার্তা বাহকের সঙ্গেই নিবেদিতা চলে এলো বেলুড় মঠে।

বেলুড় মঠ।

সমস্ত পরিবেশটি শ্রান্ত সন্ন্যাসীর বিদায়-বিরহে মৌন, নিশ্চুপ। থম থম করছে চতুর্দিক। আকাশের সূর্যও যেন ম্লানিমার অন্ধকারে অবলীন। পাখী গান গায়। কিন্তু কাঁদোন ধোয়া কণ্ঠে। গঙ্গার বুকেও নেই সঘন দোলা। কেবল চতুর্দিকে মর্মরিত হচ্ছিল থেকে থেকে—নেই……নেই……নেই!

নিবেদিতা আনত গম্ভীর মুখে এসে দাঁড়াল। ক্ষণ বিরতি। বাণবিদ্ধা পাখীর মত ছুটে গেল স্বামিজীর ঘরে। ঘরটার মধ্যে থৈ থৈ করছিল অন্ধকার। নীরব নিস্পন্দ।

গুরুজীর অঙ্গে গেরুয়া। শোয়ান মেঝেতে। সারাটি অঙ্গ হলদে ফুলে আবৃত।

নিবেদিতা বসে পড়ল। তুলে নিল তার প্রিয় রাজার মাথাটি আপন অঙ্কে। তারপরে ধীরে ধীরে হাওয়া করতে লাগল একখানা তালপাতার পাখা দিয়ে।

পাষাণ হয়ে গিয়েছে নিবেদিতা। চোখে নেই বিন্দু অশ্রুর অঞ্জলি। সব যেন শুকিয়ে গিয়েছে। কেবল সমস্তটা মুখে যেন দেহের সমস্ত রক্ত এসে জমাট বেঁধে গিয়েছে। কত কথা তার এই বেদনার্ত মুহূর্তে মনে পড়ছে। বলেছিলেন স্বামিজী— "শিব আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দান করেছেন।"

বুঝিবা ইচ্ছা করেই চলে গেলেন স্বামিজী। অপলক নিবেদিতা। দেখছে স্বামিজীর মুখখানা। বিদায়ের শেষ লগ্নে অন্তর ভরে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে নিবেদিতা।

সহসা বাইরে কতগুলো মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল। ধীরে ধীরে নিবেদিতা তার কোল থেকে মাথাটি নামিয়ে রাখল বালিশের 'পর।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বর্ণনা দিচ্ছিলেন স্বামিজীর বিদায় দিনের মর্মন্তুদ মুহূর্তগুলির।

কয়েকজন সন্ন্যাসী নিয়ে স্বামিজী ঢুকলেন গিয়ে ঘরে। তখন সবে পূর্বদিগন্তে দেখা দিয়েছে আলোর রেখা। ঠাকুরঘরের দুয়ার ঠেলে স্বামিজী সাধুদের নিয়ে ঢুকলেন। কারো মুখে কোনো কথা ছিল না। সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ। কেবল স্বামিজীর হুকুম মেনে চলেছে। ধ্যানাসনে বসে স্তব্ধ হয়ে গেলেন স্বামিজী। সবাই নীরব। নিথর। কত লোক দেখল একটা জ্যোতির জোয়ার তার সমস্ত দেহকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। আহা, কি না অপরূপ রূপলাবণ্য। সন্ন্যাসীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে

উচ্চারণ করতে লাগল ওঙ্কার ধ্বনি। স্বামিজীর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হলো তখন—

'মা কি আমার কালোরে—
কালোরূপে দিগম্বরী করে
হৃদপদ্ম আলোরে।'

কথাগুলি বলতে বলতে ব্রহ্মানন্দ একসময়ে থেমে গেলেন। বলত নিবেদিতা, "কিছুদিন ধরেই ফুটে উঠেছিল স্বামিজীর মুখে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব।'

আর বিলম্ব নয়। নিবেদিতা শুনতে পেল মৃদু গুঞ্জরণ। এবারে শেষ কৃত্যের পালা।

আকাশে, আত্মায়, মাটিতে মর্মে ছড়িয়ে পড়ল মন্ত্রধ্বনি।

ওরা ধরাধরি করে দিব্যদেহ বাইরে আনে। শুইয়ে দেয় পালঙ্কের 'পর। যেন ঘুমিয়ে আছেন স্বামিজী। বিন্দু মুখবিকৃতি ঘটেনি। নেই কিছু ক্লান্তির ছায়া। এ যেন এক প্রশান্ত গম্ভীর সন্ন্যাসী ঘুমিয়ে আছেন মায়ের কোলে। কি আর বয়স হয়েছিল? চল্লিশও নয়।

একজন ব্রহ্মচারী এগিয়ে এলো। পরিয়ে দিল আল্‌তা পায়ে। ছাপ নিল মলমলের উপর। পঞ্চদীপে শিখা জ্বলল আরতির। উচ্চারিত হতে লাগল বেদ—ভারতের পবিত্র মন্ত্র। ছড়াল ধূপের গন্ধ। জ্বলল দীপাবলী। ওরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। করল আনত মস্তকে নমস্কার। শেষবারের মত গ্রহণ করল পদ-তীর্থের রজরেণু।

ব্রহ্মচারীরা স্বামিজীর দেহটি তুলে নিলেন কাঁধে। বেজে উঠল শঙ্খ। তারই মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল—'জয়গুরু মহারাজ কি জয়।'

আপন অগ্নিশয্যার স্থানটুকু নিজেই দেখিয়ে গিয়েছিলেন স্বামিজী। সেই গঙ্গার জলছোঁয়া সৈকতে চিরশান্তির মাতৃঅঙ্কে শেষ শয্যা রচিত হলো। শুইয়ে দেয়া হলো দিব্য দেহটিকে সেখানে। নিবেদিতা করল প্রথমে মুখাগ্নি। তারপরে সাধুরা এলো এগিয়ে। সবাই মিলে শুদ্ধপূত অগ্নি আহুতি দিল স্নিগ্ধ শান্ত দেহাধারে।

চিতা জ্বলল।

নিবেদিতা তাকাতে পারে না। এ মরণহীন প্রশান্তিকে আগুন অনন্তে মিলিয়ে নিচ্ছে!

একটু দূরে গিয়ে বসে পড়ল একটা ছায়া-শান্ত গাছের তলায় নিবেদিতা। কণ্ঠ থেকে আপনি উৎসারিত হলো—'জয় জয় গুরু মহারাজ কী জয়।'

কাপড়ের আঁচলে মুখ ঢাকল নিবেদিতা। আর যেন তাকাতে পারছে না নিবেদিতা। সমস্ত অন্তর আত্মা মুহূর্তে দেহ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। চোখের কোণে দেখা দিল কয়েকবিন্দু অশ্রু। থর থর করে কাঁপতে লাগল সমস্তটা দেহ। মূর্চ্ছাতুরার মত মুখ ঢাকল নিবেদিতা কাপড়ের আঁচলে। না, না, ও আর দেখতে পারছে না আগুনের লেলিহান শিখা।

ধীরে ধীরে অন্তর মথিত করে জেগে উঠতে থাকে কতগুলি প্রার্থনার মন্ত্র—হে প্রভু, হে আমার অন্তর সুন্দর, তুমি আমাকে শক্তি দাও। দাও তোমার আরব্ধ কর্মের পতাকা আকাশে তুলে ধরতে। "ঠাকুর, এ জীবনের সব কাজের মধ্য দিয়ে যেন তোমারই অন্তরের কামনাটি মূর্ত হয়ে ওঠে, রূপ পরিগ্রহ করে। শিব! শিব!"

সহসা বাতাস যেন কি কয়ে গেল কানে কানে। স্বামিজীর গেরুয়া কাপড়ের একটা দগ্ধ টুকরা এসে পড়ল নিবেদিতার কোলের মধ্যে। চমকে ওঠে নিবেদিতা—এই কি তোমার শেষ আশীর্বাদের পুষ্প! হে ঠাকুর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক আমার মাঝে।

কোথায় মন হারিয়ে গেল। কোন সুদূর অতীতের স্মৃতিরা এসে ভীড় যেন জমাতে লাগল নিবেদিতার মনের নেপথ্যে। মায়ের কথা খুব বেশী করে মনে পড়ছে নিবেদিতার। চোখের 'পর যেন দেখতে পাচ্ছে সব ধীরা মাতা ও আচার্য বসু এসে দাঁড়িয়েছে তার কান্নার অশ্রু মুছে দিতে।

এক সময়ে সদানন্দ এসে বসল তার পাশে। এতক্ষণ নিবেদিতার কোনো খেয়ালই ছিল না। সহসা সদানন্দকে দেখে তার বিরহের সমুদ্রটা যেন আরও দ্বিগুণ গর্জন করে উঠল। নিজেকে নিজে খুব নিবিড়ভাবে ধরে থাকে নিবেদিতা। ডুবে যায় আত্মার গভীরে। চোখের জলের পথ ধরে চলে যায় অন্তরের অতলে। আহা, কি মধুর আবেশ! বড় দুঃখী নিবেদিতা। বড় অসহায়!

চিতার আগুন নিবে গেল। প্রজ্জ্বলন্ত নিবেদিতার অন্তর আত্মা। একটা বিরাট কর্মসমুদ্রের এপারে দাঁড়িয়ে সে সংকল্প গ্রহণ করল দহন শুদ্ধ অন্তরে—"তাঁর বোঝা আমি তাঁর হয়েই বইতে চাই, আর কিছু চাই না। যদি কোনো দিন বিপাকে পড়ে হারিয়ে যাই, পথভ্রষ্ট হই, তুমি তো জান, আমি তোমারই হয়ে থাকতে চেয়েছি চিরটা কাল।"

আমাকে তুমি ঠিক পথে চালিয়ে নিও। তোমার করেই চিরটা কাল ধরে রেখো। তোমারই ইচ্ছা আমার জীবন মাঝে পূর্ণ হয়ে উঠুক।'

চলে গেলেন স্বামিজী।

রইল নিবেদিতা।

দুঃখ, কান্না এবং আর্তির দিনগুলোকে সরিয়ে রাখল সে। পড়ল ঝাঁপিয়ে দেশের কাজে। ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণা আজ নিবেদিতার কাছে তীর্থ-রজ। তার আকাশ, বাতাস, বন, বিবেক নিবেদিতার জীবনদায়িনী ওষধি।

প্রতিনিয়ত আজ স্বামিজীর কথাগুলো নিবেদিতার কানে মন্ত্রের মত বাজে। অন্তর মন্থনের এমন অগ্নিবাণীকে সে উপেক্ষার অন্ধকারে অবলীন করে দিতে পারে না। ঘরের আগল ঠেলে তাই সে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে আসে আলোর আপ্লবে। অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত করতে হবে ভারতবর্ষকে। প্রতিটি আত্মায় দিতে হবে আগুন ধরিয়ে। তা যদি নিবেদিতা না পারে—তার সারাটা জীবন যাবে ব্যর্থ হয়ে। শুধু কি তাই। উচ্চারিত হবে না স্বামিজীর জীবন-সংহিতার বেদ-মন্ত্র। নিবেদিতা যে সেই দায়িত্ব নিয়েই বসে আছে।

বলতেন স্বামিজী—"বলি চান দেশমাতৃকা······সহস্র নিঃস্বার্থ, তেজস্বী যুবকের জীবন বলি চান। হে বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ······এগিয়ে এস, বেরিয়ে এস···।"

"ক্ষুধার্ত লোকদিগকে ধর্মের কথা বলা বা তাহাদিগকে দর্শন শাস্ত্র বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।"

রাতের পর রাত কেটে যেত। ঘুম আসত না স্বামিজীর চোখে। দেশের আর্ত পীড়িত অসহায় মানুষদের কথা ভাবতে ভাবতে নিজেও হয়ে যেতেন তাদের একজন। শয্যা ছেড়ে আসতেন মেঝেতে। গড়াগড়ি দিতেন ধূলিতে। বিশ্বভোলার চোখে নামত জলের ধারা। এক একটা নিষ্ঠুর ভয়াল বেদন-তরঙ্গ এসে ...-বিচূর্ণ হয়ে যেত হৃদয়-পুলিনে। হাহাকার করে উঠত ঘরছাড়া সন্ন্যাসীর হৃদয়। কাঁদোন-ধোয়া কণ্ঠে বলতেন—"হা, আমার দুঃখিনী মাতৃভূমি! তোমার অত দুর্দশা, আর আমার অদৃষ্টে এত সুখভোগ! আমি এ সুখ-সৌভাগ্য ও নামযশঃ লইয়া কি করিব।"

"আমি যদি আমার জীবনে একটি মাত্র ব্যক্তিকেও স্বাধীনতা লাভ করিতে সাহায্য করিতে পারি, তবেই আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে।"

"ভারতবর্ষ আমার শৈশবশয্যা। আমার বার্ধক্যের বারাণসী।"

"হৃদয়ে এই প্রার্থনা অনুক্ষণ জাগিয়ে রাখতে হবে : "মাগো, শক্তিস্বরূপিণী তুমি। আমার সব দুর্বলতা ঘুচিয়ে দাও, কাপুরুষতা দূর করে মানুষের মত মানুষ করে তোল আমায়।"

স্বামিজীর এ সব বাণীবন্যা নিবেদিতাকে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে যে প্রসুপ্ত বিপ্লবী বিবেকানন্দ রয়েছিল তাঁকেই তুলে ধরবার দিন আগত হয়েছে আজ।

আর সময় নেই। এইতো মহেন্দ্রক্ষণ। সন্ধিলগ্ন। বিপ্লবের প্রত্যূষ প্রসন্নতাকে মধ্যাহ্নের অগ্নিদাহে উদ্দিপ্ত করে তুলতে হবে। দিতে হবে ভয়াল তরঙ্গক্ষুব্ধতার মধ্যে পাড়ি। তাইতো নিবেদিতার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—"স্বামিজীই আমার ধর্ম, আমার দেশহিতৈষণা সব……স্বামিজী আমাদের মহান জাতীয় নেতা।"

"…তার শক্তি তিনি আমায় দিয়ে গেছেন, যাতে এখানকার এ কাজ আমি করতে পারি। কাজেই তাঁর মত আমিও লড়াই করে যাব। তিনি যেমন করে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন, আমিও তেমনি যেন নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে পারি।"

"আমার ভারতকে আমি বিশ্বাস করি প্রাণ দিয়ে। তোমরা কি বলতে চাও তার কোনো অস্তিত্বই নাই? হাতেকলমে কিছু না করেও জাহাজের কাপ্তেন সব সময় উদ্দিষ্ট বন্দরের কথাই ভাবে। আমি যে বন্দরের দিকে ভারতকে নিয়ে যাচ্ছি, সে হল তার বিধিলিপির পূর্ণতা। আমার কম্পাসের কাঁটা যে দিনরাত সেই লক্ষ্যের দিকেই ফিরে যাচ্ছে।"

ভারতাত্মার প্রত্যক্ষ প্রকাশের মধ্যেই প্রসুপ্ত রয়েছে একটা প্রচণ্ড শক্তি। তাকে সন্ধান করতে হবে। দিতে হবে মানুষকে মানুষের অধিকার নিয়ে মাথা তুলে বাঁচবার মত সামর্থ্য। তাই নিবেদিতা কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে দেশবাসীকে ডেকে বলল—"তোমাদের মানুষ হতে শেখাব বলে আমি এসেছি। তোমাদের রামায়ণ-মহাভারতকে প্রত্যক্ষ করে তোল আজ। রামায়ণ একবার দেখা দিয়েই চলে গেছে। তার সমাজ মরে গেছে, এ কথা তো সত্য নয়। আবার তোমরা তোমাদের নিজের রামায়ণ নিজে রচনা কর। রূপকথায় নয়—দেশমাতৃকার সেবা করে, তাঁর কাজ করে।"

এ দেশের মন্ত্রে, তন্ত্রে, দীক্ষায়, শিক্ষায় রয়েছে একটা ঘুমন্ত শক্তি। রয়েছে বিশ্ব-ঐক্যের ঐকতান। স্বয়ং ধর্মই এখানে মূর্তিময় হয়ে উঠেছে জাতীয়তার প্রতীক হয়ে। মন্দিরে মন্দিরে এখানে শক্তির জাগ্রত প্রকাশ। তাঁর কাছে শক্তিভিক্ষার কাতর প্রার্থনা।

সেই রুদ্ধ-মন্দিরের আর্তি, আবেদন ও প্রার্থনাকে মিলিয়ে দিতে হবে জনকণ্ঠে। জীবের জনতাকে ডেকে জাগাতে হবে। বলতে হবে, ওঠো, জাগো। চোখ মেলে দেখ তোমার দুর্দশা। মন্দিরের দুয়ার খুলে দাও। মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ কর। আত্মমুক্তি নয়—বিশ্বমুক্তির নতুন দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে এসে দাঁড়াও সর্বহারাদের মাঝে। শাক্ত শক্তির সার্বিক প্রকাশে লোভ, ক্ষোভ ও অক্ষমার কবর রচিত হোক,—"এসো অজ্ঞেয় ব্রহ্মের দাস না হয়ে দাসত্ব করি প্রত্যক্ষ দেশমাতৃকার। পূজা বেদী রূপান্তরিত হোক কারখানা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেবতার নৈবেদ্য তুলে ধর মানুষের সেবায়। তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে তোলো। কর্মসন্ন্যাস দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা নয়, এস জ্ঞানার্জনের জন্য করি আমরা প্রাণপাত। ··· আমাদের ধর্মের গোঁড়ামি রূপান্তরিত হোক দেশাত্ম ভাবনায়।"

আধ্যাত্মিক মুক্তির কথা নয়, প্রকৃত মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার বাণী উচ্চারিত হলো নিবেদিতার কণ্ঠে।

১৯০১ সাল।

হয়ে গেল কলকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন। এ সময়টা নিবেদিতার জীবনে একটা সন্ধিলগ্ন। ভারতীর শৃংখল মুক্তির তপে নিজেকে উৎসর্গ করতে সে প্রস্তুত। ওকাকুরা তখন একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করছিল। আর সুরেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একটি তরুণ সমিতি। তারা হিন্দুর মনে জাগাবে রাজনীতিক চেতনা। যোগাযোগ স্থাপন করবে দেশ-বিদেশের সঙ্গে। অবশ্য এ ব্যাপারে নিবেদিতা পটু। কারণ আইরিশ সমিতিতে কয়েকটা বছর পূর্বে সে কাজ করেছে। পরাধীনতার দুঃখময় অধ্যায় থেকে মুক্তির প্রভাত সূর্যকে বন্দনা করতে কি করে হয়—তা বেশ ভালোভাবেই জানা ছিল তার। তাছাড়া ওকাকুরা ও সুরেন্দ্রনাথকে পেয়ে নিবেদিতার মনে দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চারিত হলো। মিস্ ম্যাকলয়েডকে ওকাকুরা সম্বন্ধে একটা চিঠি লিখল নিবেদিতা, "ওঁর জ্ঞান বুদ্ধি বা পদমর্যাদা—এসব জিনিস নিয়ে আমি ভাবি না। আমি চাই ওঁর সঙ্কল্পের শক্তি কতটা তা দেখতে। এবং দেখতে চাই তাঁর হৃদয়ের গভীরতা কতদূর বিস্তৃত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ জিজ্ঞাসার একটা উত্তর আমি পাব। আমি পেতে চাই মানুষের জীবনতৃষ্ণা কোথায় গিয়ে কিভাবে পরিসমাপ্তি লাভ করে তা ওঁর কাছ থেকে জানতে। যারা সার্থককর্মা, তাদের কাছ থেকে একটা কথাও এদ্দিন ধরে আমি আদায় করতে পারলাম না।"

ওকাকুরা ফিরে এলো কলকাতায়। নিবেদিতার পর পড়ল পুলিশের দৃষ্টি। কথাটা

রাখা হলো নিবেদিতার কানে। কিন্তু এতটুকু ভয় পেল না নিবেদিতা। কথাটা শুনে একটু হাসল শুধু। কথাটা মিথ্যা নয়। পুলিশের কাজ তারা করে যাচ্ছে। তখনকার দিনের দেশনেতাদের সঙ্গে পত্র-বিনিময় নিবেদিতার সচ্ছন্দেই চলত। এমনি দিনে নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয় হলো গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে। গোখলে নিবেদিতার কথা ও কাজে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে যেত। শান্ত স্বভাব গোখলের। বিশ্বাসী নরম পন্থায়। কিন্তু নিবেদিতার সঙ্গে এ ব্যাপারটা নিয়ে মাঝে মাঝে দীর্ঘ আলোচনা হতো তাঁর। পথের দিক থেকে দুজনে দুপন্থী হলেও উভয়ের উভয়কে যে কতটা প্রয়োজন তা নিবেদিতার কয়েকটা পত্র থেকেই অনুমেয়। গোখলেকে নিবেদিতার লেখা কয়েকটা পত্র—"আমার কাছে তোমার জীবনের মূল্য অপরিমেয়। প্রগল্ভ তিরস্কারে মাঝে মাঝে তোমার প্রতি অমর্যাদা দেখালেও এ ধারণাটা খাটো হবে এমন কথা মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দিও না। আমি সত্যি তোমায় মনে করি একজন দেশপ্রেমিক বলে। আমি বেশ বুঝি, আমাদের মতদ্বৈধ কোথায়। যা সত্য বলে বুঝবে তার সামনে তুমি ভয় পেয়ে দেশের লোককে ফেলে পালাবে, একথা ভাবার চেয়ে চরম পরীক্ষার মুহূর্তে আমিই পিছু হঠতে পারি—নিজের সম্বন্ধে এমন হীন ধারণা করাও যে আমার পক্ষে সহজ। কারণ, যাই বল না কেন আমি নারী বই তো নই। তোমার জেদ আর শক্তি যে পুরুষোচিত, এ কথা ভেবেও আমি আনন্দ পাই।

"কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমি যে চোখে দেখছি সেই দৃষ্টির ছোঁয়াচ তোমারও লাগুক, এই আমার ইচ্ছা। বিষাদের পরিবর্তে তখন কী অসীম আনন্দে যে প্রাণ ভরে উঠবে তোমার! আর তুমি সে আনন্দ পাওয়ার যোগ্য অধিকারী। আজ আমাদের সামনে নবোদ্ভিন্ন প্রাণ আর তুমুল সংগ্রামের বিরাট সমারোহ। বাধা পেয়ে যে মুষড়ে পড়ে, সে জানে না সুকৌশল কর্মের নীতি, জানে না এতটুকু আগুন কি করে বিপুল দাহে আকাশ ছুঁয়ে আসে। বৃহতের সন্ধান পেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলবার কি সময় মেলে? ভুল-ত্রুটি সংস্কারের চেষ্টায় দীর্ঘদিন ধরে শক্তির অপব্যয় যেন আমরা না করি। গড়ে তুলতে হবে জীবনকেই। স্বাতন্ত্র্য দাও, মুক্তি দাও প্রাণকে। পুরুষ আর নারীর ব্যক্তিত্ব ঠিক পথটি আপনিই খুঁজে নেবে। ফলে যা-ই আসুক না কেন, মানতে হবে। একটা মহাজাতির প্রাণ পরম আকূতিতে এবং চিন্ময় তপস্যায় জ্বলে উঠবে যখন, তখন তার সহজ চেতনাই দিশারী হয়ে তাকে নিয়ে যাবে তোমার আমার কল্পনারও নাগালের বাইরে। সে তো ভালই।

"যে আনন্দে আমার মন ভরপুর, সাধ হয় তোমাকে তার ভাগ দিই। দুঃখ আর

সংগ্রাম, আত্মবিসর্জনের পুণ্য গৌরব—এই যদি আমাদের ভাগ্যে থেকে থাকে, আমি তা-ই চাই।”

চিঠিটা ১৯০২ সালে ২০শে মার্চ লিখেছিল নিবেদিতা। লিখেছিল গোখলেকে।

আর একজন মহারাষ্ট্রীয় নেতাকে নিবেদিতা অপরিসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তিনি হলেন বালগঙ্গাধর তিলক। তিলকের ‘কেশরী’ পত্রিকা নিবেদিতার খুব প্রিয়। ছেলেদের হাতেও তুলে দিত নিবেদিতা এই কাগজখানা। চরমপন্থী তিলক নিবেদিতার অন্তরে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন বিছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ তাঁর পথ ও নিবেদিতার পথ একই। তাছাড়া স্বামিজীর সঙ্গে তিলকের একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগও ছিল। কাজেই তিলক ও নিবেদিতা একযোগে কাজ করতে সব সময়ই প্রস্তুত।

নিবেদিতার কাছে স্বামিজীর একটাই প্রত্যাশা ছিল। তা হচ্ছে এই যে, নিবেদিতা ঝিমানো জাতটাকে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দেবে। দেশের বুকে আনবে প্লাবন। রাজনীতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে জনতা। ঝাঁপিয়ে পড়বে দেশ-মাতৃকার শৃংখলমুক্তির সাধনায়। এ ব্যাপারে স্বামিজী পূর্বাহ্নেই মঠের সাধুদের বলেছিলেন নিবেদিতা সম্বন্ধে, “ও যদি মঠের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না-ও রাখে, তোমরা ওকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিও।”

সে চরম মুহূর্তটি এলো। একটা দারুণ সংকটে পড়ে গেল মঠের কর্তৃপক্ষ নিবেদিতাকে নিয়ে। ঠিক এভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নেমে গেলে বৃটিশ হয়ত মঠের অস্তিত্ব একদম বিলুপ্ত করে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না।

কি করা যাবে ?

ওদের ভিতরে এ নিয়ে বেশ আলোচনা হতে লাগল। এবং দুটো পথ বৈ আর কোনো দুয়ার যে খোলা নেই এ সম্বন্ধে স্থিরবদ্ধ হলো।

হয় নিবেদিতাকে তার প্রিয় কর্ম থেকে সরে এসে মঠের আনুগত্য মেনে চলতে হবে। নয়তো মঠের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

যদিও প্রস্তাবটা মর্মান্তিক, তবুও একথা স্পষ্ট করে নিবেদিতার কাছে ওরা বলল।

নিবেদিতার জবাব দিতেও বিন্দু বিলম্ব হলো না। সে ব্রহ্মানন্দকে জানিয়ে দিল, “আর কিছু আমার দ্বারা হবে না। ভারতমাতার সাধনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। দেশের ভাবনা আর আমি এক হয়ে গেছি। এপথ ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে মরা আমার পক্ষে অনেক বেশী সহজ।”

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দকে লেখা নিবেদিতার চিঠি—

১৭, বোসপাড়া লেন,
বাগবাজার,
কলিকাতা
১৮ই জুলাই, ১৯০২

প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ,

আজ সকালে আপনার চিঠি পেলাম। মঠের পক্ষ থেকে আপনি আমার প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ করুন। ব্যাপারটা বেদনাদায়ক। কিন্তু আমার পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যে ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক তা-ই আমায় মেনে নিতে হবে।

তবুও বিশ্বাস রইল, আপনি ও মঠের আর সবাই প্রতিদিন আমার হয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করবেন শ্রীরামকৃষ্ণ আর আমার প্রাণের ঠাকুরের ভগ্নাবশেষের বেদিমূলে।

যথাসম্ভব সহজভাবেই কাগজে কাগজে আমার এই নতুন পরিস্থিতির খবরটা সকলকে জানিয়ে দেব। আমার কৃতজ্ঞতা আর আন্তরিকতা জানাই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের
নিবেদিতা।

স্বতন্ত্র জীবন নিয়ে নিবেদিতা চলবে পথ। তাব যাত্রাকে কেউ সীমা-চিহ্নিত গণ্ডীতে আবদ্ধ করে রাখুক এটা ওর কাম্য নয়। তাই বেলুড় মঠের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক সে ছিন্ন করে দিল। মঠ কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তার দিনগুলোর অবসান করে দিল চিরটা দিনের জন্য। স্বামিজীর আরব্ধ কর্মযজ্ঞে জীবন আহুতি কিভাবে দিতে হবে তা বেশ ভালো করেই জানা আছে তার। তাছাড়া স্বামিজীকে নিবেদিতা যতটা দূর বুঝেছে তাতে এ কথাই সত্য যে, দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করে তুলবার জন্যই এদেশে তার আগমন।

মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক হলেও 'পত্রিকা'য় এ সংবাদটা নিবেদিতাই প্রকাশ করে দিল—খবরটার শিরোনামা ছিল 'সিস্টার নিবেদিতা।' নিচে লেখা ছিল, "অনুরোধ করা হয়েছে, আমরা যেন সর্বসাধারণকে জানাই যে স্বামী বিবেকানন্দের শোক-বাসরান্তে বেলুড় মঠ পক্ষ ও নিবেদিতা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অতঃপর সিস্টার নিবেদিতার কোনও কাজেই মঠ কর্তৃপক্ষের সম্মতির অপেক্ষায় থাকবে না। তাঁর কাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে গণ্য হবে।"

হিসেব নিকেশের ব্যাপারটাও সে চুকিয়ে দিতে বিলম্ব করল না। মঠের সঙ্গে সমস্ত যোগবন্ধন ছিন্ন করে নিবেদিতা এসে দাঁড়াল উন্মুক্ত আকাশের নিচে।

সব সমাধা করে নিবেদিতা বাগবাজারের বাড়িতেই রয়ে গেল। সঙ্গে রইল অমূল্য মহারাজ ও সদানন্দ ছাড়াছাড়ি হলেও তেমন বিষাদঘন হলো না।

হলেই বা কি? সারাটা জীবন যে শুধু পেল বঞ্চনার বেদনা, আক্ষেপের কান্না হলো যার জীবনের সঙ্গী, ব্যর্থতা, হাহাকার লয়ে যে এসে দাঁড়াল জনারণ্যের মাঝখানে—তার কাছে কোনো বড় দুঃখই আজ আর দুঃখ নেই। দহনকে নিবেদিতা অভ্যর্থনা জানাতে জানে। দুঃখকে দোসর করে চলতে তার কোনো দ্বিধাই নেই। তাই তো সে হাসিমুখে সমস্ত মায়ার বন্ধনকে দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলল। বড় বড় আঘাত, বাঁধনহীন চোখের জল নিবেদিতাকে মহৎ থেকে মহোত্তরের পথে টেনে নিয়ে যাবে।

তবুও মনের দিগন্তে অতীতের দিনগুলো এসে ছায়ার মত দাঁড়ায়। নিবেদিতা যেন কোথায় হারিয়ে যায়। বিলুপ্তির পর পারে যেতে তার এতটুকু দ্বিধা নেই। দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু কে তাকে ছাড়বে? গুরু যে তাকে এনেছিলেন এদেশের কাজ করবার জন্য। কর্ম শেষ না হলে তার তো যাবার উপায় নেই।

সহসা সম্বিৎ ফিরে আসে। নিবেদিতা মিস্ ম্যাকলয়েডকে সব কথা লিখে জানায়—"প্রাচ্য নারীর জীবন বিপুল ধারায় বয়ে চলেছে। আমি কে যে তার গতি বদলে দেব? না হয় দশ-বারোটি মেয়ের মনে আমার ভাবনা সঞ্চারিত করেই দিলাম, সেটা এমন কী বেশী লাভের হবে? তার চেয়ে এ দেশের পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের মনেও যদি জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তোলা যায়, জীবনের বৃহত্তর সমস্যা আর দায়িত্ব সম্বন্ধে তাদের সচেতন করা যায়, তাতেই কি ওদের কাজ করা হবে না? তারপর যখন নতুন ভারতের বিরাট পরিকল্পনাকে নিজেরা যাচাই করে দেখবার সময় পাবে, ততদিন হয়তো মেয়েরা জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখবে আর নতুন নতুন চাহিদা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠবে। তাই হবে না কি? নিজেদের এমনি করে গড়ে তুলবে না কি ওরা? বুঝতে পারি না, য়ুম। হয়তো এসব ভাবের ঘোরে ভুল বকছি। বলতে পারি না। কেবল মনে হয়, গোটাকয়েক মেয়েকে প্রভাবিত করা নয়, আমার কাজ হল একটা জাতিকে জাগিয়ে তোলা। কেমন করে তা সম্ভব, একজন মানুষ আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ কেবল আমার হাতিয়ারে শাণ লাগানো। আগেই আমি দেখছি কি হতে চলেছি।

"আমার কাজে হয়তো আমি সফল হব না। কাজটা যে কত অসম্ভব আর আমি

যে কী অযোগ্য, তা আমি যেমন বুঝতে পারছি, তুমি তা বুঝবে না। কিন্তু তাতে হেরফেরটা কি হল? ভাবছ, তাহলে আমার কাজে নামা উচিত নয়? মহাশক্তির বিপুল তরঙ্গে আজ আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। তীরে পৌছব কি না সে ভাবনার দায় তাঁর 'পারেই সপে দেব না কি?

"তা নইলে গুরু এমন সময় চলে গেলেন কেন? তাঁকে আর বেদনা না দিয়ে এদেশের প্রতিটি অণু পরমাণু অবন্ধ্যাবীর্য মহা ভবিষ্যৎকে রূপ দিক, তাঁর অলক্ষ্য প্রাণের স্রোত সেই সম্ভাবনাকে মূর্ত করুক, এই জন্যই নয় কি? মনে পড়ে না কি, তিনি বলেছিলেন, "একদল কর্মী গড়ে তোলবার পর যে কোনও মহাপুরুষের অন্যত্র সরে যাওয়া উচিত। তিনি নিজে তাদের মধ্যে থাকলে তার স্বাতন্ত্র্য পায় না।

কিন্তু আমার এ ধারণা দৃঢ়, তাঁর নামে যে কাজ করছি, তুমি তাকে প্রশ্রয় ছায়ায় লালন করবে, করবে মঙ্গল কামনা।" চিঠিটা লেখার পরে নিবেদিতার অন্তর্দহনের জ্বালা কিছুটা প্রশমিত হল।

গুরুর নামে জনারণ্যের মাঝখানে নেমে এলো নিবেদিতা। এখন তার নয়নে শুধু ভারতীর স্বপ্ন।

ক্যাজ আর কাজ।

কর্মসমূদ্রের উদ্বেল তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিবেদিতা। স্মরণ করল গুরুজীর পাদ-পদ্ম। ঐ তো তার সম্বল। জীবনের অরুণ উদ্ভাস থেকে অন্তসুপ্তির দিনটি এই এক মগ্নতাই তাকে মুগ্ধ মদির করে রাখবে। আঘাত বেদনা ও হাহাকার যা তাকে বিদ্ধ করেছে পলে পলে—তা থেকে এখন সে মুক্ত। শুধু গুরুজীর অসমাপ্ত কর্ম সমাপনের ভাবনাই আজ তার কাছে সবচেয়ে বড় ও মহৎ ব্রত বলে সে জেনেছে। হৃদয়ের সমস্তটা ঠাঁই গুরুজীর উদ্দেশে অর্পণ করে নিবেদিতা এখন হয়েছে ব্রত ধারিণী।

এমনি একটা দিনে ডাক এলো নিবেদিতার। ডাক এলো যশোর থেকে। তারা চাইল নিবেদিতার মুখ থেকে শুনতে তার গুরুজীর কথা। নিবেদিতা আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বলল, "স্বামিজীই আমার ধর্ম, আমার মর্ম, আমার দেশহিতৈষণা সব।"

কেটে গেল কয়েকটা দিন। এদিকে সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে ওকাকুরা উত্তর ভারতের পথে চলল তীর্থভ্রমণে। নিবেদিতাও কয়েকটা সপ্তাহ পরে বেরিয়ে পড়ল। ওদের দুজনার কাজের মধ্যে একটা গভীর ঐক্য। একই ভাব ও ভাবনায় পথ চলতে লাগল। ভারতবর্ষের মুক্তি চিন্তায় দিনরাতকে সমানভাবে প্রত্যক্ষ করে চলে। কলকাতার সমাজে ওকাকুরা হলো পরিচিত। মিস বুল তা করে দিল। আজকাল ওকাকুরা প্রায়ই বলে—"ভারতবাসী, জেগে ওঠ তোমরা। দেখ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তির সমকক্ষ করবার জন্য ত্রিশ বছরের কম সময়ে আমাদের দেশকে আমরা কি করেছি। আমাদের অতীত ছিল গৌরবোজ্জ্বল, তারই প্রেরণায় জাগিয়ে তুলেছি দেশের ঘুমন্ত আত্মাকে। তোমরাও মাথা তোল। যে বিরাট ভবিষ্যৎ তোমাদের সামনে তাকে রূপ দেবার এই সংকেত।"

ওকাকুরার আহ্বানে মুগ্ধ হয় তরুণ সমাজ। তারা আসে এগিয়ে। ওকাকুরা তাদের কাছে প্রশ্ন করে—"দেশের জন্য তোমরা কি করবে ঠিক করেছ?"

ক্ষণ বিরতি। আবার বলতে শুরু করে, "অশোক আর বিক্রমাদিত্যের মত রাজার নামও দেশটা ভুলে গেছে? একটা জাতির সমস্ত রাজন্য অসম্মানের লাঞ্ছনা বুকে বইছে, নিচ্ছে বিজেতার হুকুম? জাতীয় মহাসভা এদেশের লোকের হয়ে তার প্রতিবাদ করতে সাহস করে না? তোমরা কি ভুলে গেলে সমস্ত এশিয়ার সেই

একটা সত্তাকে ? হিমালয় তো আমাদের দূর করে দেয়নি, বরং দুটো বিরাট সভ্যতাকে সংহত হয়ে উঠবার প্রচুর সুযোগই দিয়েছে—কনফুসিয়াস চীনের বাস্তববাদী সভ্যতা আর বৈদিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের সভ্যতাকে। যারা মহাভারত আর উপনিষদের উৎস হতে পরমতত্ত্বের অমৃতধারা আকণ্ঠ পান করেছে।' সেইসব গাঙ্গেয় দেবব্রতদের কি হল ?"

সুরেন্দ্রনাথ ও ওকাকুরা ভারতের দিকে দিকে অগ্নি বর্ষণ করে চলল। দেশের ঘুমন্ত শক্তিকে জাগরণের অভিমন্ত্রে আহ্বান জানাতে লাগল। নিবেদিতা ওদের সম্বন্ধে বলল, "সুরেন আর ওকাকুরা কি না করেছেন ? যা কিছু করবার তার চেয়ে বেশিই করেছেন।......ভয় হয়, উনি সাধ্যের অতিরিক্ত খাটছেন। এই দীপ্ত আত্মদানের কাছে ছোট-বড়র বিচার নাই। কার জন্য এমন প্রাণপাত করছেন তারও খেয়াল নাই। এমনি আত্মহারা।" এদিকে নিবেদিতাও বসে নেই। তার আহ্বান আসতে লাগল লাহোরে, বম্বে, পুণা থেকে। ওকাকুরার ভ্রমণ শেষ হয়েছে। ফিরে এসেছে কলকাতায়। তাকে নানাভাবে নিবেদিতার সাহায্য করতে হয়। শুনতে হয় তার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। সাহায্য করতে হয় বই লেখায়। প্রাচ্যের আদর্শ (The ideals of the East) নামক পুস্তক প্রণয়নে ওকাকুরাকে নিবেদিতা প্রচুর ভাবে সাহায্য করেছে। বইখানার পাণ্ডুলিপি বুল নিয়ে গেল আমেরিকা থেকে প্রকাশ করবে বলে। সবকিছুর একটা ছন্দোবদ্ধ ভাব রেখে নিবেদিতা স্বামী সদানন্দকে নিয়ে যাত্রা করল সেপ্টেম্বর মাসেব শেষের দিকে।

অক্টোবরে মিস ম্যাকলয়েডকে একটা চিঠি লিখল নিবেদিতা। হঠাৎ করে এত শীগ্‌গির যে আমাকে এ কাজে ঠেলে পাঠান হবে, এজন্য মোটেই আমি তৈরী ছিলাম না।......গুরু আমার সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তোমার কাছ থেকে সে কথাগুলো শুনতে আমার খুব ভালো লাগে. "সারা ভারত মুখর হয়ে উঠবে ওর নামে।" ......তাই নিয়ে এ যাত্রার সূচনা আমার। এই স্বপ্নই কি স্বামিজীর ছিল ? তাই কি এখন সার্থক হতে যাচ্ছে ? এর জন্য তার মন যে দিন দিন কিভাবে তৈরি হয়ে উঠে ছিল তারই আভাষ এখন যেন একটু একটু পাচ্ছি।"

বম্বে একটি জনসভায় নিবেদিতা আবেগময়ী ভাষায় বলল, "......দেশের অতীত আদর্শ ও পরিবেশ হতে নিজের মাঝেই নিজের জীবনকে ভারত নতুন করে আবিষ্কার করবে। পরের অনুকরণ করে নয়। একটি কথাই বলবার ছিল স্বামিজীর, বার বার একটি বাণীই দিয়ে গেছেন। উত্তিষ্ঠিত ! জাগ্রত ! লড়াই করে চল, লক্ষ্যে না পৌছান পর্যন্ত থামবে না।"

গুরুকে এবং তাঁর আদর্শকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ নিয়েই নিবেদিতা নেমেছে কর্ম-পথে। তা কি সে পারবে না? দিনরাত্রি এই কথাটা তাকে বেশ ভাবিয়ে তোলে। নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে নিবেদিতা বক্তৃতা দিতে লাগল। তিলক ভাষণগুলো বিভিন্ন কাগজের মাধ্যমে তুলে ধরতে থাকেন জনসমক্ষে। চতুর্দিকে একটা সাড়া পড়ে যায়। এগিয়ে আসে যুবকবৃন্দ, এগিয়ে আসে নিবেদিতার কাছে। বলে, সিষ্টার, আমাদের কাজ দাও। "আমরা কোন্ কাজে লাগব?"

শিখারূপিণী নিবেদিতা দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দেয়, "যে ভাবেই হোক, ভারতের সেবা কর।" দীর্ঘ ছয়টা সপ্তাহ ভ্রমণ করল নিবেদিতা। লাহোর, গুজরাট, সুরাট, বরোদা ও আমেদাবাদ দেখে যাত্রা করল ওয়ার্ধার পথে। সেখান থেকে এলো নাগপুরে। দেখল রাজবন্দীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার বাস্তব চিত্র। মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার। শুধু তাই নয়—প্রকাশ্য সংগ্রামের কি ভয়াবহ পরিণতি তাও নিবেদিতা দেখে নিল কৌশলে। এই দেখাটাই তার বড় দেখা। আগামী দিনের রক্তক্ষরা সংগ্রামে হয়ত একদিন তাকেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে প্রত্যক্ষভাবে।

ওকাকুরা জাপানে ফিরে গেল ধর্ম সম্মেলনের জন্য। আমন্ত্রণ জানাল নিবেদিতাকে। তার যাওয়া হলো না।

নিবেদিতা ফিরে এলো বরোদায়। পরিচিত হলো বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে। গাইকোয়াড়ের রাজবাড়িতে অরবিন্দ নিয়ে গেল নিবেদিতাকে। সেখানে নিবেদিতা অনেকবারই গিয়েছে। দিয়েছে ভাষণ। দেশের কথা ও কাজ নিয়ে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা করেছে আলোচনা।

অরবিন্দ আর নিবেদিতার মধ্যে একটা বোঝাবুঝি হয়েছিল গোপনে। কেউই কারো কাছে অপরিচিত নয়। নিবেদিতা অরবিন্দের কাছে "কালী দি মাদারের' লেখিকা। আর অরবিন্দ? অরবিন্দ নিবেদিতার চোখে ভাবী যুগের দেশনেতা। 'ইন্দুপ্রকাশে' জ্বালাময় প্রবন্ধ লিখে ঘোষ দেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। গড়েছেন একটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি। ভারতকে দুজনেই ভালোবাসে। আবার দুজনার কর্ম-ধারার সঙ্গে মিলও অপূর্ব। অরবিন্দ ব্যাপকভাবে বিপ্লবকে নানা দিকে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। সুদূর বরোদা থেকে বাঙলা পর্যন্ত একটা বিপ্লবী সংস্থা তৈরী করবার জন্ত বেছে বেছে লোক নিতে লাগলেন তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য অন্য রকম। তিনি চাইলেন চতুর্দিকে বেষ্টনী তৈরী হোক বিপ্লবীদের। যখন দিন আসবে তো একসঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে যাবে। ঘোষণা করবে স্বাধীনতার রক্তস্নাত মন্ত্র।

সমস্ত কিছু শুনে নিবেদিতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। আর যেন সময়

সয় না তার। ধৈর্যহারা নিবেদিতা। এখনই পড়তে চায় ঝাঁপিয়ে। তাই বলল সে, বলল অরবিন্দকে, "কলকাতায় তোমাকে দরকার। তোমার স্থান বাংলায়।"

অরবিন্দ বললেন, "এখনও সময় হয়নি। আমি আড়ালে থেকে কাজ করছি। আমার সামনে থেকে প্রকাশ্যে কাজ করবার জন্য লোক চাই।

হাতখানা বাড়িয়ে দেয় নিবেদিতা নীরবে। তাকায় রক্তমদির নয়নে। বলে, "আমায় ভার দিতে পার না? আমি তোমার দলে।"

কলকাতায় ফিরে এলো নিবেদিতা। পেল মাদ্রাজ থেকে আমন্ত্রণ। চলল সেখানে, "যারা বলে আমরা দুর্বল, আমরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, সহায় সম্বলহীন পরাধীন হতভাগা আমরা, তাদের দেশহিতৈষণার ভাঁওতায় ভুলো না। যে প্রাণ নবীন, যে প্রাণ দুর্ধর্ষ, প্রকাশের নতুন নতুন পথ সে খুঁজবেই, আমাদের জীবনে সত্য থাকে যদি। নতুন নতুন সত্য নিত্যই প্রতিভাত হবে আমাদের কাছে। সে সত্য যখনই হোক না, জোরের সঙ্গে আমরা তা প্রকাশ করব।"

এরপর নিবেদিতা চলে এলো দক্ষিণ ভারতে। বিবেকানন্দ হলের উদ্বোধন করল। কংগ্রেসের সদস্যদের সঙ্গে হলো আলাপ আলোচনা। চলে এলো ত্রিচিনাপল্লী সেখান থেকে চিদাম্যরম্। ওখানকার পূতশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব নিবেদিতার বেশ ভাল লাগল। বলল সে, "যে কোনও আন্দোলনের সূচনা করতে হবে এই সব দেব দেউল থেকে। দীর্ঘ যাত্রা শেষে আবার সে আন্দোলন মিলিয়ে যাবে দেবতার মন্দিরেই।"

১৯০৩ সনের মে মাসে নিবেদিতা মেদিনীপুরে এক ভাষণ দিল। সে বক্তৃতার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল সে কতগুলি বহ্নিকণা। শক্তির বিকাশ বৈ দেশ জাগবে না। ঘুম তাদের ভাঙবে না। আসবে না মুক্তি। এ যেন সংগ্রামের প্রাক্ প্রস্তুতি। সমস্তটা দেশ উদ্বেল অধীর হয়ে শুধু দিন গুণে চলেছে। কবে সে লগ্ন আসবে। কবে সারাটা হিন্দুস্তান একসঙ্গে জেগে উঠবে।

রবিবাসরীয় আসরে বেশ লোকের জমায়েত হতে লাগল। যুবকরা আনাগোনা করতে লাগল নিবেদিতার কাছে। তাদের রক্তে মুক্তির নেশা। তারা কিছু করতে চায়। কাজ চায়। সে দলটির মধ্যে বারীন্দ্র ঘোষও ছিল। বারীন্দ্র বলত, "সবার কানে দিয়ে যাব স্বাধীনতার মন্ত্র। কেউ পারবেনা আমাকে রুখতে।"

নিবেদিতার ভারি ভাল লাগে ছেলেটিকে। স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে নিবেদিতা, "উদ্দেশ্য তোমার মহৎ। কিন্তু নিজেকে তৈরী করেছ? মনে রেখ। তোমার জীবন শুধু তোমার নয়। তুমি জন্মেছ তোমারই মত আর দশ জনার জন্য, সব মানুষের জন্য।"

বারীন্দ্র বললে, "নিশ্চয়, তুমি হবে আমাদের 'জোয়ান অব আর্ক', পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের, এই সত্য। তোমায় আমরা চাই। তোমার পিছু পিছু তালঠুকে চলবে আমাদের বাহিনী। কোথায় নিয়ে চলেছ যদি নাও জানি, তবু সবঠিক হয়ে যাবে। তুমি শুধু হুকুম কর।"

নিবেদিতা বলল, "বেশ তো, কাজে লেগে যাও। রাস্তা খুলে যাবে সামনে।

বারীন ঘোষ কাজে নেমে গেল। কি তার কাজ? গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলবে যুব সমিতি। খেলা, থিয়েটার, গানবাজনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মিলিত হতে হবে সবাইকে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হলো সমাজকে সেবা করা এবং অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা দান করা।

বহু সহকর্মী ও সহমর্মী জুটে গেল বারীন ঘোষের। তারা সকলে একত্র হয়। দেশের কথা নিয়ে করে আলোচনা। পড়ে গীতা ও ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্‌ডির জীবনকথা। শুধু কি তাই, এর সঙ্গে যোগ হয় আবার স্বামিজীর কথা অনুধ্যান করা। ফলে সমিতির সভ্যসংখ্যা দিন দিন বেড়েই যেন চলল।

ঠিক এমনি একটি দলের সঙ্গে পরিচয় ছিল নিবেদিতার। ওকাকুরার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ট একটা পরিচয় ছিল তাদের।

কে তারা?

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সরলা ঘোষ। এদের ছিল একটি দল। নিবেদিতার মনে প্রবল ইচ্ছা সে একটি সমিতি গড়ে তুলবে স্বামিজীর নামে। নিবেদিতার এ আশার স্বপ্নসাধনার সাফল্য প্রথমটায় দেখা দিল মাদ্রাজ থেকে। নিবেদিতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে লিখল—

…"মনে হয়, নতুন করে যেন স্বামিজীর প্রতিটি কথার অর্থ বুঝতে পারছি। সেইসঙ্গে অনুভব করছি যে, দশ হাজার বিবেকানন্দের কথা স্বামিজী সব সময় বলতেন, সেই দশ হাজার বিবেকানন্দ আমিই গড়ে তুলতে পারি। তিনি যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝে রামকৃষ্ণ-সংঘ গড়ে গিয়েছেন, আমিও তেমনি তাঁর মনের কথা বুঝেছি, যা তিনি নিজেও হয়তো বুঝতেন না। আমার কাজ একদল ছেলেকে ছ'মাস কাছে রেখে তারপর ছ মাসের জন্য পর্যটনে পাঠিয়ে দেওয়া, আবার ছ'মাসের জন্য পড়াশোনায় বসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি……"

এ পরিকল্পনাটা পেশ করল নিবেদিতা স্বামিজীর অনুগত ব্রহ্মানন্দের কাছে। একটা বাড়ি চাই তো। বলল তাকে নিবেদিতা, "যে শক্তি স্বামিজীকে সৃষ্টি করেছে তারই প্রসাদেজুটে যাবে আমার টাকা।"

একটা অখণ্ড বিশ্বাসের 'পর নির্ভর করে নিবেদিতা কর্মের ফেনিলে নেমে গেল।

নিবেদিতার এই আদর্শটির বাস্তব প্রকাশ ঘটেছিল সতীশ মুখুজ্জের 'দি ডন' নামক ছাত্র সংগঠনটির মাধ্যমে। মুখুজ্জে গড়ে তুললেন 'ডন সমিতি।' ছিল তাঁর একটি কাগজ। তারও নাম দেওয়া হ'ল 'ডন'।

'ডন সোসাইটি' দেশের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। নিবেদিতাও এই সোসাইটির একজন হয়ে উঠল।

এ ব্যাপারে নিবেদিতাকে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়েছে। একদিন এক চেলা শুধাল "স্বাধীনতা আর কতদূর?"

নিবেদিতা বলল, "তরুণ ভারত স্বাধীনতার জন্য পাল্লা দিয়ে ছুটবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অবশ্য এখনও ছোটা শুরু হয়নি।"

নিবেদিতার ভারতাত্মার মর্মমূলের বাণী ছড়িয়ে দিতে লাগল দিকে দিকে। অমুক্ত দেশের বুকে একটা প্রচণ্ড আগ্নেয় বিস্ফোরণের দরকার। ছেলেরা জাগলে সে স্বপ্ন তার সার্থক হবে। ঝিমান যুগের বুকে আসবে ঝঞ্ঝার তরিৎ-প্রবাহ। তাই তো নিবেদিতা যুগ ও জীবনকে আহ্বান করল বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে, "ব্রহ্মচারী ছেলে দরকার। কিন্তু যাদের আদর্শ নৈষ্কর্ম্য তাদের চাইনা। আমি চাই তোমরা কর্মী হবে, জীবন-যুদ্ধে মুখ না ফিরিয়ে সব রকম অভিজ্ঞতায় পোক্ত হবে। তোমাদের ব্রহ্মচর্য হবে ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মচয। অনুরাগ-বিরাগের দ্বন্দ্ব তোমাদের থাকবে না। এমন মানুষ চাই যারা জড় বাস্তবের সামনে তালঠুকে দাঁড়াতে পারে. আত্মবিসর্জনের মাঝেই রুদ্রের দক্ষিণ মুখকে দেখতে পায়। তোমাদের আরাধ্যা দেবী ভারতমাতা। মন্দিরের বেদিমূলে ফুল-পাতা সাজিয়ে আর ধূপধূনা জ্বলিয়ে তাঁকে পাবে না। তিনি আছেন দুর্ভিক্ষের হাহাকারে, দারিদ্র্যের তাড়নায়। তোমার আত্মাহুতিতেই তাঁর আবির্ভাব।"

মাঝে মাঝে নিবেদিতা বলত, "প্রকৃত ভারতকে যদি চিনতে চাও, আকবর আর আশোকের মত স্বপ্ন-বিভোর হও। বই পড়ে শেখা যায় না দেশপ্রেম। এ প্রেম আবিষ্ট করে রাখে সমস্ত সত্তাকে। দেহের অস্থি-মজ্জায় এ-ভালবাসা থাকা চাই। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তার অনুভব পাওয়া চাই।

১৯০৩ সনের এপ্রিলে স্বামী সদানন্দ মনের মতন ছ'টি ছেলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল উত্তর ভারতে। নিবেদিতা মে মাসে মেদিনীপুর এসে পরপর কয়েকটি ভাষণ দিল। পাঁচদিনে মোট তেরোটি ভাষণ তাকে দিতে হয়েছিল। একটা চিঠিতে লিখল নিবেদিতা—

"……এ ধরণের কিছু করতে পারলে খানিকটা কাজ হয় বটে।…তবে আমার কথা ঠিকমত ছেলেরা বুঝতে পারে না। ওদের মাথায় সব ঢোকে না। সবরকম চেষ্টা করে দেখেছি। কিন্তু এও দেখছি, অপরের মুখ দিয়ে যখন কথা বলতে যাই, আমার বক্তব্যের চেহারাটা অন্য রকম হয়ে যায়। যে প্রচণ্ড প্রাণের দোলা অন্তরে অনুভব করছি, ভেবেছিলাম তা দিয়ে দুনিয়া উল্টে দেব। কিন্তু হায়রে, বাতাসে আমার আকুল কান্না ছড়িয়ে দিয়ে গেলাম, সে কান্না বাতাসের বুকেই গুমরে উঠল শুধু।……একটা বিরাট কিছু করতে চাই, নিদেন একটা চরম আত্মবিসর্জন।"

১৯০৩ সন।

জানুয়ারী মাস। ভারতবর্ষের বড়লাট তখন লর্ড কার্জন। অত্যাচারী শাসক। সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য। বাঙলার ওপর তাব চিরদিনের আরক্ত দৃষ্টি। এবারে তা চরিতার্থ করবার জন্য হয়ে উঠল বদ্ধপরিকর।

শিক্ষিত জন সাধারণের মধ্যে আনতে চাইল একটা বিভেদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় মিথ্যা ভাষণের দায়ে বাঙালীকে করল অভিযুক্ত। আনল 'ইউনিভার্সিটি বিল'। বিলটির সারমর্ম হচ্ছে হিন্দু ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

আগুন জ্বলে উঠল।

প্রতিবাদের কণ্ঠ উঠল গর্জে। বাঙলার তরুণ সম্প্রদায়ের অগ্রে এসে দাঁড়াল নিবেদিতা। লর্ড কার্জনকে সরাসরি পাঠাল একটা প্রতিবাদ লিপি। ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলো এ ব্যাপারে হাত মিলিয়ে দিল নিবেদিতার সঙ্গে। নিবেদিতা লিখল, "ভারতের 'পর অনেক অবিচার হচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে মনে জ্বালা ধরে এই ভেবে যে ভারতের ভারত হওয়ার অধিকার ওরা কেড়ে নিয়েছে। নিজের জন্য নিজে ভাবতে পায় না এ দেশ। কিছু জানবার অধিকারও তার নেই। আমার এই নালিশই সবার বাড়া। এ দেশের অন্ন চাই, সুবিচার চাই, আরও কতকিছু চাই। এসব দাবির কথা ভাবতে গেলেও মন আগুন হয়ে ওঠে, কিন্তু ঐ এক বেদনায় আর সব দুঃখ ছোট হয়ে যায়।" ১৯০৩ এর ২৮শে জানুয়ারীতে পত্রটা লিখল নিবেদিতা। আসমুদ্র হিমাচলে একটা প্রকম্পন জাগল। কাগজে কাগজে লিখে চলল নিবেদিতা। এবারে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়ে গেল সে। দেশের ছায়া মন্থর নির্জীবতাকে সজীব ও প্রাণবন্ত করবার দায় যে তারই। স্বামিজীর কাছ থেকে এই শিক্ষাই নিবেদিতা পেয়েছিল। বেনামে নানা কাগজে লিখতে লাগল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। দেশের আত্মায় ধরিয়ে দিল আগুন। বক্তৃতা ও লেখা দিয়ে যে অর্থ আসতে

লাগল তা নিবেদিতা স্কুল ও দেশের কাজে ব্যয় করতে লাগল। পুলিশের নজর কাগজগুলো এড়াতে পারল না। 'স্টেট্স্‌ম্যান' পড়ল পুলিসের দৃষ্টিতে। দুর্ভোগ ভুগতে হলো নিবেদিতার সম্পাদক বন্ধু মিঃ র‍্যাটক্লিফ্‌কে। কারণ নিবেদিতার লেখা 'দি ভাইস্‌রয় এণ্ড দি পার্টিসন কোশ্চেন।' যদিও ছদ্ম নামে লেখাটি প্রকাশ হয়েছিল, কিন্তু সে ছদ্মনাম-ধারিণী ভক্স্‌ ইগ্‌নোটা' যে কে তা পুলিস সহজেই বুঝে নিয়েছিল। ফলে র‍্যাটক্লিফের দুর্ভোগ হয়েছিল। নিবেদিতার বন্ধু ছিলেন 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ। অরবিন্দ ঘোষের সহকর্মী মতিলাল নিবেদিতাকে তার স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য 'অমৃতবাজারের' পাতাগুলো খুলে ধরলেন। বৈষ্ণব মতিলাল আর শৈব-যোগিনী নিবেদিতা, দুজনার মধ্যে গড়ে উঠল গভীর অন্তরঙ্গতা।

'রিভিউ অব্‌ রিভিউজ' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গেও ছিল নিবেদিতার বন্ধুত্ব। সম্পাদক মিঃ স্টেড এর পরামর্শমত একটি কাগজ প্রকাশ করতে নিবেদিতার খুবই ইচ্ছা ছিল। সেপ্টেম্বর মাসে একটা খবর এলো।

কি খবর ?

উত্তর ভারতের মুসলমান অঞ্চলগুলো থেকে আয়োজন করা হয়েছে 'জাতীয় মহাসভার'। নিবেদিতাকে সেখানে যেতে হবে।

নিবেদিতা রওনা হলো ক্রিস্টমাসের পরেই।

শুরু হয়েছে কংগ্রেসের অধিবেশন। সবাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে নিবেদিতার পানে। নিবেদিতা গোখ্‌লের পক্ষ সমর্থন করল বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে। লিখল গোখ্‌লেকে, "সেদিন বড়লাটকে পুরুষের মত যে কথা শুনিয়েছ তার জন্য তোমায় অভিনন্দন জানাই। পরিষদে যতই আমরা প্যান্‌পেনে মানুষ পাঠাচ্ছি, ততই তোমার শক্তিসামর্থ্যের উপর বেশী করে নির্ভর করতে হচ্ছে। এখনও অনেক বোঝবার শক্তি রাখ তুমি, এ যে আমার কতখানি আশ্বাস! ঝাণ্ডা যতক্ষণ তোমার হাতে রয়েছে, কোনমতেই তা যেন নুয়ে না পড়ে। তোমার মতে আজ পরস্পরের মুখে এই একটি প্রশ্নই মানায়, "প্রহরী, দেখ দেখি, রাত কত আর ?" আর আমি মনে করি, ভোর যে হবেই সব সময় এইটি স্মরণ রাখলেই আমাদের জোর বাড়বে। যাক, দুয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নয়।" (২২শে ডিসেম্বর, ১৯০৩ এবং ৯ই এপ্রিল, ১৯০৪-এর পত্র)

একটা সপ্তাহ কেটে গেল। এবারে আর একটা ভাষণ তাকে দিতে হবে মুসলমান শ্রোতৃবর্গের কাছে। চলে এলো নিবেদিতা বাঁকিপুরে। সঙ্গে স্বামী

সদানন্দও রয়েছে। এমনি দিনে গোপালের মা আর স্বামী ব্রহ্মানন্দ পাঠালেন আশীর্বাদ। নিবেদিতা আনন্দে আত্মহারা। "এবারে আমি মায়ের চাপরাস পেয়েছি, তাঁরই আমি বার্তাবহ।......সারা ভারত চষে ফেলব আমি, মর্মের গভীর হতে গভীরে নিখাত হবে আমার লাঙলের ফলা। কেমন হবে আমার বহিঃপ্রকাশ? সে কি নেপথ্যোচ্চারিত নিঃশব্দ দৈববাণীর মত, না নগরে নগরে ছড়িয়ে-পড়া দৃঢ়বীর্য ক্ষত্রবীরের রণহুঙ্কারের মত? ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। কিন্তু বিধাতার বরে আর আমার এই সবল দক্ষিণ বাহুর আশ্বাসে এ জোর আমি পেয়েছি যে, প্রতীচ্যবাসীদের মত ছিনিমিনিতে আমার প্রাণশক্তি আমি খোয়াব না। আমি জানি, ভারতই আমার সাধনা আর সিদ্ধি দুই......আর কারও কথা আমি বলতে পারি না।"

১৯০৪ সন। নিবেদিতা স্বামীজির দেওয়া 'শক্তিযোগ আর অখণ্ড ভারত' এই মন্ত্র নিয়ে কর্মের ফেনিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দীক্ষা বার্ষিকীতে লিখল নিবেদিতা —"ছ' বছর আগে আমাকে নিবেদিতা নামটি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সেবায় এ নাম যেন সার্থক হয়। তাছাড়া গুরু বলে রেখেছেন, বিয়াল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশের মধ্যে আমি মরব। এখন আমার ছত্রিশ। কাজেহ ধরে রেখেছি, একটা পালা আমি পুর্ণভাবেই দেখে বিদায় নেব। মনে হয় ১৯১২ সন আমার মৃত্যুবর্ষ। কিন্তু যুম, এই কয় বছরে ভারতের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে কি? এতটুকুও যে স্বামীজির কাজে লেগেছি এ দেখবার সৌভাগ্য আমার হবে কি?......তার দায় মাথায় নিয়ে পৃথিবীর বুকে রয়েছি আমি, তাই তাঁর বিরাট প্রাণ মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ হয়ে চলে গেলে, এটুকু যদি অনুভব করতে পারি—সেই আমার নিত্যকালের স্বর্গসুখ। মুক্তির জন্য থোড়াই পরোয়া করি। তিনি আমার পতিতপাবন প্রেমের ঠাকুর—এভাবে তাঁকে আমি চাই না। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কি ছিল, সে কথা মনে পড়ে না। আমি কেবল চাই তার সমস্ত দায় মাথা পেতে গ্রহণ করতে আর তাঁকে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের অবসর দিতে। ওঃ! যাঁর সম্বন্ধে এমন করে কেউ স্বপ্ন দেখে আর এও জানে সে স্বপ্ন মিথ্যা নয়, সে মানুষ কী।" (১৭ই মার্চ, ১৯০৫)

বারশ' শ্রোতার সামনে ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ সনে কলকাতার টাউন হলে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা বলেছিল, "গত পঞ্চাশ বছরে সমাজ সংস্কারের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে একদল লোক দেবাবিষ্টের মত দেখা দিয়েছে, এটা হল প্রথম পর্ব। তারপর, আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্নে পাগল হয়ে সেইদিকে ছুটেছে মানুষ। তৃতীয়তঃ, ধর্মজগতে নতুন করে সাড়া এসেছে নানাভাবে। ভারতের মূল ভাবনা অবশ্য

আধ্যাত্মিক। কিন্তু ন্যাসানালিটি কথাটার বিপুল ব্যঞ্জনা হৃদয়নাম করলে তবেই পূর্ণসিদ্ধি আসবে। এ সত্যটা ধরতে না পারলে কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। যে সব আচার-বিচারে মানুষে মানুষে ভেদ ঘটে, ধর্ম তার মধ্যে নাই। আজ সবার আগে চাই সংঘশক্তি। সেই ধর্মই ধর্ম যাতে জাতির প্রাণ-শক্তি জেগে ওঠে।"

সর্বক্ষণের জন্য নিবেদিতার মনের আকাশে একটা প্রশ্ন সজাগ থাকত—"স্বামিজী আমার কাজে খুশী হয়েছেন কি?"

প্রতিটি চিন্তা, কর্ম ও ছন্দে যাঁর মন্ত্র সঞ্চার, তাঁকে জীবনের সঙ্গে একীভূত করে নিয়েছিল নিবেদিতা। দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিনিয়ত ভেবেছে স্বামীজির কথা। তাঁর স্বপ্নের ভারত গড়ে তুলতে সে কত না প্রচেষ্টা। এক বন্ধুকে লিখল নিবেদিতা, "তাঁর মত আমিও একলা কাজ করতেই আনন্দ পাই। সারা জীবন তিনি মানুষ খুঁজে ফিরেছেন। জানতেন না, যে আদর্শের জন্য তিনি প্রাণপাত করে গেলেন সে আদর্শ রূপ ধরবে তাঁর জীবনে যবনিকা পড়লেই। আজ সে আদর্শ দশের সামনে পরিস্ফুট। মানুষ এখন তাদের ভিতরের তাগিদে কাজ করতে আসছে। আর বাইরের কারও প্রয়োজন নাই। চুম্বকের মত লোহার কণাগুলোকে একমুখী করছেন তিনি।·· ···তাঁর হৃদয় যে কত বড় সে আমার কল্পনাতীত। আজ শুধু এইটুকুই জানতে চাই যে তাঁর ইচ্ছাই আমার জীবনে পূর্ণ হতে চলেছে, তাঁর আশীর্বাদ আর প্রসাদের অমৃত ধারায় সিঞ্চিত হচ্ছে এ জীবন। অথচ আমার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তার সঙ্গে এখনকার সব কিছুর কী যে গরমিল! দেখতে গেলে অনেক ব্যাপারে তিনি যেটি করতে আমায় নিষেধ করেছিলেন, আমি ঠিক সেইটি করেছি।······

সঙ্কট সাগর পাড়ি দিয়ে হাজারো বিপদের ঢেউ কেটে কেটে বন্দরে পৌছবার কম্পাস আমার একটিই—সে আমার মর্মবেদনা, অন্তরের জ্বালা।"

এ যেন অবসাদক্লিষ্ট অন্তরের অভিব্যক্তি। সাগর-পারে বসে আজ যেন অনন্ত পারাবারের পানে তাকিয়ে আছে নিবেদিতা। মনে পড়ছে পেছনের দিনগুলো। সে যে কত বেদনাবহ। কত দহনভস্ম তা কেবল নিবেদিতাই জানে।

নিজের স্বভাবের গরমিল নিয়ে মাঝে মাঝে ক্রিস্টিনার সঙ্গে আলোচনা করত নিবেদিতা। কথা বলতে বলতে কখনো হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠত ওরা দুজনেই। আবার কখনো বা বেদনায় ওদের মুখ কালো হয়ে যেত। একদিন নিবেদিতা বলছিল, "কখনো ভাবতাম লেখাপড়া, ভাবনা-চিন্তা, সব ছেড়ে দিয়ে কোন মঠের ঝি হব।

বাসন ধোব, শাকের খেত করব আর সব সময় ঠাকুরের কথা ভাবব। আবার কখনো ভাবতাম, না না, রানী হব। সম্রাজ্ঞীর যা-কিছু ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি আর দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা—সব বইব অকাতরে।"

স্বামীজির তিরোধানের পরে নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীমার এই প্রথম দেখা। দীর্ঘদিন দেশে ছিলেন। ফিরেছেন বাগবাজারে।

আহা কি শরীর হয়ে গেছে! নিবেদিতা যেন তাকাতে পারে না। পুত্রশোকে আহত মাতৃহৃদয়ের সমস্ত বেদনা যেন বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

নিবেদিতা লিখল, "শ্রীমা এখানে এসেছেন ; শরীর একেবারে ক্ষয়ে গেছে। এত রোগা আর ছোট্ট আর এমন কালো হয়ে গেছেন—বোধ হয় গ্রামে থেকে ওখানকার কষ্টে। কিন্তু সেই দৃষ্টির স্বচ্ছতা, সেই মহিমা আর মাতৃত্ব আগের মতই আছে। আহা ওঁকে কত আরামে রাখতে সাধ জাগে! নরম একটি বালিশ, ছোট্ট একটা আলমারি। আরও কত কি ওঁর দরকার। এত ভিড় ওঁর চারিদিকে। লোকজন সব সময় ঘিরে আছে······"

আহা কি সোহাগ! নিবেদিতার মুখখানা ধরে আদর করেন শ্রীমা। চিবুক ধরে চুমু খান। কত কথা জিজ্ঞেস করেন। মনের কথা টেনে আনেন শ্রীমা। নিবেদিতা চুপ করে থাকে। কাছে ডেকে একদিন বলেন শ্রীমা নিবেদিতাকে—

"দেখ মা, ক'দিন হল তোমায় দেখলাম, তোমার পরণে গেরুয়া···আমি তোমায় সন্ন্যাস দিতে প্রস্তুত।"

অপলক তাকিয়ে থাকে নিবেদিতা। সমস্ত দেহমন তার থর থর করে কেঁপে ওঠে। আড়ষ্ট কণ্ঠে বলে, "ও আমি চাই না।"

শ্রীমার চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে নিবেদিতা। মাথায় হাত রাখেন শ্রীমা। গুরুর দেওয়া শক্তিতেই সে কর্মসমুদ্রটা পাড়ি দিয়ে এগিয়ে যাবে। না, আর কিছু চাই না তার। এই তার ঢের ভালো।

"স্বামীজি প্রকাশ্যে আমায় একটি মাত্র ব্রত দিয়ে গেছেন, সে আমার ব্রহ্মচর্য। আমরণ এ-ব্রত আমায় রক্ষা করতে হবে। কারও সঙ্গ না করা, সব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে দেওয়া আর মানুষের সঙ্গে আত্মীয় জ্ঞানে স্নেহ-প্রীতির সুরে কথা না কওয়া—এই হল মহাজনের পন্থা। এ নিয়ম মেনে চলতে পারি নি। কিন্তু এ করেও আমি তাঁরই কাজ করেছি কিনা। সে জবাব তিনিই শুধু দিতে পারেন। আমি জানি তিনি তা দেবেনও। জানি আমি ঠিক করেছি। সবার তাতে মঙ্গলই হবে। কোনো দিন আমার বে আইনী কাজেরও আইন খুঁজে বার করব···"

স্বামীজি নিবেদিতাকে বললেন "সব সময় জপ করবে 'শিব! শিব! শিব!' ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিলে চলবে না। সব মন্ত্রের সেরা এ মন্ত্র। পথের যত বাধা এ মন্ত্রের তেজে ছাই হয়ে যাবে...এখন বুঝতে পারছ না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাজ হচ্ছে, একদিন এর ফল ফলবেই..."

নিবেদিতার দু'চোখে জল আসে। অন্তর উজাড় করে উচ্চারিত হয়, "ওগো, তীর্থ-পরিক্রমা তার শেষ হল...শিব আছেন আমারই অন্তরে।"

১৯০৫ এর এপ্রিলে হঠাৎ নিবেদিতা পড়ল অসুস্থ হয়ে। প্রাণসংশয় পীড়া। সে কি জ্বর। গা পুড়ে যাচ্ছে। ডাক্তার বললে টাইফয়েড। মহা ভাবনায় পড়লেন সকলে। বুঝিবা বাঁচবার আশা নেই। ক্রিস্টিনা প্রাণ দিয়ে সেবা করে। শ্রীমা বসে থাকেন নিবেদিতার মাথার কাছে। কিন্তু রোগের প্রকোপে তাঁকেও চিনতে পারে না নিবেদিতা।

কিন্তু এভাবে এই বদ্ধ ঘরে থাকলে প্রাণ সত্যই থাকবে না। নিবেদিতাকে ওখান থেকে নিয়ে আসা হলো জগদীশবাবুর বাড়ির পাশে। এখানে আলো আছে। বাতাস আছে। ডাক্তার নীলরতন সরকার চিকিৎসা করছেন। চব্বিশ ঘণ্টা নার্স রইল অতন্দ্রিত প্রহরীর মত জেগে। সারাটা বাড়ি নিদ্রাহীন রজনীতে জেগে রইল।

পুরো ত্রিশটা দিন ভুগে কঙ্কালপ্রায় হয়ে গেল নিবেদিতা। জ্বর বিদায় নিল।

এবারে দীর্ঘ বিশ্রামের দরকার। ওদিকে বাগবাজারে আবার লেগেছে প্লেগ। স্কুলের দুয়ার বন্ধ। পাড়াগুলো থমথম করছে। অবশ্য এসব সংবাদ নিবেদিতার কানে তোলা হ'ল না।

নিবেদিতাকে নিয়ে বসু-দম্পতী চলে এলো দার্জিলিঙ। ভগ্ন দেহটা নিয়ে নিবেদিতা শয্যা আঁকড়ে পড়ে থাকে। লেখে বান্ধবীদের কাছে পত্র, "গুরুই কি আমার কাছে চরম সত্য?......স্বামিজীর সঙ্গে প্রথম যখন দেখা হয় তখন একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কুসংস্কারগুলোর সত্যতা যাচাই করা, ওগুলোর দাম কি সেটা জেনে নেওয়া। অন্যেরা তাঁর কাছে হয়তো পেয়েছে তত্ত্বজ্ঞান। আমার মন বলে "যত মত তত পথ"। এ কি করে সম্ভব সেইটি বুঝে নেওয়াই আমার কাজ। মানুষের যে কোনও বিশ্বাস যে মিথ্যা, এ-বিষয়ে তখন আমি একেবারে দৃঢ়নিশ্চয়। ভাবতাম এ-ধারণা কখনও ছাড়তে পারব না। অথচ আমার গুরুগত প্রাণ বলত, এ কেবল আধখানা সত্য। সংশয়ের কী দোলাতেই না দুলেছি। তারপর

শুনলাম তাঁর বাণী।……জরের মধ্যে আশ্চর্য সব দেখছি, আশ্চর্য ভাবনা ভেবেছি। ভারতে এই প্রথম একজন পুরুষ একটি মেয়েকে হাতে ধরে তাঁর ব্রতের উত্তরাধিকার দিয়ে গেলেন। যাক্ সে কথা। এখন কেবল আগামী দিনের নিরুদ্বেগ শান্তি আর বিশ্রামটাই চোখে পড়ছে, বিশেষ কোনও কাজে আর লাগব বলে মনে হচ্ছে না…”

দিনগুলো যেন নিবেদিতার শেষ হয়ে এসেছে বলে মনে হতো। একটা উদাস মন ছুটে যেতে চাইত অসীমের লীলা পথে। তবুও তার মাঝে বসুকে নানাভাবে সাহায্য করে যাবার বিরতি নেই। খোকা তার স্নেহের পাত্র। তার বই লেখা থেকে চিন্তার জগৎ পর্যন্ত নিবেদিতা চলেছে খোকার পাশে পাশে। আবার মাঝে মাঝে দ্বন্দ্বও দেখা দিত দুজনার মধ্যে। বসুজায়া তো ভয় পেয়েই যেত। সেভিয়ার তাদের ঠাণ্ডা করত চা পরিবেশন করে। বসুর জীবন বিকাশের পথে নিবেদিতা যে কতখানি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে তার বাস্তব প্রমাণ পাই আমরা তার নিজেরই লেখা চিঠি থেকে। বান্ধবীকে লিখল নিবেদিতা, “খোকার উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কিত বইখানার জন্য অমানুষিক খাটুনি গেছে আমাদের দু'জনের। এবার আস্তে আস্তে কাজ শেষ করে আসছি। দুজনে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এক বছর ধরে ক্রমাগত এই কাজ চলেছে কিনা। কিন্তু কাজ যা হল তা নিয়ে কুড়ি বছর আত্মপ্রসাদ আর আনন্দ ভোগ করা চলে। স্বামিজী বলতেন, নির্গুণ অদ্বৈততত্ত্বের কথা। তাঁর মুখে শুনেছিলাম, সমস্ত জ্ঞানের উৎস অন্তরে। শুনে মনে মনে বলেছিলাম, বেশ তো, তাহলে বিজ্ঞান এর প্রমাণ দিক। কেবল বৈজ্ঞানিক প্রমাণেই কথাটা বিশ্বাস করা চলে।…আজ পাঁচ বছর ধরে খোকাকে সাহায্য করতে গিয়ে কেবলই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর নজর রেখে চলেছি, বিজ্ঞানের মাধ্যমে অদ্বৈততত্ত্ব-স্থাপনের কাজেই সহযোগিতা করছি। ওয়াহ গুরুজীকী ফতহ। অন্যেরা যেখানে অকৃতকার্য হয়, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক যে সেক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেন, তার কারণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য।”

ঠিক এমনি দিনে নিবেদিতার কানে ভেসে এলো একটা দুঃসংবাদ। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করবার প্রস্তাব এনেছে বিদেশী বেনীয়া। গড়বে দুটো স্বতন্ত্র প্রদেশ। বিভেদের পাচিল দাঁড় করিয়ে মানুষের সংহতি ও ঐক্যের মূলে—হানবে প্রবল আঘাত।

চারিদিক থেকে প্রতিবাদের কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল। বাঙলার শিক্ষিত সমাজ জানাল প্রতিবাদ। বিক্ষোভের পায়তাড়া চলতে লাগল। এই নিদারুণ প্রস্তাবের

বিরুদ্ধে সারাটা দেশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সংগ্রামের পদতাড়নায় জনতা আত্মাহুতি দেবার জন্ত এগিয়ে এলো। বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারিত হল—বন্দে মাতরম্।

আবার কাজ। বসে থাকবার মত বিশ্রাম নিবেদিতা পাবে না। কাজ করতে করতেই তাকে শেষের দিনটি অবধি যেতে হবে। নিজের মধ্যে নিজেই অনুভব করে অমেয় শক্তি। লেখে—"যতই দিন যাচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে আমি মেয়ের ছদ্মবেশে পুরুষ।"

তখনও নিবেদিতা দার্জিলিঙে। কিন্তু এদিকে চালু হল বঙ্গভঙ্গ আইন। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর অভিশাপ নেমে এলো গঙ্গা-হৃদি বঙ্গভূমির শিরতীর্থে। নেমে এলো সর্বত্র—একটা গভীর বিষাদ।

বাঙালীর ঘরে ঘরে বেদনার ঝড় জাগল। সেদিন তারা কেউ রান্নাঘরে ঢুকল না। কেউ দোকান, বাজারের দুয়ার খুলল না। উপবাসের মধ্য দিয়ে মহা সংগ্রামের সংযম উদ্‌যাপিত করল।

দার্জিলিঙে সভা হল। বক্তৃতা দিল দেশবন্ধু আর নিবেদিতা। নিবেদিতা গভীর বেদনায় বক্ষে করাঘাত করে অশ্রুসজল নয়নে বলল, "ঠিক আমার জন্মভূমিকে, বাঙালীর বুকে এই যে বেদনার প্রাচীর তুলে সে দেশকে অপমান করছে, ভারতবাসীর শৌর্য আর আত্মত্যাগ যতদিন তাকে তা তুলে নিতে বাধ্য না করে, আমরা চালিয়ে যাবই এ সংগ্রাম।"

সভাভঙ্গের আগে সবাই ডান হাত তুলে ধরল। তাদের মণিবন্ধে বাঁধা হল রাখী। এই মিলন বন্ধনই বাঙ্গালীর অন্তরকে ঐক্যের মহান যজ্ঞ উদ্‌যাপনের প্রেরণা জোগাল। সারাটা দেশ দুর্জয় সংকল্পে এক হয়ে দাঁড়াল। আনন্দমোহনের বাড়িতে লোক জমায়েত হলো—তাঁর দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন বাঙলাকে গ্রথিত করবার। কতবার তিনি হিন্দুদের বলেছেন—তোমরা এক হও, এক হও।

আজ তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য। তা হোক, তবুও কলকাতার মানুষ সেই বৃদ্ধের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করল না। তাদের অন্তরে আজ জেগেছে মুক্তির নেশা। আগুন জ্বলছে আত্মার আকাশে। আর কি ঘরে থাকা যায়! এই তো লগন। এই তো সংগ্রামের স্বাধীনতার পূজা আয়োজন। নেতারা ঘোষণা করলেন—স্বরাজ চাই। সঙ্গে সঙ্গে হাজারো হাজারো লাখো লাখো কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো—স্বরাজ চাই! স্বরাজ চাই!

এই উত্তাল সমুদ্র-সংক্ষোভে বাঙলার কবি রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক হে ভগবান!
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন
এক হউক, এক হউক
এক হউক হে ভগবান!

'বন্দেমাতরম্' বে আইনী। শোভাযাত্রা, সভা কিছুই করা চলবে না। সান্ধ্য আইন, পুলিসের লাঠি, অত্যাচার দেশের বুকে বজ্রসম্পাত ঘটাল।

নিবেদিতা আর পারলো না নিজেকে ধরে রাখতে। চলে এলো কলকাতায়। বন্ধুরা গিয়ে উপস্থিত হলো দেখা করতে। নিবেদিতা আবেগ-দৃঢ় কণ্ঠে শুধু বলল, "বুক বাঁধ! তৈরী থাকতে হবে।"

চতুর্দিকে ধর্মঘটের ধূম পড়ে গেল। সবাই একজোটে দাঁড়াল। লর্ড কার্জন এই অপকর্মটি করে দিয়ে কৌশলে পালিয়ে বাঁচল।

গোখেলও লণ্ডন থেকে এই সময় ফিরেছিল কলকাতায়। নিবেদিতা তার সঙ্গে দেখা করল। কিন্তু গোখেল আবার হঠাৎ লণ্ডনে চলে গেল। কিন্তু দেশের লোকের একটা বড় কিছু প্রত্যাশা ছিল তার কাছে। তারা এবারে উল্‌টো সমালোচনা শুরু করে দিল। দলের অবস্থাটা একটু খারাপই হয়ে গেল গোখেলের অনুপস্থিতিতে।

নিবেদিতা একটা চিঠি লিখল গোখেলের কাছে, "এখানে একটা গুজব রটেছে। কর্তৃপক্ষ বলছেন, তুমি নাকি বঙ্গবিচ্ছেদের স্বপক্ষেই মত দিয়েছ। আমরা অবশ্য জানি, একথা সত্য নয়। কিন্তু এ গুজবে লোকের মন এত বিগড়ে গেছে যে তোমার স্বাক্ষরিত একটা সুস্পষ্ট প্রতিবাদ বেরলে খুব কাজ হত। কাউন্সিলের কোনও ইওরোপীয়ান সদস্য কি তোমার মতামত চেয়েছিল? তখন কি তুমি এমন কিছু বলেছ যার ভুল অর্থ করা হয়েছে? যদি বলেও থাক, তবুও দেশবাসীর স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে তাদের মতটাই যে চূড়ান্ত, একথা লেখবার পথ তোমার খোলাই আছে।......

"সারা দেশে এমন কি মেয়ে-মহলেও বিলাতী বর্জনের ধূম পড়ে গেছে। দেশের লোক যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করছে তা একেবারে অসাধারণ। স্বাজাত্যবোধের

প্রবল উদ্দীপনায় অখ্যাত সাধারণ লোকও যে ছোটখাট মহত্ত্বের পরিচয় দিচ্ছে, আমার মতে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে।......রুশবাসীর এমনি তেজেই নেপোলিয়ানের মতো অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। এমনি করেই স্বাধীন হয়েছিল আমেরিকা।...... কয়েকমাস আগে ঠিক এই জিনিসটাই আমাদের ছিল না। আজ চারদিকে এর চিহ্ন দেখছি।......খরিদ্দার কোনও বিলাতী মাল চাইলে সাধারণ একজন বিক্রেতাও তাকে তিরস্কার করছে।"

বারানসী কংগ্রেস বসবার পূর্বে কাগজে কাগজে লিখল নিবেদিতা—"কংগ্রেসের আসল কাজ কি? সদস্যদের নতুনভাবে নতুন চিন্তায় অভ্যস্ত করাই তার আসল কাজ, যার ফলে জাতীয়তা বোধের ভিত্তি পাকা হবে। দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ ও কর্মতৎপর করে তোলা আর হিমালয় হতে কন্যাকুমারিকা, মনিপুর হতে পারস্য-উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট যে দেশ তার অগণ্য অধিবাসীদের মনে আত্মীয়তার বোধকে উজ্জ্বল করাই মহাসভার কর্তব্য।"

কাশীতে এলো নিবেদিতা। অধিবেশন বসতে আর মাত্র তিনদিন বাকী আছে।

গোখেলও লণ্ডন থেকে ফিরে এলো। মহা ধূম পড়ে গেল।

মহাসভার সভাপতিত্ব করল গোখেল। রবীন্দ্রনাথ উঠে বন্দে মাতরম্ গাইবার পরে উঠে দাঁড়াল গোখেল। ঘোষণা করল—জনতার দাবি ন্যায্য ও সংগত।

অরবিন্দ ঘোষ নেপথ্যে থেকে কাজ করতে লাগল। নরম গরম পন্থীদের ভেদ ঘুচে এলো। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশ মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখল। চলল অহিংসা সংগ্রাম। বারানসী কংগ্রেসের পর থেকেই নিবেদিতা সর্বজনপরিচিতা হয়ে ওঠে। দেশ যে কি সম্পদ লাভ করেছে তা বুঝতে তাদের বিলম্ব হলো না। আন্দোলনের বহ্নি-বন্যায় দেশ মেতে উঠল। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল বিপ্লবের অভিমন্ত্র। 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ'তে নিবেদিতা লিখল—"পূর্ববঙ্গে যা চলছে, সারা ভারত সে সংগ্রামের ফলাফল সাগ্রহে লক্ষ্য করছে। একটা অভাবনীয় প্রত্যাশা আর নির্যাতিতের প্রতি সহানুভূতি দেশের আকাশে আত্মায় ভাসছে। সেই সঙ্গে সংকল্পে কঠোর এই বীর ছেলেদের জন্য একটা গর্ব। স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের জন্য মুখ বুজে তারা মরণ পণ করে লড়ছে। ধীরে ধীরে সারা ভারত ও তাদের মত শক্তি সঞ্চয় করছে।"

স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ ঘর থেকে মন্দির পর্যন্ত বিস্তার লাভ করল। ছেলেরা দল বেঁধে গিয়ে দাঁড়াল দেবদেউলে। গ্রহণ করল শপথ—'স্বদেশী ছাড়া কিনব না।'

কোথাও কেউ আশাহত হয়ে পড়েছে শুনলেই মায়ের মত নিবেদিতা বলে পাঠায় তাকে, "ভেবো না, হাল ছেড় না, তোমার পিছনে আমরা আছি।"

'ডন সোসাইটি'র ছেলেদের দিয়ে একটা বিক্রয়কেন্দ্র খুলল নিবেদিতা। এ' চৌধুরী হলো তার ব্যবস্থাপক। কাজ শিখে ছেলেরা শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও কিছু কিছু দোকান খুলে ফেলল। বারীন ঘোষ যোগসূত্র রক্ষা করে চলল সদর আর মফঃস্বলের কেন্দ্রগুলির মধ্যে।

একদিন বারীন পড়ল এক মস্ত বিপদে। হাতে একটা পয়সা নেই। কিন্তু মস্ত একটা কাজের দায়িত্ব চাপান রয়েছে তার ঘাড়ের 'পর।

বেলা তখন দুপুর; খাঁ খাঁ করছে সূর্য। বারীন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলল বাগবাজারে নিবেদিতার পরামর্শ জানতে। দরজার 'পর আঘাত করল বারীন।

'কে ও?'

'তোমার বারীন। ডুবতে বসেছি। একটি পয়সা নেই হাতে। এখন কি করি বলে দাও।'

বলল নিবেদিতা বারীনের মনে বল ও সাহস জুগিয়ে—'এ জন্যে ভাবছ কেন?'

"প্রথম কথা হল 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। কাজ করতে করতে টাকা জুটে যাবে।"

খুলল নিবেদিতা একটা সাহায্য তহবিল। বিনা সুদে লোকে ওখান থেকে টাকা ধার নেবে। আবার শেষ পাইটি পর্যন্ত শোধ করে দিতে হবে এমন ব্যবস্থা করা হল।

শহরের কাজ নিয়ে নিবেদিতা ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম নিয়ে কাজ করছে। যদিও দুজনার মতের দিক থেকে সর্বত্র ঐক্য বলা যায় না। তবুও রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা এক সঙ্গেই দেশের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। বাজারে কোনো দোকানে বিলাতী মাল দেখলেই নিবেদিতার মাথায় খুন চেপে যেত। ছেলেদের সে ডেকে ডেকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে লাগল। দেশের কাজ কর। মায়ের শৃংখল মোচনের সংগ্রামে আত্মবিসর্জন দাও।

১৯০৫ সালের স্বদেশী মেলা উদ্বোধন করল তিলক। মেলা দেখে সারাটা ভারতের বুকে এসেছিল একটা সাফল্যের প্রাণ-বন্যা। নিবেদিতার আনন্দের সীমা নেই। তার স্বপ্ন আজ বাস্তব রূপ নিতে বসেছে। দেশের লোক জেগেছে। মুক্তির মন্ত্রে তারা পাগল হয়ে ছুটছে। এই তো ছিল স্বামিজীর আশা।

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল আন্দোলনে খর তরঙ্গ।

বিলাতী-বর্জনের ধুয়ায় মুখর হয়ে উঠল আসমুদ্র হিমাচল। আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়াল শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

বিপ্লবী দলগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। মত ও পথের দিক থেকেও নানা মুনির নানা মত। তাদের সংঘবদ্ধ না করতে পারলে বড় কাজ করা সম্ভব নয়। অরবিন্দ এ সত্য উপলব্ধি করল গোড়াতেই। তাই একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল অরবিন্দ। এ সমিতির সদস্য মাত্র পাঁচজন। বিপ্লবী নেতা ব্যারিষ্টার পি. মিত্র, অরবিন্দ, যতীন বাঁড়ুজ্জে, সি. আর. দাশ এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চলতে লাগল সমিতির কাজকর্ম গোপনে গোপনে। নিবেদিতারও বিরাম নেই। প্রকাশ্য আন্দোলনে সেও অংশ গ্রহণ করেছে। প্রেসের সঙ্গে রক্ষা করে চলেছে যোগ-বন্ধন। অরবিন্দ নিল ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষের পদ। কিন্তু এখানেই সীমিত রইল না তার কর্ম। অধ্যক্ষের দায় ও দায়িত্ব থেকেও অনেকদূর বিস্তৃত হল তার কর্মপ্রবাহ। বাঙলা তথা ভারত অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুণে চলল সেই সংগ্রাম-সাফল্যের। অরবিন্দের কাছে দেশ শুধু কেবল সীমা-চিহ্নিত একটা ভৌগোলিক মৃৎ-খণ্ড নয়—এই তার আরাধ্যা দেবী। সাক্ষাৎ জননী। তার চোখে জল। বক্ষে হাহাকার। মা উপবাসী। লাঞ্ছিতা। তাকে যদি না শৃংখলমুক্ত করতে পারে তবে সে জীবন বিসর্জন দেবে।

কিন্তু এত বড় কাজ তো আর বিনা প্রস্তুতিতে সম্ভব নয়। তাই স্বদেশে, বিদেশে বিপ্লবের বীজ বুনে চলল অরবিন্দ। বিপ্লবীরা ইংলণ্ডেও জুটিয়ে নিল তাদেরই সমর্থক একটি দলকে। চরমপন্থী হিন্দুরা বলে—আমরা 'ন্যাশন্যালিষ্ট'। এ শব্দটি আইরিশ বিপ্লবের ইতিহাস থেকে জন্মলাভ করেছিল।

সরকার থেকে প্রবল চাপ এলো। এলো প্রতিরোধ। অরবিন্দ বীরদর্পে মাথা তুলে সিংহের মত দাঁড়াল। ঘোষণা করল দৈবমন্ত্র, "যতদিন জনসেবার মন্ত্রে তাঁকে আহ্বান করা না হবে, ততদিনে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বরূপে অবতীর্ণ হবেন না। জগতের অসুরশক্তি তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যুযুৎসু হয়ে—দেবতার অবতরণ অবশ্যম্ভাবী। সেই দিনই দেবশক্তি নিজের বীর্য অনুভব করবে।

এও তো শক্তিযোগ। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে দুঃখ ও নির্যাতন বরণের ব্রত। তা সবাই জানে। জেনেও দল বেঁধে ছেলেরা এলো এগিয়ে। ভারত হয়ে ওঠে বিপ্লবী।

নিবেদিতা বারাণসী থেকে সরাসরি কলকাতায় এলো না। অনেকটা ঘুরে এলো। সাঁচী আর চিতোরে গিয়ে দেখা করল কয়েকজন ধনী জমিদারের সঙ্গে। তাদের কাছ থেকে আদায় করল চাঁদা।

পথ চলতে চলতে যে সব কল্পনা ভাষা পেত, সেগুলো ছাপা হতে লাগল 'নিউ ইণ্ডিয়া'য় এবং বারীন ঘোষের পত্রিকায়। বারীন ঘোষ ও ভূপেন দত্ত মিলে 'যুগান্তর' নামে একখানা কাগজ বের করেছে। ১৯০৬ সনে যুগান্তরের যৌবন রূপ। দেখতে দেখতে কাগজখানা বিপ্লবীদের মুখপত্র হয়ে উঠল। বিক্রী হতে লাগল প্রচুর। এ সময় অরবিন্দও চালাত একখানা কাগজ। নাম—বন্দে মাতরম্।

মাদ্রাজ থেকে তিরুমলাচার্য 'বালভারত' নামক একখানা কাগজের সম্পাদিকার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য নিবেদিতাকে লিখল, "আমাদের দেশে যে মতবাদ—লোকমান্য, আমার কাগজের মাধ্যমে তাকেই তুলে ধরতে চাই। আপনি তার সম্পূর্ণ ভার নিয়ে তাকে আরও সুন্দর ও জনপ্রিয় করে তুলবেন এই আমার ইচ্ছা।"

নিবেদিতা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হল। কারণ কোনো চিহ্নিত সীমানায় আটক থাকলে পুলিস সহজেই তাকে চিনে ফেলবে। অবশ্য কাগজের দায়িত্ব না নিলেও পরোক্ষভাবে 'বালভারত' নিবেদিতা দ্বারা উপকৃতই হয়েছিল।

১৯০৬ সাল।

বিপ্লবের গতি কিছুটা মন্থর হয়ে গেল। ঝিমানো একটা ভাবপ্রকাশ বিপ্লবীদের মনকে শ্লথ করে দিল। দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যে প্রত্যেকের মধ্যেই গড়ে উঠতে লাগল এক একটি স্বতন্ত্র ভাব। ফলে বড় কাজটাই পিছু হঠে যেতে বসল। সংগ্রামের ক্ষেত্রে থেকে সরে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ। বললেন, "ভুল পথে চলেছে ভারতবর্ষ। বড় বেশী বিদেশী ধারার অনুকরণ করছে দেশ।"

রবীন্দ্রনাথের চোখে ধ্যানের ভারত জাগ্রত। এই হিংসা ও রক্তক্ষরা সংগ্রামের স্বপক্ষে তিনি কেমন করে রায় দেবেন ?

কিন্তু ফল হল বিপরীত। লোকে করল তাঁর নিন্দা। বলল কাপুরুষ।

কি হবে আর। মনের দিক থেকে নিবেদিতাও মাঝে মাঝে কেমন যেন দমে যায়। গুরুজীর কথা স্মরণে এলে নীরবে চুপটি করে বসে থাকে। রবীন্দ্রনাথের মতবাদ তো তার গুরুজীরও ছিল। হিংসা নয়—প্রেম। আত্মহত্যা নয়—আত্মত্যাগ কিন্তু সে পথ বরণীয় ও স্মরণীয় হলেও নিবেদিতা নিয়তির নির্দেশকে অলঙ্ঘনীয় বলেই ধ'রে নিয়েছিল।

কেউ এসে শুধায় নিবেদিতাকে, "ইংরেজের কাছে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবার পথ ও পন্থা কি বলুন তো ?"

নিবেদিতা জবাব দেয়, "এক্ষেত্রে ওরা যেমন লড়ত, তোমরাও তেমনি লড়। আর নির্বিকারে তার পরিণাম সহ্য করবার জন্য তৈরী থাক। তোমরা সত্যি মান চাও কিনা, এই তার একমাত্র পরীক্ষা। তবে পরথটা কঠিন বটে।"

—"সিষ্টার, পরিণাম কি ঘটতে পারে ?"

"তা আমি জানি না।······ওসব ভাবনা আমাদের নয়। নির্ভীক হতে হবে এই হল আসল কথা। বুকের রক্ত যেন কাপুরুষতার অবসাদ ধুয়ে মুছে যায়। কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি এস না।"

জাতীয়তাবাদী নেতাদের বলল নিবেদিতা, "কেন বসে আছ ? কিসের প্রতীক্ষা তোমাদের ? কাজে লেগে যাও না। দুশমন যেমন অগুণ্তি, লড়বার কায়দাও তো তেমনি রকমারি আছে। আয়র্ল্যাণ্ডে একটা কথা আছে, "বোমা না ফাটলে ইংরেজ এক কণিকাও কিছু দেবে না।"

আবার কেউ এসে বলে নিবেদিতাকে—আমরা ভারতের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

এ ধরণের বাচালতা নিবেদিতা আদৌ পছন্দ করত না। রাগে তার চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠত। বলত নিবেদিতা, "অস্ত্র ধরতে জান ? গুলি ছুঁড়তে ? জান না। যাও তবে শিখে এসো।"

দ্বন্দ্ব দোলার অন্ধকারে সারাটা দেশ তখন ভুগছিল। একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে পথভ্রান্ত জনতার নীরবে বসে বসে ধুঁকে মরবার বিভীষিকা নিবেদিতাকে বিদ্রোহিনী করে তুলল। তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা ঘোষণা করল অগ্নিমন্ত্র। ছড়িয়ে দিল মুঠা মুঠা সূর্যের উত্তাপ। সাহারার হাহাকার।

কিন্তু কি হল তাতে ? ভুল বোঝাবুঝির পর্বটা এমন চরমে উঠল যে, কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তা বুঝবারও ক্ষমতা রইল না তাদের। ১৯০৬ সনে গোখ্‌লেকে হত্যা করবার অপচেষ্টায় এক শ্রেণীর লোক মরিয়া হয়ে পড়ল। সংবাদ শুনে নিবেদিতা বজ্রাহত হয়ে পড়ল। পাগলের মত দ্বারে দ্বারে গিয়ে শুধাতে লাগল জনে জনে, "তুমি করেছিলে এ-কাজ ?······তুমি ?······এ কী ব্যাপার। এমন করে আমাদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার সময় তো এ নয়।"

দাঁড়াতে হবে। পথ যতই দুর্গম হোক না কেন, তাকে লঙ্ঘন করতে হবেই হবে। মাথা তুলে এগিয়ে যাও। আত্মার আকাশে জ্বালিয়ে দাও হোমবহ্নি।

অশ্রুফুলের অর্ঘ্য দাও মায়ের চরণে। পথ তিনিই মুক্ত করে দেবেন। তিনিই তোমার আগে আগে চলে দেখিয়ে নিয়ে যাবেন অভিষ্ট সিদ্ধির দ্বার-প্রান্তে। "কি করে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, তার উপায় খুঁজে বার কর। বসে থেকো না। দু'পুরুষ ধরে কেবল স্বপ্নের ঘোরে দিন কাটছে। লোকে তোমাদের শ্রদ্ধা করবে এ আশা কর কি করে? চাই সত্যনিষ্ঠা, কর্তব্যজ্ঞান আর সর্বভূতে ভালবাসা। তার জন্য চাই অনিঃশেষ ও অবিচল আত্মত্যাগের বীর্য। সে ত্যাগে ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই, কোনও শর্ত নাই। আছে শুধু ব্রতচারীর নিষ্ঠা আর নিরন্তর উৎসর্গের আকৃতি। সাধনায় সিদ্ধি পেতে হলে তাঁর যন্ত্ররূপে অকুণ্ঠ বিশ্বাসের স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া চাই। উপস্থিত কাজের বাইরে অন্য কিছুর ভাবনা রাখতে নাই। আমার গুরুজী যেমন আমার বলতেন, 'পরিকল্পনা নয়, কোনও ছক কাটা নয়।"

বাঙলার গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষের হাহাকার। পূর্ববঙ্গে নেমেছে অভাবের তাণ্ডব। বরিশাল থেকে অশ্বিনীকুমার দত্ত অগ্রণী হয়ে গড়ে তুলেছে কতকগুলি সাহায্য সমিতি। নিবেদিতাকে নিয়ে গেল অশ্বিনীকুমার বরিশালে। ওখানে নিবেদিতা বক্তৃতা দিয়ে প্রচুর অর্থ তুলল। সে টাকাটা ওখানকার মৃত্যুপথযাত্রীদের সেবাতেই ব্যয় করা হল।

এমনি একটা চরম দিনে নিবেদিতা অসুস্থ হয়ে পড়ল। কলকাতা থেকে চলে এলো দমদমে আনন্দ বসুর বাগানবাড়িতে। এখানে শুয়ে শুয়ে নিবেদিতা কত কথাই না ভাবে। অতীতের স্মৃতি এসে দল বেঁধে দাঁড়ায় তার চোখের সামনে। মনে পড়ে গোপালের মা-র কথা। স্বামী স্বরূপানন্দ যেন ছায়ার মত এসে আভাসিত হয় মনের নেপথ্যে। ওদের কথা নিবেদিতা ভুলতে পারে না। একে একে সবাই মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছে। বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটে বলে নিবেদিতা, "মাগো, কি তোমার ইচ্ছা? আর কতদিন যুঝব এমন করে?"

ক্লান্ত দেহ। মনটাও যেন ক্লান্তির কোল ছুঁয়ে ঘুমিয়ে থাকতে চায়। আর কেন, এবারে লিপি পাঠাও। তোমার কাছে যাবার লিপি। "কাজের পালা সাঙ্গ এবার। ভারতের জন্য শেষ বাণীটি রেখে যাব চরম পত্রের আকারে।"

—যদি বুলের আগে মারা যাই? তাহলে কি হবে টাকা-কড়ির অবস্থা? একটা চিঠি লিখি। বুলকে লিখল নিবেদিতা, "আমার ইচ্ছা, শিল্প-প্রতিযোগিতার জন্য দেশবাসীকে বছরে হাজার পাউণ্ড দেওয়া হোক। ক্রিস্টিনকে দিয়ে গেলাম স্বামিজীর

বইয়ের আয়ে আমার যে অংশ আছে আর আমার বইয়ের যে আয় তাই, সেই সঙ্গে আরও তিন হাজার পাউণ্ড। আর এ দেশের বিজ্ঞানচর্চার জন্য খোকার হাতে দিয়ে যাব তিন হাজার পাউণ্ড……"

অনেকটা রাত জেগে রইল। ঘুম চোখে এলো না। ধ্যানের গভীরে যে অনন্ত শান্তি তার স্পর্শ অভিলাষে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। "জীবন যেন নির্মল হতে নির্মলতর হয়ে চুঁইয়ে পড়ছে তিলে তিলে। কিন্তু কই, আলো…আলো কোথায়? বাড়িটার চারধারের বাতাস যেন আজ কাঁদছে। শান্তিঃ! শান্তিঃ! আঁধার রাত। তবু ডাক শুনতে পাচ্ছি। মায়ের ডাক। আমি যাব, আমি যাব! বলি দেব নিজেকে……"

উন্মাদিনীর রণের খড়্গ হাত থেকে খসে পড়ল।

শরীর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। নিবেদিতা আবার লেখা শুরু করল। লেখার মাধ্যমে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হল নিবেদিতার। শিল্প-বিষয়ক লেখা লিখতে লাগল 'মডার্ণ রিভিউ'তে। শুধু কি নিজেরই লেখা? সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে নিবেদিতা অপরের লেখা দিয়েও কাগজটিকে মূল্যবান করে তুলল। 'মডার্ন রিভিউ'-এর সঙ্গে তার একটা মধুর যোগাযোগ গড়ে উঠল। রামানন্দ একবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় নিবেদিতাকে দীর্ঘদিন কাগজটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে।

এর পরে আবার নিবেদিতা কাজের মধ্যে ডুবে গেল। প্রবুদ্ধ ভারতের পাতায় পাতায় নিবেদিতা লিখে চলল। আহ্বান করল দেশকে নানাভাবে। দেবতা বিবেকানন্দকে মানুষ বিবেকানন্দরূপে তুলে ধরল জনসমক্ষে। নতুন করে তারা চিনল বিবেকানন্দকে।

এলো ১৯০৭ সাল।

ডিসেম্বরে সুরাট কংগ্রেস শেষ হলো। নরমপন্থী আর জাতীয়তাবাদীদের বিরোধ উঠল চরমে। উত্তেজিত জনতা। তারপরে শুরু হলো সরকারী দমননীতি। ঘোর সংকট নেমে এলো। কেউ মুক্তি পেল না। সরকারী চাকুরেদের ছাঁটাই করা হলো। স্বদেশীতে যোগ দিলে তো কথাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাকে জেলে যাবার জন্য প্রস্তুতও থাকতে হ'ত।

বিনা বিচারে নির্বাসন দেওয়া হলো লাজপত রায়, অজিত সিংহ, কৃষ্ণ মিত্র এবং আরও ছ'জন বাঙালীকে। মাদ্রাজে গিয়ে ধরা পড়লেন বিপিন পাল। দেশের বুকে আগুন জ্বলে উঠল। বিদ্রোহের দামামা বাজল চতুর্দিকে। পরদেশলোভী বেনিয়া জাতকে সতর্ক করে দেওয়া হলো মে মাসে বোমা ফাটিয়ে।

কয়েদীর স্রোত চলল জেল-তীর্থে। ছেলেরা হাসিমুখে দুঃখকে জয় করবার জন্য প্রাণ উজাড় করে দিতে লাগল। নিবেদিতার বাড়িটা হয়ে উঠল পলাতকদের আস্তানা। বিপ্লবীদের অনেক কিছুই ওখানটায় থাকত। বারীন ঘোষের বন্ধুদের নানাভাবে সাহায্য করল নিবেদিতা। যোগাযোগ রক্ষা করে চলল মুরারিপুকুর রোডের বোমা-তৈরীর আস্তানাটির সঙ্গে। বিস্ফোরক-তৈরীর কৌশল শেখার জন্য হেমচন্দ্র দাসকে পাঠানো হলো ফ্রান্সে। উল্লাসকর আবিষ্কার করে ফেলল মেলানাইট তৈরী করবার কায়দাটা।

এইসব ছেলেদের নিবেদিতা বিনা দ্বিধায় পাঠান হত প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে। জগদীশ বসু এবং প্রফুল্ল রায় ছিল সেখানকার অধ্যাপক। তারা কিন্তু নিবেদিতার এ গোপন কর্মটি সম্বন্ধে কোনো খবরই জানত না।

যুগান্তর-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নিবেদিতা বড় ব্যথা পেল। ছুটে গেল আদালতে। শুনল জামিন লাগবে দশ হাজার টাকা। কিন্তু কিছুতেই যখন টাকার সংস্থান করতে পারল না ভূপেনের বন্ধুরা, তখন নিবেদিতা তাদের ডেকে বলল, "ঐ পরিমাণ টাকাই আমার ব্যাঙ্কে আছে। ওটা তোমরা নিয়ে নাও। আমি ভিক্ষা করে ও টাকাটা পূরণ করব।"

ভূপেনকে নিবেদিতা মাঝে মাঝেই বলত, "ভূপেন, মনে রেখ তুমি দেশমাতৃকার, আর কারও নয়। দেশপ্রেম যেন খুইও না কোন মতেই। সংসার কর না, তুমি দেশের, তুমি সকলের। কিন্তু বড় কঠিন ব্রত।"

ভূপেনকে মুক্ত করবার জন্য খোলাখুলি একটা চেষ্টা করতে লাগল নিবেদিতা। ফল দাঁড়াল অন্য রকম। পুলিসের চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেল। নিবেদিতার নাম উঠল দাগীর খাতায়। জাতীয়তাবাদীরা বলল—তুমি পালাও। তুমি সরে পড় এখান থেকে।

গোখলের বিপদ। তাকে সাবধান করে দিয়ে নিবেদিতা লিখল একটা চিঠি, "মনে হয়, তোমাকে আসামী দেখলে খুশী হতাম।"

১৫ই আগষ্ট। নিবেদিতা রওনা হল লণ্ডন অভিমুখে। দু বছর কাটাল পশ্চিমে। হারাল মাকে। দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে কেটে গেল দিনগুলো। মনটা যেন আর পড়তে চায় না এই বেদনরূঢ় কারাবেষ্টনীর মধ্যে। জীবনের ফেলে আসা কাহিনীর কান্না এসে অন্তরের সুরকে বেসুরা করে দিতে চায়। চায় ছন্দ পতন ঘটাতে। মানসপটে আভাসিত হয় গৈরিক ভারতের তীর্থপথ।

যাত্রা করল নিবেদিতা। পথে একটা অভাবনীয় সংবাদ শুনতে পেল।

একজন হিন্দু লণ্ডনে এসে কার্জনকে হত্যা করেছে। নিয়েছে বংগভঙ্গের প্রতিশোধ।

ভারতের আকাশে বাতাসে বিদ্রোহের বহ্নি-বন্যা। প্রলয়ের পূর্বাভাস। আর কেউ নেই ঘরে বসে। ছাত্র ছেড়েছে স্কুল। মা সন্তানকে ঠেলে দিয়েছে দেশমাতৃকার পূজার বলি করে। প্রিয়া আশিস চুম্বন দিয়ে স্বামীকে পরিয়ে দিয়েছে রণসজ্জা।

নিবেদিতার অন্তর তৃপ্তিতে ভরে যায়। মনে পড়ে স্বামিজীর কথা। এই স্বপ্নই তো ছিল তাঁর মনে।

১৯০৯ সাল। জুলাই মাস।

নিবেদিতা একটা ছদ্মনাম নিয়ে নামল বম্বেতে।

বন্ধুরা লিখেছিল, "তুমি এখানে এলেই পুলিস তোমাকে গ্রেপ্তার করবে।"

বম্বে থেকে কলকাতা এলো রিজার্ভ কামরায়। পথে নামল নিবেদিতা। গাড়িটা পালটে আর একটা লোকালে উঠল। পুলিস কিছু বুঝতেই পারল না। নির্বিবাদে এসে পৌঁছল বাগবাজারে। নিবেদিতা নিজেকে গোপন করে চলতে লাগল। পুলিস স্বামিজীর জনৈকা আমেরিকান শিষ্যা দেবমাতাকে দেখে এগিয়ে গিয়ে শুধাল, "আপনি কি সিস্টার নিবেদিতা?"

"না।"

এদিকে নিবেদিতা গোপনে তার বন্ধু-বান্ধব ও গোপন কর্মকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে লাগল।

১৯০৮ সনের মে মাসে 'আলিপুর-ষড়যন্ত্র' ধরা পড়েছিল। মুরারিপুকুরে বারীন ঘোষের কিছু পারিবারিক সম্পত্তি ছিল। মুরারিপুকুরে পুলিস অতর্কিতে হানা দিল। পেল প্যারিস ও আমেরিকায় ছাপান প্রচার পত্র। টাকাকড়ি, অস্ত্রশস্ত্র বোমা, বারুদও প্রচুর জুটে গেল। বিপ্লবীদের এইটাই ছিল প্রধান ঘাঁটি। পুলিস চৌদ্দ জনকে করল গ্রেপ্তার। ব্যাপকভাবে শুরু হল অনুসন্ধান ও অত্যাচার।

বিপ্লবকে বানচাল করে দেবার জন্য সরকার রূপ অপদেবতাটি সর্বদা সক্রিয় রইল। ফল দাঁড়াল বেশ ভয়াবহ। এখানে সেখানে ফাটতে লাগল বোমা। বাঙলার নদী, বন পেরিয়ে আন্দোলন বিস্তৃত হয়ে পড়ল বিহারের দেওঘর, মজঃফরপুর পর্যন্ত। সেখানকার প্রধান বিচারপতির বাড়ির সামনেও বোমা ফাটল। তাতে দুটি মেয়ে মারা গেল। পুলিস কিছু লোককে করল গ্রেপ্তার। তাদের উপর অত্যাচারের আর সীমা রইল না। বিপ্লবীদের দৃঢ়তায় কর্তৃপক্ষ সত্যই ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু এই অত্যাচারের দুর্বিসহ জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নরেন গোঁসাই হলো রাজসাক্ষী।

নরেন সব গোপনঘাঁটির সন্ধান রাখে। এখন উপায়?

কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন্দ্রনাথ বসু জেলের মধ্যেই চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দিল নরেন গোঁসাইয়ের কণ্ঠ।

দীর্ঘ দিন ধরে চলল বিচার। কোনো জোরালো প্রমাণই মিলল না। ত্রিশ দফা শুনানির মধ্যে মামলার অবসান হলো। চোটটা নিয়ে পড়ল বারীন ঘোষের উপর। বিচারকরা তাকেই মূল-নেতা বলে ধরে নিয়েছিল। অভিযুক্ত হলো বারীন ঘোষ আর উল্লাসকর দত্ত। তাদের হলো ফাঁসির হুকুম। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম কে খণ্ডায়? এক বৎসর পরে রদ হয়ে গেল তাদের ফাঁসির হুকুম। হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। চৌদ্দ বছর পরে আন্দামান থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এলো বারীন ঘোষ। অরবিন্দও ছাড়া পেল। চিত্তরঞ্জন দাসের যুক্তি ও তর্কের কাছে সরকার হার মানল। জেল থেকে মুক্ত হয়ে অরবিন্দ সম্পূর্ণ বদলে গেল। দর্শনে তার দিব্যভাব। তার অন্তরে নিরন্তর কৃষ্ণকান্তের লীলাছন্দ। বাইরের দুয়ার বন্ধ হয়ে খুলে গেল ভেতর দ্বার। জীবনের একটা পর্ব শেষ করে সে আর একটি তীর্থলোকে ধ্যানমগ্ন।

নিবেদিতা নির্বাক বিস্ময়ে সবই লক্ষ্য করে। নীরবে বসে থাকে। পালন করে অরবিন্দের কারামুক্তির পুণ্য দিনটি। পত্র-পুষ্পে সজ্জিত করে তোলে তার বিদ্যালয়।

যে কর্ম দিয়ে এতদিন অরবিন্দ দেশের সেবা করেছে, সেই কর্মই রূপান্তরিত হলো অন্তর অঞ্জলির পুণ্য ব্রতে। দেবতা প্রসন্ন হলেন—দেখা দিলেন তাকে। অরবিন্দের হৃদয়ের দুয়ার খুলে গেল। হলো আবরণ উন্মোচিত। সে লিখল, "গোলমাল আর হট্টগোলের মধ্যেও বিবিক্ত ও নিস্তব্ধ থেকে যোগের অনুশীলন করা অভ্যাস এই সময় করেছিলাম। এর আগে কিংবা পরে আমার সাধনা পুঁথির নির্দেশে চলেনি, তার ভিত্তি ছিল অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত অনুভব। জেলে গীতা ও উপনিষদ্ কাছে ছিল। আমি গীতোক্ত যোগাভ্যাস আর উপনিষদের সাহায্যে ধ্যান করতাম। কোনও জটিল সমস্যা উপস্থিত হলে সমাধানের জন্য কখনও কখনও গীতার আশ্রয় নিতাম। প্রায়ই তা থেকে সাহায্য বা জবাব পেয়ে যেতাম।...... জেলে নির্জন ধ্যানের মধ্যে অবিশ্রাম বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর শুনেছি এবং তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করেছি। তিনি এক পক্ষকাল আমার সঙ্গে কথা কয়েছিলেন।"

কারামুক্ত অরবিন্দ এসে দেখল সব আলোগুলো স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। এসেছে সহকর্মীদের মধ্যে একটা নিরুদ্যমতা। শুধু কি তাই? দল ভাঙনের মুখে। কেবল নিবেদিতা আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিবন্ত প্রদীপে ঘৃতের আহুতি দিতে।

অরবিন্দ দুটি কাগজ বের করল এই সময়ে। ইংরেজীতে 'কর্মযোগীন্' এবং বাঙলায় 'ধর্ম'। ১৯০৯ সনের ১৯শে জুন প্রকাশিত হলো কর্মযোগীন্। তাতে লেখা

হলো পত্রিকার উদ্দেশ্য : "দেশের জীবন-স্রোত একদিন বিপুল খাতে একই লক্ষ্যে প্রবাহিত হত। দীর্ঘকাল হল সে স্রোত সহস্র সঙ্কীর্ণ এবং অগভীর ধারায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দুটি প্রধান ধারা আজ ধর্ম আর রাজনীতির খাতে বইছে বটে, কিন্তু আজও তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। জাতীয় শক্তির উৎস অনেক। অতীতেরই হ'ক আর বর্তমানেরই হ'ক, আমরা তার সবগুলি নিয়েই আলোচনা করব, তাদের সর্বজন-বোধ্য করবার চেষ্টা করব, জীবনে তাদের নামিয়ে আনব। নিষ্ক্রিয় নয়, শক্তির সক্রিয়রূপ আমরা দেখতে চাই। শক্তিকে শুধু আগলে রাখা নয়, চাই তার উছলন…"

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বললেন অরবিন্দ, "লোকে তাকে পাগল বলবে। আপাতদৃষ্টিতে অশিক্ষিত, অসভ্য, বর্বর একটা লোক, পরান্নে যে জীবন ধারণ করত, তাকে কি না ঈশ্বর পাঠালেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের জন্য! অথচ যারা শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা মুকুটমণি, পাশ্চাত্যের সবকিছু যারা জেনেছে, তারা এই বৈরাগীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। মুক্তির অভিযান শুরু হল সেদিন থেকে, সূচনা হল ভারত উদ্ধারের……"

"কাজ শেষ হওয়া দূরে থাক, এখনও কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। বিবেকানন্দ যে দায় মাথায় নিয়ে কাজে নেমেছিলেন, যা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, আজও তা বাস্তবে রূপ নেয়নি।"

ধ্যানের নয়নে তাঁর সুন্দর অন্তর যেভাবে ধরা দিয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে তাঁকে তিনি সবার সামনে তুলে ধরলেন। যুক্তি, বিচার আর প্রেমের শক্তি দিয়ে যে সত্য তিনি আবিষ্কার করলেন তা যে অনুভূতি-সাপেক্ষ। অরবিন্দ বললেন, "এই সময় ঈশ্বরের দিকে মন ফিরল যখন, তখন তাঁর উপরে আমার বিশ্বাস ছিল না বললেই চলে।……কারাগারের নিঃসঙ্গতায় তাঁকে বললাম, 'জানি না, কি আমায় করতে হবে, কেমন করেই বা করতে হবে। আমায় আদেশ কর তুমি।"

বাণী এলো সেই অনাদিকলের চিরন্তন সুরছন্দে, "এ দেশকে তুলতে হবে, সেই কাজে সাহায্য করবার ভার দিয়েছি তোমায়। আমার বাণী প্রচার করবে বলে এ দেশকে বড় করে তুলেছি আমি। শক্তি-সঞ্চার করছি জনগণের অন্তরে। দীর্ঘকাল ধরে এ অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি রচেছি। এবারে সময় হয়েছে। আমিই পূর্ণতার পথে পরিচালিত করব এ দেশকে……"।

রুদ্র অরবিন্দ এখন আত্মমগ্ন যোগী। কর্মযোগীনের উনচল্লিশটি সংখ্যা বের হলো। এর মধ্যেই আবার ধরাধরি শুরু হল। দেশে আবার নেমে এলে সন্ত্রাস।

অরবিন্দের প্রতিও তাদের সুনজর নেই। পত্রিকা চালানও মুশকিল হয়ে উঠল। অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতা প্রায়ই দেখা করত—করত আলাপ-আলোচনা।

এদিকে সরকার অরবিন্দকে আবার নির্বাসন দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সংবাদটা গোপনে রইল না। যোগীন-মার ভাগনে এসে খবরটা দিলে নিবেদিতার কানে। নিবেদিতা অরবিন্দকে বৃটিশ ভারত ত্যাগ করে যেতে অনুরোধ জানাল।

কিন্তু অরবিন্দ বললেন কর্মযোগীনে একটা খোলা চিঠি ছেপে দিলেই সরকার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বাগবাজার থেকে অরবিন্দ এই সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে গেল। এলো রামচন্দ্র মজুমদার। বলল চুপি চুপি নিবেদিতার কাছে—কাল খানাতল্লাশ হবে কর্মযোগীন অফিস আর গ্রেপ্তার করবে অরবিন্দকে। সময় আর নেই। ওদিকে অরবিন্দ কি করবে বসে ভাবছিল—ছিল একটা জবাবের প্রত্যাশায়। শুনল, এক অদৃশ্য শক্তির স্পষ্ট আদেশ কোন "চন্দননগর চলে যাও।"

দুই বন্ধুকে নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে অরবিন্দ চলে গেল।

সকাল বেলা। নিবেদিতার দুয়ারে দাঁড়িয়ে কর্মযোগীন্ অফিসের এক কর্মী।

—কি সংবাদ?

—অরবিন্দ চলে গেছে। কাগজের দায়িত্ব আপনার উপর দিয়ে গেছে।

কর্মযোগীনের পাতায় নিবেদিতা 'মর্মবাণী' প্রকাশ করল—

"আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড এবং অবিনশ্বর। এক আবাস, এক আকুতি আর এক সম্প্রীতি হতেই জাতীয় একতার উদ্ভব হয়।

"বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র, বাণীতে যে শক্তির লীলা, বিশ্বের ধর্মে ও রাষ্ট্রে যাঁর খেলা, বিদ্বানের বিদ্যায় এবং ঋষির ধ্যানে যাঁর প্রকাশ, আমি বিশ্বাস করি, সেই শক্তিই আজ আমাদের বুকে জেগে উঠেছেন। তার নাম আজ জাতীয়তা।

"আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান ভারতের মূলে রয়েছে প্রাচীন ভারতের গভীর ত্যাগ সম্মুখে তার গৌরবোজ্জ্বল ভাবী কাল। হে জাতীয়তা, সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান যে মূর্তিতে ইচ্ছা দেখা দাও। আমায় তোমার করে নাও। অরবিন্দও চলে গেল।"

নিবেদিতা শক্ত হাতে কর্মযোগীন্ পরিচালনা করতে লাগল।

কিন্তু মন চলে অভিসারে। আর যেন ভালো লাগে না এই মুখর দিনের কলরব।

ওগো, এবারে ডাকো—ডাকো আমায় নাম ধরে।

তোমার দেওয়া পতাকা বয়ে বেড়ালাম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আর কেন? এখন আমাকে কাছে টেনে নাও। প্রশান্তির শয্যা বিছিয়ে দাও তোমার অঙ্কে।

"আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এই যে ফুটে উঠল তোমার আদিত্য-হৃদয়ের স্বর্ণকমল। হে মহাদেব, গভীর আনন্দে একে বুকে বয়ে চলেছি নীরবে। হে দেবতা, তুমি কি দাঁড়িয়ে আমার সামনে? আত্মমন্থনের ফলে আজ সত্যই কি মূর্ত হয়ে দেখা দিলে?"

ধ্যানের মনটা এখন যেন সর্বদা জেগে থাকে। বাইরের সঙ্গে আর যোগ বন্ধনটা রাখতে চায় না চিত্ত।

পরম বিত্তের প্রার্থনায় মগ্না নিবেদিতা। শুনতে পায় সুন্দরের পদধ্বনি।

কেদার, বদ্রি, অমরনাথ থেকে ঘুরে এসে নিবেদিতা যেন কেমন হয়ে গেছে।

কাজ আর কাজ। এখন আর কোনো কাজের সঙ্গেই নেই তার যোগাযোগ। কেবল লেখে দু একটা ঠাকুর দেবতার কথা। আর খোকাকে সাহায্য করবার জন্য যা কিছু একটু খাটুনি। এছাড়া কোনো কাজই তার নেই।

ভরতের তীর্থ ঘুরে ঘুরে নিবেদিতা আহরণ করল জীবন-জিজ্ঞাসার কতগুলো তীর্যক প্রশ্ন। আজ তার জবাবের পালা। জীবন দেবতার সঙ্গে মুখোমুখি বসে তার উত্তর চাইবে নিবেদিতা। ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে কেটে যেতে থাকে দিনগুলো।

এদিকে ছুটি হয়ে গেল পূজোর। জগদীশ বসু যাচ্ছে সপরিবারে দার্জিলিং।

সঙ্গে নিবেদিতাকেও নিয়ে নিল।

বেশ কাটছিল দিনগুলি। সিকিমে যাবার বাসনা জাগল। কিন্তু তা আর ঘটলো না। নিবেদিতা অসুস্থ হয়ে পড়ল। এলো ডাক্তার। সেবা-যত্নের বিরাম নেই। কিন্তু কোনো পরিবর্তনই দেখা যাচ্ছে না।

এবারে বুঝি আর একটা উদ্‌যাপন হবে। জলছে জীবন-দেউলের দীপ। আলোর জোয়ারে চতুর্দিক আলোকিত।

অনেক সুধী ছুটিতে কলকাতা থেকে এসেছে দার্জিলিং-এ। সংবাদ পেয়ে তারা নিবেদিতাকে দেখতে এলো। কিন্তু কি হবে তাতে? তরী ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে। মরণ এগিয়ে এসেছে মন্থর পদ-বিক্ষেপে।

এতো নিবেদিতার পরম ভাগ্যের কথা। এতদিন তো সে মৃত্যুরই ধ্যান করেছে।

দেখতে চেয়েছে অন্ধকারের আলো। শুনতে চেয়েছে অনাহতের বীণা ধ্বনি। মাথা রাখতে চেয়েছে মহাপ্রাণের অঙ্কতীর্থে।

রোগ কঠিন। মারাত্মক আমাশা। বন্ধুদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। নীরবে বসে অশ্রুমোচন করতে লাগল তারা। দিনের পর দিন চলে যেতে লাগল। রাত্রির বুকে অতন্দ্রিত প্রহরীর মত জেগে রইল। দেখতে লাগল নিবেদিতার আয়ত দীপ্ত আঁখি দুটি।

শিয়রে বসে শ্রীমতী বসু। বন্ধুরাও রয়েছে। তাদের পানে অশ্রু-স্তিমিত নয়নে তাকায় নিবেদিতা। মন যেন বলে—আমায় ছুটি দাও তোমরা, কেঁদনা। ঐ তো তিনি এসেছেন। আমি যাই! আমি যাই!

তরুণ ছাত্র বশী সেন ছিল সেখানে। তার চোখ দুটো দিয়ে দরদর করে নামল অশ্রুর ধারা। বশীকে নিবেদিতা সঁপে দিল 'খোকার' হাতে। এই তার শেষ কাজ।

কত কথাই না মনে পড়তে লাগল এই বিদায়বিধুর মুহূর্তে। নিবেদিতা, একদিন বলেছিল স্বামিজীকে, "স্বামিজী আমি কি যোগ্য? যদি আমার পতন হয়?"

স্বামিজী তার জবাবে বলেছিলেন, "একবার কেন, একশবার পতন হলেও কিছু যা:ব আসবে না। সেজন্য দায়ী আমি। আমিই তোমায় বেছে নিয়েছি—তুমি আমাকে নাও নি।"

আজ সব যেন স্পষ্ট, স্বচ্ছ হয়ে চোখের সামনে একের পর এক ভাসতে লাগল।

১৯১৩ সাল। ১৩ই অক্টোবর।

রাতের আকাশ থেকে ঘু:চ গিয়েছে অন্ধকাব। উষার অরুণাচলে শুরু হয়েছে দেবপ্রিয়া আত্মার আগমনী-উৎসব। নিবেদিতার আঁখি অপলক। আর একবার বুঝি দেখে নিল তার কর্মভূমির তীর্থ-পীঠ। দেখে নিল তার গুরুজীর জন্মভূমি। প্রণাম করল মনে মনে। তন্দ্রা নামে ধীরে। চোখের পলক হয়ে যায় স্থির।

কণ্ঠ থেকে অস্ফু:ট বেরিয়ে আসে, "তরী ডুবছে……কিন্তু… ..আবার দেখব, সূর্য উঠ:ছে।"

আর কোন কথা নেই। সব থেমে গেল। ওরা হাহাকার করে উঠল। আর্তনাদে ভেঙে পড়ল। কতই বা হয়েছিল বয়স?

মাত্র তো চুয়াল্লিশ বছর।

গনেন মহারাজ পায়ের ছাপ রাখল। করল মুখাগ্নি।

সারাটা বাঙলাদেশ সেদিন গভীর শোকে মুর্ছিত হয়ে পড়ল। লিখল ১৪ই অক্টোবর 'বেঙ্গলী' পত্রিকায়:

"নিবেদিতার মৃতদেহ লইয়া শোকযাত্রা বেলা দুইটার সময়ে 'রায়ভিলা' পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানাভিমুখে চলিল। দার্জিলিঙে এত বড় শোকযাত্রা ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই।......শোকযাত্রা যখন কার্ট রোডে আসিয়া পৌছিল, তখন শহরের সমগ্র অধিবাসী যেন ভাঙিয়া পড়িল। রাস্তার দুইধারে সকলেই সারিবদ্ধভাবে নীরবে, নতমস্তকে দাঁড়াইয়া ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিল। সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। জগদীশচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই মাঝে মাঝে শবদেহ বহন করিতেছিলেন। বেলা চারিটার সময় শবযাত্রীদল শ্মশানে আসিয়া পৌছিলেন। শৈলমূলে সন্ন্যাসিনীর চিতাশয্যা রচিত হইল। ৪-১৫ মিনিটের সময় উত্তরাস্য করিয়া মৃতদেহ চিতার উপর স্থাপিত হইল। অশ্রুসিক্তচক্ষে অবলা বসু নিবেদিতার মস্তক ও হাত গঙ্গাজলে ধুইয়া দিলেন, সর্বাঙ্গে গঙ্গাবারি ছিটাইয়া দিলেন। নূতন গৈরিক বাসে তাঁহার দেহ আবৃত, মুখখানি খোলা। মনে হইল, ঘুমাইতেছেন। দক্ষিণ করখানি বক্ষের উপর ন্যস্ত। কিন্তু করধৃত রুদ্রাক্ষের মালা আজ স্থির, নিশ্চল। মুখাগ্নির পূর্বে সমবেত কণ্ঠে শোকগম্ভীর স্বরে প্রার্থনা করা হইল। পর্বতমালায় সেই প্রার্থনার প্রতিধ্বনি উঠিল। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের এক সন্ন্যাসী মুখাগ্নি করিলেন। মুহূর্তমধ্যে চিতা জ্বলিয়া উঠিল। উপস্থিত সকলের বিহ্বল দৃষ্টির সম্মুখে নিবেদিতার নশ্বরদেহ বহ্নিস্পর্শে ধীরে ধীরে ছাই হইয়া, বিশ্ব হইয়া মিশিয়া গেল মহানিঃশব্দের অন্তহীন তমিস্রায়। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে যখন চিতা নিবিয়া গেল। নিবেদিতার চিতাভস্ম লইয়া সকলে নিঃশব্দে ফিরিল।"

সারা বাংলায় শোকানুষ্ঠানের পালা শুরু হলো। বেলুড়মঠে স্বামিজীর সমাধি-মন্দিরের বেদীমূলে কিছু চিতাভস্ম রক্ষিত হলো। ১৯১৫ সনে বসুবিজ্ঞান-মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তরের নীচেও রাখা হলো কিছু পূতভস্ম। আর কিছু ভস্ম পাঠানো হলো নিবেদিতার বাল্যের লীলা-পীঠ গ্রেট টরেণ্টনে।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা চলে গেছে। কিন্তু দুঃখের, পরিতাপের ও লজ্জার বিষয় এই যে, আজ পর্যন্তও তার যথাযোগ্য মূল্য এদেশ দিতে পারল না। যে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও বিনয় সহকারে আমরা বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দকে স্মরণ করি—ঠিক অনুরূপ শ্রদ্ধার পাত্রী নিবেদিতাও ছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে এই বিদেশী মহিলা যা করে গেল, যা দিয়ে গেল, তা দুঃখভোগী ও লাঞ্ছিত মানুষের অন্তরে চিরদিন মন্ত্রের মত প্রতিধ্বনিত হবে। তারা পথ পাবে, আলো দেখবে নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে।

এই আলোর দিশারী লোক-মাতা নিবেদিতার চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

আলোর যাত্রী চলে গেল।

চলে গেল অসীমের লীলা পথে। ভারতের পরম স্নেহের দুলালী—কর্ম-ক্লান্তির শেষ যামে ঘুমিয়ে পড়ল, ঘুমিয়ে পড়ল আনন্দ-নিকেতনে।

"মরণ আসে চুপে চুপে

পরম প্রকাশ রূপে—"

ব্যক্ত মূর্তি ব্যাপ্ত হয়ে গেল। দর্শন সীমায় সীমিত নিবেদিতা ঠাঁই নিল অন্তর-তীর্থে। দিকে-দিকে পড়ে গেল সাড়া। পরম জন পেয়েছে চরম ছাড়পত্র। তাইতো এ বিদায়-মূর্ছনা। তাইতো এ বিদায় অভিসার! যাবার আগে নিবেদিতা তার জীবন-সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছিল তারই জীবন-দেবতার পদধ্বনি। মৃত্যুর মাত্র চার দিন পূর্বে লিখল নিবেদিতা "মৃত্যু ও প্রিয়তম"।

মৃত্যু সম্বন্ধে বলল নিবেদিতা—"গত রাত্রে আমার মনে হলো, এই বস্তুর জগতের সঙ্গে সংমিশ্রিত অথবা এর অতীতে আর একটি জগৎ আছে—তাকে ধ্যান বল, কিম্বা মন বল, অথবা যা ইচ্ছা তা বল—সম্ভবত এই বুঝি মৃত্যুর অর্থ। এ-লোকে স্থান পরিবর্তন নেই; কেননা এই জগৎ বস্তুর জগৎ নয়, এর কোন স্থান থাকতে পারে না। পঞ্চভূতে গঠিত এই শরীরের কল্পনা থেকে বিমুক্ত হয়ে আপন সত্তার গভীরে ডুবে যাওয়া—একেই তো মৃত্যু বলে। মৃত্যু উদার, মৃত্যু মঙ্গলময়। মৃত্যুর স্বরূপ চিন্তা করতে করতে সসীমের মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতির বিলয়-প্রাপ্ত হওয়ার কথা আমি চিন্তা করলাম। সীমা আর অসীমের সীমান্তে দাঁড়িয়ে সীমাতীতকে পাওয়াই তো মানুষের নিয়ত নির্দিষ্ট কাজ। যতই চিন্তা করছি ততই আমার মনে হচ্ছে মৃত্যুর অর্থ ধ্যানের মধ্যে বিলয় পাওয়া—ঠিক যেন আপন সত্তার কূপের মধ্যে প্রস্তরখণ্ডের নিমজ্জন। জীবনের শান্ত, নির্জন প্রহরগুলির মধ্যেই আছে প্রাগ্ মৃত্যুর অবস্থা—মন তখন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনের চিন্তা করে—সেই চিন্তাই জীবনের সকল চিন্তার, সকল কর্মের এবং সকল অভিজ্ঞতার উপসংহার। জীবন থেকে মৃত্যুলোক উত্তরণ করবার সময়েই আত্মা নবজন্ম লাভ করে এবং নূতন জীবনের সূচনা হয়। আমি অবাক হয়ে ভাবি প্রেম ও কল্যাণের দ্বারা আমাদের সমগ্র জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলা সম্ভব কিনা—সে জীবনে বিপরীত চিন্তার একটি মাত্র তরঙ্গ উঠবে না; তবেই না আমরা অন্তিম

মুহূর্তে সেই পরম লগ্নের জন্য প্রস্তুত হতে পারব এবং আত্মচিন্তা হতে মুক্ত হয়ে অনন্তের রাজ্যে স্থান পাব। তখনই আমরা বুঝতে পারব যে, এই পৃথিবীর সকল প্রয়োজন, সকল দুঃখের পরিসমাপ্তি একমাত্র অনন্ত শান্তি ও কল্যাণের মধ্যে।"

"প্রিয়তম,

আমি যেন সর্বদাই মনে রাখি যে, ঈশ্বরের জন্য আর্তিই হলো সমগ্র জীবনের অর্থ। আমার প্রিয়তমই প্রিয়তম—যিনি আমার জীবনের বাতায়ন দিয়া উঁকি মারেন এবং যিনি আমার জীবনের দরজায় করাঘাত করেন। আমার প্রিয়তমের কোন অভাব নেই, তথাপি তিনি মানুষের বেশে আমার দরজায় আসেন, তাঁর প্রয়োজন জানান, যাতে আমি তাঁর সেবা করতে পারি। তাঁর কোনো ক্ষুধা নেই, তবু তিনি প্রার্থনা করেন, আমি যেন দিতে পারি। তাঁর ক্লান্তি বোধ আছে, আমি যাতে তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে পারি। তিনি ভিক্ষুকের বেশে আসেন, যাতে আমি দান করতে পারি। প্রিয়তম, ওগো প্রিয়তম, আমার যা কিছু সবই তোমার। হ্যাঁ, আমিই তোমার। আমার 'আমিত্ব' বিনাশ করে তার স্থলে তুমি এসে দাঁড়াও।"

যাবার কয়েকটা দিন আগে নিবেদিতার দিব্য নয়ন খুলে গিয়েছিল। সে দেখতে পেয়েছিল তার গন্তব্য স্থানের নিশানা। আহা কি মনোরম! কি অপূর্ব!

আত্মার আকাশে তাঁরই প্রকাশ মহিমা দীপ্ত তেজে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর এবারে তুমি আমি এক হয়ে গেলাম।

শোকবিহ্বল অবলা বসু লিখলেন,—"কিছুকাল আগে নিবেদিতা বিদেশে আমার রোগ শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। আজ আমার পালা। আমাদের সকলেরই আশা ছিল তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন। কিন্তু তিনি বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অন্তিম মুহূর্ত আসিয়া গিয়াছে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিবেদিতা আমাদিগকে সহাস্যবদনে অভ্যর্থনা করিতেন, কথা যাহা বলিতেন তাহার মধ্যেই তাঁহার চিত্তের নির্ভীকতার পরিচয় পাইতাম। সব সময়েই ভারতের মেয়েদের শিক্ষার কথা বলিতেন, আলোচনা করিতেন। তাঁহার সমস্ত সঞ্চয়, পুস্তকের যাবতীয় আয়—সবই তিনি ভারতের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দার্জিলিং-এ আসিবার কয়েকদিন পূর্বে নিবেদিতা প্রচীন বৌদ্ধধর্ম হইতে একটি প্রার্থনা-বাণী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং উহা মুদ্রিত করিয়া তাঁহার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি জানিতেন, ইহাই তাঁহার বিদায়-বাণী। ভগিনী নিবেদিতার সমগ্র জীবনই ছিল প্রার্থনা···উমা হৈমবতীর যে উপাখ্যান তিনি

আমাদের নিকট জীবন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন, নিবেদিতার মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেই উপাখ্যানটি আমার বার বার মনে পড়িতেছিল। এই শরৎ ঋতুতেই তো উমা পিত্রালয়ে আসিয়া থাকেন। আমার সম্মুখেই তোমার একটি উমাকে দেখিতেছি, যিনি বহু জন্মের পরে তাঁহার নিজ আবাস ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন।.....

তারপর অন্তিম মুহূর্তে নিবেদিতার কণ্ঠ হইতে যখন অস্ফুট স্বরে উচ্চারিত হইল—

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতংগময়
আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্রং যত্তে দক্ষিণং মুখম্
তেন মাং পাহি নিত্যম্॥

তখন দেখিলাম তাঁহার সমস্ত মুখখানি একটি দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নিমীলিত নয়নে নিবেদিতা ভারতের ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন।"

নন্দলাল বসুর বাড়ি। আজ ২৩শে অক্টোবর' সোমবার। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মুগ্ধ-মধুর দিন। আয়োজন করা হয়েছে একটি শোকসভার। আজ আমাদের চিরপরিচিতা আইরিশ ভগ্নী নিবেদিতার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করতে এসে সমবেত হয়েছেন মতিলাল ঘোষ (সভাপতি), কিশোরীলাল সরকার, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, নগেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ পি মুখার্জি, নরেন্দ্রকুমার বসু, মহিমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, বিহারিলাল মিত্র, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, পার্বতীচরণ তর্কতীর্থ, যোগেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ এফ. জে. আলেকজান্দার, দেবেন্দ্রনাথ বসু, মন্মথমোহন বসু প্রভৃতি।

সভার কাজ শুরু হলো। উচ্চারিত হলো মঙ্গলাচরণ। সভাপতি মতিলাল ঘোষ ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন—"শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি মহৎ কর্তব্যবোধেই এই সভায় যোগদান করিয়াছি। ভগিনী নিবেদিতাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম; তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তাঁহার মহৎ চরিত্রের গুণেই তিনি ইহা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি সকলেরই ভগিনীসমা ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ কেবলমাত্র বাগবাজারের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কিম্বা কলিকাতা বা ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না—উহা

সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তবে বাগবাজারের অধিবাসীদিগের নিকট তাঁহার স্মৃতি বিশেষভাবে পবিত্র এই কারণ যে, এই অঞ্চলেই ছিল তাঁহার কর্মক্ষেত্র এবং দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি এই স্থানের অধিবাসীদের সুখ-দুঃখের সমভাগিনী ছিলেন এবং তাঁহার নিরলস সেবার দ্বারা তিনি সকলের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কেবলমাত্র স্নেহময়ী জননী অথবা ভগিনীরূপে রুগ্ন ও পীড়িতের সেবা করিতেন না—যে কেহ কলেরা কিম্বা প্লেগের দ্বারা আক্রান্ত হউক না কেন—কিম্বা আত্মীয়স্বজন বা বান্ধবহীন অনাথ বা বিধবার যে তিনি দুঃখ মোচন করিতেন তাহা নহে—সকলের জন্যই তাঁহার হৃদয় উন্মুক্ত ছিল; তাঁহার মুখের হাসি হইতে কেহই বঞ্চিত হইত না এবং তাঁহার করুণা সকলেই পাইত। নিবেদিতা যেন নারীকুলে সম্রাজ্ঞীবিশেষ ছিলেন। মানবীর আকারে তিনি ছিলেন দেবী—যিনি দুঃখ যন্ত্রণাক্ষুব্ধ এই মানব সমাজে সুখ ও শান্তি আনিবার জন্য স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছিলেন। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে তিনি সকলের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের সব কিছুই তিনি ভালবাসিতেন, তবে অন্ধ অনুরাগবশতঃ নহে, স্বাধীন বিচারশক্তির ভিতর দিয়াই তিনি এই সমাজের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি শুধু বিদুষী ছিলেন না, অসামান্যা বুদ্ধিশালিনীও ছিলেন। হিন্দুর সামাজিক বিধিবিধানের মধ্যে তিনি যে সৌন্দর্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহা উচ্ছাস বা অন্ধ অনুরাগবশতঃ নহে, তন্ন তন্ন করিয়া অনুশীলন করিবার ফলেই। পাশ্চাত্য জগতের নিকট নিবেদিতা যে ভাবে ভারতবর্ষকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, একমাত্র সেই কারণেই তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়। আজ আমরা তাঁহার মৃত্যুতে শোক করিতে সমবেত হইয়াছি। কিন্তু মহৎ জীবনের পুরস্কার স্বরূপ তিনি এখন মহত্তর সব সুন্দরতর লোকে বাস করিতেছেন এই কথা ভাবিয়া আমরা আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারি।"

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বলেন, "ভারতবাসীর জন্য নিবেদিতা যে কি করিয়া গিয়াছেন, ভাবিকাল তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিবে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ্যানি বেসান্ত অপেক্ষা ভগিনী নিবেদিতার দান বেশী—তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সুখে, দুঃখে, মানে, অপমানে এবং বেদনায় পরাধীনতা-জর্জর এই ভারতবর্ষই ছিল তাঁহার ধ্যানের বিষয়। নিবেদিতার বদান্যতা ও বীরত্বের তুলনা নাই। সেবায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়া। তাঁহার প্রশংসার কীর্তন করিয়া নহে, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিলেই নিবেদিতার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখান হইবে।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল :

"ভগিনী নিবেদিতার অকাল-মৃত্যুতে দেশের যে সমুহ ক্ষতি হইল তাহা স্মরণ করিয়া কলিকাতার এই জনসভা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করিতেছে। তাঁহার আত্মোৎসর্গ, অকৃত্রিম ভারত-প্রীতি, ভারতের জনসাধারণের জন্য নিরলস সেবা এবং হিন্দু আদর্শের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ উপলব্ধি নিবেদিতাকে ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।"

১৯৬২ সাল, ২৩শে মার্চ। কলকাতা টাউন হল। নিবেদিতার স্মৃতিবাসর, তাঁর তিরোধানের দ্বিতীয় শোকসভা।

সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন স্যর রাসবিহারী ঘোষ। উপস্থিত হয়েছেন নিবেদিতার গুণমুগ্ধ কলকাতার প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, তাঁদের মধ্যে স্যর গুরুসদয় দত্তও রয়েছেন।

সভার কাজ আরম্ভ হলো। বক্তা হিসেবে দাঁড়ালেন সভাপতি স্যর রাসবিহারী। তাঁর কণ্ঠ আড়ষ্ট। ছলছল চোখে। নিদারুণ বেদনায় তাঁর মুখখানা ম্রিয়মান। তিনি ধরাগলায় বলতে লাগলেন—"নিবেদিতা ছিলেন বিদুষী এবং উন্নত চরিত্রের মহিলা। বিদেশ হইতে এই দেশে আসিয়া এই দেশকেই তিনি তাঁহার জন্মভূমি জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে এই দেশের মৃত্তিকাতেই তাঁহার অন্তিমশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচারে, ব্যবহারে, কথাবার্তায় তাঁহার মধ্যে নিষ্ঠাবতী হিন্দু-রমণীর ভাব এমন ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে তাহা দেখিয়া মনে হইত সত্যই তিনি যেন ভারতের শাপভ্রষ্টা এক কন্যা ছিলেন। নিজেকে তিনি সর্বতোভাবে ভারতের কল্যাণে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার গুরুর দেওয়া সুন্দর নামটিকে সার্থক করিয়া গিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি আজ যে আমরা এত অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছি, ইহার কারণ ভগিনী নিবেদিতা ইহার শুষ্ক অস্থি-পঞ্জরে প্রাণসঞ্চার করিয়া আমাদের সম্মুখে ইহা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি যদি আর কিছু না করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও আমরা ইহার জন্যই নিবেদিতার নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকিতাম। তিনি হিন্দুধর্মকে অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রত পালনের মত তিনি জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই জীবনের মূল্য বুঝি নাই, মূল্য দিই নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের রাখী ছিলেন নিবেদিতা এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই সম্পর্কে তাঁহার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়া গিয়েছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাহা যোগ্যতার সহিত, আন্তরিকতার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন। এমন গভীর ভারত-প্রীতি আমরা কোন বিদেশীর মধ্যে দেখি

নাই। কিন্তু নিবেদিতাকে বিদেশিনী বলিতে আমার বাধে। আমার তো মনে হয়, তিনি ভারতীয়দের অপেক্ষা বেশী ভারতীয় ছিলেন। শিক্ষায়, দীক্ষায়, সেবায়, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে—সকল ক্ষেত্রেই আমরা তাঁহাকে পাইয়াছিলাম। নিবেদিতা আজ নাই, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম ও কীর্তির মধ্যে তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন, তাঁহার অজস্র রচনার মধ্যে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষা সুন্দর রচনা আমি খুব কমই পাঠ করিয়াছি। যদি কোনো ফুলের সৌন্দর্যের সহিত নিবেদিতার অন্তরের সৌন্দর্যের তুলনা করিলে হয়, তাহা হইলে সর্বাগ্রে যে-ফুলটির নাম আমার মনে আসে তাহা হইল শ্বেতপদ্ম। শ্বেতপদ্মের মতই শুভ্র পবিত্র ছিল তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতি। তিনি পবিত্রতার মতই পবিত্র, যেন মূর্তিমতী পবিত্রতা। আমাদের সৌভাগ্য যে, নিবেদিতাকে আমরা পরমাত্মীয়া রূপে আমাদের মধ্যে পাইয়াছিলাম। ভারতের জাতীয় পুনরুত্থানের ইতিহাসে 'নিবেদিতা' এই নামটি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"

বেদনামথিত অন্তরে নিবেদিতার অন্তর্জীবনের পরিচয় লিখতে বসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করলেন—"ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয়, তখন তিনি অল্পদিন মাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণ ইংরেজ মিশনারি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর মহিলা, কেবল ইঁহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

"সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কী শিক্ষা দিতে চাও?'

আমি বলিলাম, 'ইংরেজি এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।' তিনি বলিলেন, 'বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কি? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে, তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভাল বোধ হয় না।'

"মোটের উপর তাঁহার সেই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও মৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অদূরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে

সুসঙ্গত হইয়া উঠিত পারে তাহার উপায় ত জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা ত সাধারণ শিক্ষকের কর্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া কোন রকমে কাজ চালাই।

"যদিও আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আচ্ছা বেশ, আপনার নিজের প্রণালী মতই কাজ করিবেন, আমি কোনো প্রকার ফরমাস করিতে চাই না।' বোধকরি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন অনুকূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, 'না, আমার এ কাজ নয়।' বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া তাহাদের শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনারির মত মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে কোনো একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষ্যকে, তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিতেন।

"তাহার পরে, মাঝে মাঝে নানা দিক্ দিয়া তাঁহার পরিচয়লাভের অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল—সেই সঙ্গে তাঁহার একটি জিনিস ছিল, সেটি তাহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার এক বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে—যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

"আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না; তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত্র স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।

"নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনো প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব—কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কী, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে।

"মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

"পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড় জিনিস আমরা যাহা কিছু পাই তাহা বিনা-মূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দরদস্তর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড় তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহাজীবন; তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই; প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সে জন্য মানুষ কত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন—নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না—নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, লাভ-লোকসান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিছু না—ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।

"এই যে এতবড় আত্মবিসর্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি ইহাকে, আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখি সেই অংশেই বঞ্চিত হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়া ঘটিবে না। এই আত্মবিসর্জনকে অত্যন্ত অসংকোচে, নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়া অবচেতন ভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড় একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কি বুদ্ধি, কি হৃদয়, কি ত্যাগ, প্রতিভার কি জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

"যদি তাহা উপলব্ধি করি তবে আমাদের একটা গর্ব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনো আমরা গর্ব করিতেছি। তিনি যে আপনার জীবনকে এমন করিয়া দান করিয়াছেন সে দিক দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে আমরা যে পরিমাণে মনের মধ্যে

গ্রহণ করিতেছি না, সে পরিমাণে এই ত্যাগ স্বীকারকে আমাদের গর্ব করিবার উপকরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা বলিতেছি তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা—হিন্দুরা বড় কম লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমাদের ধর্ম ও সমাজের মহত্ত্ব। এমনি করিয়া আমরা নিজের দিকের দাবিকেই যত বড় করিয়া লইতেছি তাঁহার দিকের দানকে ততই খর্ব করিতেছি।

"বস্তুত তিনি যে কি পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে—অর্থাৎ আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন একথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন—তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুষের অটল বেড় ভেদ করিয়া যে রূপ সংস্কারমুক্ত চিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমানকালে যাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙ্গিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড় করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু এমনি নির্বিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।

"যেমনি হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদের মতন ছিলেন বলিয়াই যে তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড় ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে হিন্দুত্বের নহে, মনুষত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।

"তাহার জীবনে সকলের চেয়ে যেটা চক্ষে পড়ে সেটা এই যে, তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবলভাবে কর্মী ছিলেন, কর্মের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছেই—কেননা তাহাকে বাধার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়—সেই বাধার নানা ক্ষতচিহ্ন তাহার সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু ভাব জিনিসটা সম্পূর্ণ অক্ষত। এই জন্য যাহারা ভাববিলাসী তাহারা কর্মে অবজ্ঞা করে অথবা ভয় করিয়া থাকে। তেমনি আবার বিশুদ্ধ কেজো কেজো লোক আছে তাহারা ভাবের ধার ধারে না, তাহারা কর্মের কাছ হইতে খুব বড় জিনিস দাবী করে না বলিয়া কর্মের কোন অসম্পূর্ণতা তাহাদের হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না।

"কিন্তু ভাবুকতা যেখানে বিলাসমাত্র নহে, সেখানে তাহা সত্য এবং কর্ম যেখানে প্রচুর উদ্যমের প্রকাশ বা সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনামাত্র নহে যেখানে

তাহা ভাবেরই সৃষ্টি, সেখানে তুচ্ছও কেমন বড় হইয়া উঠে এবং অসম্পূর্ণতাও মেঘ প্রতিহত সূর্যের বর্ণচ্ছটার মত কিরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশমান হয় তাহা ভগিনী নিবেদিতার কর্ম যাহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

"ভগিনী নিবেদিতা যে সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনটারই আয়তন বড় ছিল না, তাহার সকলগুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম, সেইখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড় আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল। তাহাকে আকারে বড় করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড় করিয়া দেখাইতে হইলে যে সকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয়, তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

"এই জন্যই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মত একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না এও সেইরূপ। তাহার এই কাজটিকে তিনি বাহিরে কোনদিন ঘোষণা করেন নাই এবং আমাদের কাহারো নিকট হইতে কোনো দিন ইহার জন্য তিনি অর্থ সাহায্য প্রত্যাশাও করেন নাই। তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারে উদরান্নের অংশ হইতে।

"তাহার পর এদেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া তিনি যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবেন সে ইচ্ছাও তাঁহার মনকে লুব্ধ করেন নাই। অন্য য়ুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকল সময় উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। কারণ, দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা আহরণ করিয়া লয়।

"কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র রাখেন নাই। অথচ নিতান্ত মৃদু স্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্বল ভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত

করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল এবং সে জোর যে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতেন তাহাও নহে। তাঁহার সেই পাশ্চাত্ত্য স্বভাব-সুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোনো অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না—কারণ, যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু—তৎসত্ত্বেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দূরে ছড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহাকেই জয়ী করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত জোর দিয়া লড়াই করিতেন, সেই জয়-গৌরব নিজে লইবার লোভ তাঁহার লেশমাত্র ছিল না। দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, তাহার ভিতর হইতে সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই। এদেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।

"অথচ তাহার কারণ এই নয় যে, তাহার মধ্যে রুচিগত বা বুদ্ধিগত আভিজাত্যের অভিমান ছিল; তিনি জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়াই যে তাহাদের নেতার পদের জন্য উমেদারী করেন নাই তাহা নহে। জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড় সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত—এ সম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্য-বুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করেন নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতই ভালবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই 'পীপল্'কে (people), এই জন-সাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।

"বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপর আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি ত আমরা দেখি নাই। এ-সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন, 'our people', তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত, আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনটি লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে, সে নিশ্চয়ই এই বুঝিয়াছে যে, দেশের

লোককে আমরা হয়ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

"ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি। তিনি লোক সাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুধুমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীরবাসিনী একজন সামান্যা মুসলমান রমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে—কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।

"লোকসাধারণ ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ধন ছিল বলিয়াই তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়া অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি তাহাদের সংস্রব চাহিতেন, তাহাদিগকে সর্বতোভাবে জানিবার জন্য তিনি তাহার সমস্ত মনকে তাহাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেন। তিনি তাহাদের ধর্মকর্ম, কথাকাহিনী, পূজাপদ্ধতি, শিল্প-সাহিত্য, তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কেবল বুদ্ধি দিয়া নয়, আন্তরিক মমতা দিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নিত্য পদার্থ আছে তাহাকেই তিনি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে বুঝিয়াছেন। মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং একটি গভীর মাতৃ-স্নেহ বশতই তিনি এই ভালটিকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন। মাতৃহৃদয়া নিবেদিতা জনসাধারণের আচার ব্যবহারকে, তাহাদের নানা প্রকার সংস্কার ও প্রভাবকে নিরর্থক কিম্বা নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তা বলিয়া মনে করিতেন না। এইজন্য সেই সকলের প্রতি তাঁহার ভারি একটা স্নেহ ছিল। তাঁহার সমস্ত বাহ্যরূঢ়তা ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে মানব-প্রকৃতির চিরন্তন গূঢ় অভিপ্রায় তিনি দেখিতে পাইতেন।

"ভগিনী নিবেদিতার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা একদিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর একদিকে তেমনি শাবক বেষ্টিত বাঘিনীর মত প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্মমভাবে কেহ ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না অথবা যেখানে রাজার কোনো অন্যায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কত লোকের কাছ হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি

সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্য লোকের অসঙ্গত আব্দার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন; কেবল তাঁহার এই মাত্র ভয় ছিল, পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার "পীপ্‌লদের" প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা কিছু ভাল তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধা—দৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন।

"ভারতবর্ষের প্রতি ভগিনী নিবেদিতার যে শ্রদ্ধা তাহা সত্য পদার্থ। তাহা মোহ নহে—তাহা মানুষের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের শ্লোক খুঁজিত না, তাহা বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া মর্মস্থানে পৌঁছিয়া একেবারে মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিত। এইজন্য অত্যন্ত দীন অবস্থার মধ্যেও আমাদের দেশে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। সমস্ত দৈন্যই তাঁহার স্নেহকে উদ্বোধিত করিয়াছে, অবজ্ঞাকে নহে। একথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতার বাঙালি পাড়ার এক গলিতে একেবারে আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া যে বাস করিতেছিলেন তাহা দিনে, রাত্রে, প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র বেদনার ইতিহাসে প্রচ্ছন্ন ছিল। ঘরের বাহিরে আমাদের অসাড়, শৈথিল্য, অপরিচ্ছন্নতা, আমাদের অব্যবস্থা ও সকল প্রকার প্রচেষ্টার অভাব যাহা পদে পদে আমাদের তামসিকতার পরিচয় দেয় তাহা প্রত্যহই তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইখানে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। 'সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা এই যে প্রতি মুহূর্তের পরীক্ষা, ইহাতে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন।

"শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহেও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন, অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়িতে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাহার তপস্যা যে ভঙ্গ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল। তাহা মোহ ছিল না; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর

কৈলাশের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মত এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে ?

"এইজন্যই তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে যাহার রূপের অভাব দেখিয়া রুচি বিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে চলিয়া যায়, তিনি তাহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন।

"আমরা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সতীর এই যে তপস্যা দেখিলাম তাহাতে আমাদের বিশ্বাসের জড়তা যেন দূর হইয়া যায়—যেন এই কথাটিকে নিঃসংশয় সত্য-রূপে জানিতে পারি যে মানুষের মধ্যে শিব আছেন। দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরে এবং হীনবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীব মধ্যেও তাহার দেবলোক প্রসারিত—এবং যে ব্যক্তি সমস্ত দারিদ্র্য, বিরূপতা ও কদাচারের বাহ্য আচরণ ভেদ কবিয়া এই পরমৈশ্বর্যময় পরম সুন্দরকে ভাবের দিব্যদৃষ্টিতে একবার দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি মানুষের এই অন্তরতম আত্মাকে পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং যাহা কিছু আছে সকল হইতে প্রিয় বলিয়া বরণ করিয়া লন, ("তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্য স্মাৎ সর্বস্মাৎ বদয়মাত্মাঃ) তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন ; আপনাকে তুচ্ছ করেন, সংস্কার বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্তকালের জন্য দৃক্‌পাত মাত্র করেন না।"

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখলেন—"নিবেদিতা ছিলেন বিবেকানন্দের উপসংহার কিন্তু উপসংহার বলিয়া তিনি ঠিক বিবেকানন্দের প্রতিরূপ ছিলেন না। নিবেদিতার জীবনের সামান্য মাত্র স্পর্শও যাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই সেই জ্যোতির্ময় জীবনের বিশালতা, গভীরতা ও শক্তিসঞ্চার দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। একটি দুর্লভ সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ আমরা পাই নিবেদিতার মধ্যে। নিবেদিতার চরিত্রে এবং চিন্তায় দেখিয়াছি ভারতীয় ভাবধারা এবং সাংস্কৃতিক মহিমার সহিত আধুনিক ভাবাধারাও উজ্জলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়াও নিবেদিতা ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। ভারতের শিক্ষা কি, সাধনা কি, সমাজের মর্মকথা কি তাহা তিনি তেমন করিয়াই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যেমন করিয়া বুঝিলে আমরা যথার্থ ভারতীয় হইয়া উঠিতে পারি এক বিদেশিনীর পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে।"

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসীতে' লিখলেন—"ইউরোপীয় বংশসম্ভূত যত লোকের কথা আমরা অবগত আছি, তাঁহাদের মধ্যে কেইই ভারতবর্ষকে ভগিনী

নিবেদিতা অপেক্ষা অধিক প্রীতি ও ভক্তি করিতেন না। তিনি ভারতভূমিকেই নিজ মাতৃভূমিস্থানে বরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিতেন।"

স্যর যদুনাথ সরকার বললেন—"ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে একটি জিনিস আমি শিক্ষা করিয়াছি। তাহা হইল আত্মমর্যাদা বোধ। আমাকে ইতিহাসে গবেষণার কার্যে প্রেরণা দিবার কালে একটা কথা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—কখনো বিদেশীর নিকট আপনার পতাকা অবনত করিবেন না' ('নেভার লোয়ার ইওর ফ্ল্যাগ টু এ ফরেনার')। তাঁহার সেই উপদেশ আমি জীবনে ভুলি নাই।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখলেন—

"এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে হায়,
চলে গেলে অল্প আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়।
দেহ রাখি শৈল মূলে—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী।
ওগো দেবতার দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী।"

'তপোবন' নাটকখানির উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ :—

"পবিত্রা নিবেদিতা!

বৎসে!

তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আনন্দ করিতে। আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে· তুমি কোথায়? দার্জিলিঙ যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলে, 'আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।' আমি ত জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎসে, দেখা করিতে আইস না? শুনিতে পাই মৃত্যুশয্যায় আমাকে স্মরণ করিয়া ছিলে; যদি দেবকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ এই উপহার গ্রহণ কর।"

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মোহিতলাল মজুমদার লিখলেন—"গুরু তাঁহার এই আত্মসৃষ্ট কন্যাটিকে যে ব্রত দিয়াছিলেন এবং নিবেদিতা যে ভাবে তাহা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গেল। কাজেই নিবেদিতাকে জানিতে বা বুঝিতে হইলে তাঁহার বাহিরের জীবন যবনিকার অন্তরালে একবার দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বাংলার মাটিতে নূতন করিয়া হলকর্ষণের পর যখন নব জীবনের বীজ বপন ও বারি সেচন আরম্ভ হইয়াছে, তখন দিকে দিকে কত অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। তাহাদের

বস্তুত নিবেদিতা যেন সকলের দূরে এক কোণে নিজেকেই "ফলপুষ্পে বিকশিত করিবার জন্য নয়, অপরগুলির সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য, এমন ফসলের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, যাহা বাজার পর্যন্ত পৌছায় না ; সে কেবল সার হইবার ফসল। বাঙলার মাটিতে তাহা মিলাইয়া গিয়াছে ; সেই কালের অব্যবহিত পরে আমরা বাঙলার উদ্যানে ফল-ফুলের যে আকস্মিক বাসন্তী শোভা দেখিয়াছিলাম, ভগিনী নিবেদিতার নীরব আত্মোৎসর্গ তাহার মৃত্তিকাতলে কোন রসধারা গোপন সঞ্চারিত করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবে কে ? নিবেদিতার আত্মবিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাঁহার জাতি ও দেশ, ধর্ম ও শিক্ষা, রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন এবং বয়োধর্মে এমনই দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য হইয়াছিল যে, শুধু মনে, ভাবজীবনে নয় একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়ার কথা কে কোথায় শুনিয়াছে ? ধর্মান্তর গ্রহণ বরং সহজ' কিন্তু একই দেহে জন্মান্তর গ্রহণ কে কোথায় দেখিয়াছে ?"

নিবেদিতার জীবন যবনিকার অন্তরালে যে ইতিহাস এতদিন লুকিয়ে ছিল, আজ তা প্রকাশের অগ্নি-আখরে উজ্জ্বল। আইরিশ রক্তের তপ্ত প্রবাহের অশ্রান্ত ধারা এসে ভারত-শোনিতের গঙ্গোত্রীতে এক হয়ে গেল। পত্তন হলো একটা নতুন যুগের। সে যুগ মানুষকে শোনাল জীবন যন্ত্রণার দুঃসহ জ্বালা থেকে উন্মুক্তির মন্ত্র। শেখাল পরাধীনতার গ্লানি-জর্জর দুঃশাসন থেকে মানুষের অধিকাব প্রতিষ্ঠাব সংগ্রাম-কৌশল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা পরে আপন দেহমন সেই মুক্তিযজ্ঞে আহুতি স্বরূপ অর্পণ করে হয়ে রইল চিরন্তনের নিবেদিতা।

—শেষ—